Boighar.com

R_H

বইঘর নিবেদন

ফেইসলেস কিলারস

হেনিং ম্যানকেল

অনুবাদ : সাঈদ শিহাব

বইঘর

Boighar.com

বইঘর নিবেদন

শীতের এক রাতে নৃশংসভাবে খুন হলেন এক বৃদ্ধ। নির্মম অত্যাচারে মৃত্যুর কোলে পড়া বৃদ্ধের স্ত্রীর বলা একমাত্র শব্দটি দ্বিধায় ফেলে দেয় ইস্তার পুলিশ ইন্সপেক্টর কার্ট ওয়ালান্ডারকে। সেই সাথে উস্কে দেয় সুইডেনে চলমান শরণার্থী বিরোধী মনোবৃত্তি, যা খুনোখুনিতে গড়াতে সময় নেয় না। একদিকে পারিবারিক অশান্তি, অন্যদিকে জটিল একটা নয়, দুটো রহস্য। ওয়ালান্ডার কি পারবে নিরপরাধ এক প্রাণ রক্ষা করতে? এদিকে সময় নেই একদমই...

ISBN 984872952-6

বইঘর

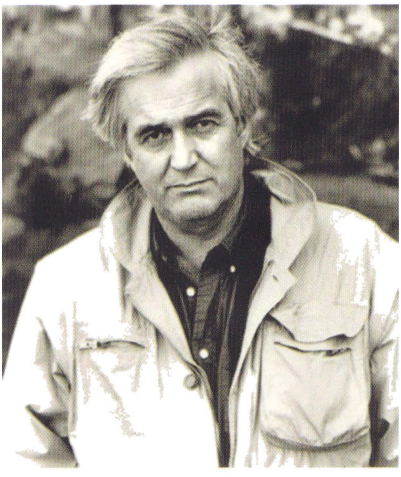

সুইডিশ লেখক হেনিং ম্যানকেলের জন্ম ১৯৪৮ সালের ৩-ফেব্রুয়ারি। পেশায় লেখক ও নাট্যকার। ইন্সপেক্টর কার্ট ওয়ালান্ডারকে ঘিরে লেখা রহস্য উপন্যাসগুলো তাকে খ্যাতি এনে দিয়েছিল। এছাড়াও লিখেছেন বেশ কিছু নাটক ও টেলিভিশনের জন্য স্ক্রিনপ্লে। ম্যানকেল ছিলেন একজন বামপন্থী সোশ্যাল ক্রিটিক ও অ্যাক্টিভিস্ট। তার বই ও নাটকে বরাবরই উঠে এসেছে সুইডেনের সামাজিক বৈষম্য আর অবিচারের মতো বিষয়গুলো। ২০১৫ সালের ৫-অক্টোবর সমাজ সচেতন এই লেখক মৃত্যুবরণ করেন।

ফেইসলেস কিলারস

:==========:

হেনিং ম্যানকেল

:==========:

অনুবাদ : সাঈদ শিহাব

ফেইসলেস কিলারস

হেনিং ম্যানকেল

Faceless Killers by Henning Mankell

অনুবাদ : সাঈদ শিহাব

প্রকাশক: সৈয়দ মোহাম্মদ রেজওয়ান
বুক স্ট্রিট
স্যুট - ১১, লেভেল - ৩,
সার্কেল আম্বিয়া পয়েন্ট শপিং মল,
পূর্ব রামপুরা, ঢাকা-১২১৯
০১৮৪৭-১২৯২৬৫

অনুবাদস্বত্ত্ব : বুক স্ট্রিট

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি'২০১৮

প্রচ্ছদ বুক স্ট্রিট

মুদ্রণ : একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন,
শিংটোলা, সূত্রাপুর, ঢাকা।
গ্রাফিক্স : বুকস্ট্রিট

কম্পোজ : অনুবাদক

একমাত্র পরিবেশক : উত্তরণ, ৩৯/১,
বাংলাবাজার, ঢাকা। ০১৯২৪-০০০৮৮৮
অনলাইন: www.rokomari.com,
www.facebook.com/bookstreetbd

মূল্য : ৩৮০ টাকা
Price : Tk. 380

BOIGHAR.COM

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

EXCLUSIVE

SCAN

Visit Us at boighar.com

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

অনুবাদকের উৎসর্গ :

মা- বাবা তোমাদের জন্য।

ফেইসলেস কিলারস

মূলঃ হেনিং ম্যানকেল

অনুবাদঃ সাঈদ শিহাব

SCAN & EDITEDBY:

BOIGHAR

WEBSITE:

WWW.BOIGHAR.COM

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar-বইঘর

WE ALWAYS ENCOURAGE BUYING

THE ORIGINAL BOOK.

অনুবাদকের কথা

বুকস্ট্রিট থেকে প্রকাশিত হলো সুইডিশ লেখক হেনিং ম্যানকেলের কার্ট ওয়ালান্ডার সিরিজের প্রথম বই ফেইসলেস কিলারস এর অনুবাদ। প্রোসিডিউরাল ড্রামা ঘরাণার উপন্যাসটিতে লেখক সাসপেন্স তৈরি করার চেষ্টা না করে বরং দেখিয়েছেন কিভাবে ধাপে ধাপে একটি রহস্য ভেদ করা হয়। ব্যক্তিগত জীবনে একজন সোশ্যাল এক্টিভিস্ট হওয়ায় উপন্যাসেও তুলে এনেছেন সুইডেনের সামাজিক অনাচার।

প্রকাশনা জগতে নবীন হলেও তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে বুকস্ট্রিট। এ যাত্রায় আমাকে সহযাত্রী করার জন্য প্রকাশক সৈয়দ মোহাম্মদ রেজওয়ান ভাইয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা।

ফেইসলেস কিলারস আমার এ যাবত অনুবাদ করা সবচেয়ে পরিশ্রমসাধ্য বই। সুইডেন ভিত্তিক হওয়ায় বারবার ইন্টারনেট ঘাঁটতে হয়েছে নামবাচক বিশেষ্যগুলোর উচ্চারণ জানতে। এই পরিশ্রম সার্থক হবে বইটি পাঠকদের মনের খোরাক যোগাতে পারলে।

সাঈদ শিহাব
২৫ ডিসেম্বর ২০১৭

এক

ঘুম ভেঙ্গে গেলে বয়স্ক মানুষটা কিছুতেই মনে করতে পারলেন না স্বপ্নে কী দেখেছেন। বেমালুম ভুলে বসে আছেন। অনেক চেষ্টা করেও লাভ হলো না বিশেষ। ঘুম এমনই। কৃষ্ণ গহ্বরের মতো গিলে নেয় সব। অন্তত ষাঁড়গুলোকে দেখিনি, মনকে প্রবোধ দিলেন তিনি। নতুবা জ্বরাক্রান্তের ন্যায় ঘেমে একাকার হয়ে থাকতাম। এবারের মতো ওই হতচ্ছাড়া জানোয়ারগুলো রেহাই দিয়েছে।

চারপাশে অন্ধকার। শোয়া থেকে নড়লেন না তিনি। পাশেই ঘুমিয়ে আছেন তার স্ত্রী। এতটাই আস্তে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন যে কান খাঁড়া না করলে শোনা অসম্ভব।

কোন এক সকালে আবিষ্কার করব মরে পড়ে আছে আমার স্ত্রী, কারণ ছাড়াই ভাবনাটা উঁকি দিয়ে গেল লোকটার মনে। টেরও পাব না। উল্টোটাও ঘটতে পারে অবশ্য। সকালের আলোয় আবিষ্কার করব একা হয়ে গেছি দুজনের একজন।

খাটের পাশের টেবিলে রাখা ঘড়িটার দিকে তাকালেন তিনি। জ্বলজ্বলে কাটাগুলো বলছে রাত চারটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিট।

ঘুম ভাঙলো কেন? সহসাই প্রশ্ন জাগল তার মনে। সাড়ে পাঁচটার আগে তো সাধারণত ঘুম ভাঙে না। গত চল্লিশ বছরে এর ব্যত্যয় হয়নি। তবে আজ কেন হলো?

অন্ধকারে কান পাতলেন তিনি। আর চকিতেই সজাগ হলো মন। কিছু একটা ঠিক নেই। এক হাত বাড়িয়ে আলতো করে স্ত্রীর মুখ স্পর্শ করলেন। উষ্ণ ত্বকের ছোঁয়া অনুভব করলেন আঙ্গুলের চামড়ায়। যাক, বেঁচে আছে। এখন অবধি ওদের কেউ একা হয়নি। আবারও কান পাতলেন তিনি অস্বাভাবিক কিছু শোনার আশায়।

ঠিক তখনই ধরতে পারলেন বেঠিক ঘটনাটা।

মাদি ঘোড়াটার হ্রেষা ধ্বনি শোনা যাচ্ছে না, টের পেলেন বৃদ্ধ। এ কারণেই আমার ঘুম ভেঙ্গে গেছে। রাতের বেলায় ডাকা ঘোড়াটার রোজকার রুটিন। ঘুমের ঘোরে সেই ডাক শুনে থাকি। আমার ঘুম ভাঙে না। অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি।

যতটা সম্ভব শব্দ না করে খাট থেকে নেমে পড়লেন তিনি। চল্লিশ বছর ধরে সঙ্গী এই খাট। বিয়ের সময় তারা শুধু এই একটা ফার্নিচারই কিনেছিলেন। এটাই প্রথম, এটাই শেষ। কাঠের মেঝের ওপর দিয়ে পা টিপে এগিয়ে যেতে লাগলেন তিনি। টনটনে ব্যথা অনুভব করলেন হাঁটুতে হাঁটতে গিয়ে।

বুড়ো হয়ে গেছি, ভাবলেন জানালার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে। বৃদ্ধ ও জীর্ণ। প্রতিদিন সকালে যখন ঘুম ভাঙে, অবাক হই। কিভাবে পার করে ফেললাম সত্তরটা বছর?

বাইরে তাকালেন তিনি। জানালার ওপাশে শীতের দীর্ঘ রজনী। জানুয়ারির সাত তারিখ আজ। এই শীতে তুষারপাত হয়নি স্কেওনাতে। রান্নাঘরের দরজার বাইরের দিকে ঝুলানো বাতির আলো ছড়িয়ে পড়েছে উঠান জুড়ে। পরশ লেগেছে উদাম চেস্টনাট গাছটাতেও। পার্শ্ববর্তী খামারের দিকে তাকালেন বৃদ্ধ। লভগ্রেনরা থাকে ওখানে। দীর্ঘ, খাটো আর ধবল একটা বাড়ি। এখন অবশ্য আঁধারে ছাওয়া। খামারবাড়ির কোণে একটা আস্তাবল। পেছনের দরজায় ওপরের দিকে ঝুলছে একটা হলদে বাতি। জন্ডিস রোগির ন্যায় ফ্যাকাসে তার আলো। মাদি ঘোড়াটাকে ওখানেই রাখা হয়। ওখানে দাঁড়িয়েই ওটা রাতের বেলা গোঙাতে থাকে যখন বিরক্ত হয়।

কান পাতলেন তিনি। পেছনে কিঁচকিঁচ করে উঠল খাট।

"করছটা কী তুমি?" বিড়বিড় করে বললেন লোকটার স্ত্রী।

"কিছু না, তুমি ঘুমাও।" জবাব দিলেন বৃদ্ধ। "পা দুটো একটু ঝেড়ে নিচ্ছি, এই যা।"

"আহারে, হাঁটুতে আবারও ব্যথা করছে বুঝি?"

"না।"

"তাহলে ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? ঠান্ডা লেগে যাবে তো। এসো, শুয়ে পড়।"

স্ত্রীর পাশ ফিরে শোয়ার শব্দ কানে এল বৃদ্ধের। একদা বড় ভালবাসতাম আমরা একে অপরকে, ভাবলেন তিনি। এর বেশি ভাবতে চাইলেন না। জোর করে ঠেলে রাখলেন চিন্তাগুলো। ভালোবাসা। এ নিছক কোন শব্দ না। আমাদের মতো মানুষদের জন্য না। জীবনের চল্লিশটা বছর যাদের কেটেছে মাঠেঘাটে চাষাবাদ করে, জমিতে লাঙ্গল দিয়ে, তাদের আবার ভালোবাসা!

আবার প্রতিবেশীর বাড়ির দিকে নজর দিলেন তিনি।

গোঙাচ্ছিস না কেন? বললেন আপন মনে। শব্দ কর, যাতে করে আমি বুঝতে পারি সব ঠিক আছে। নিশ্চিত হয়ে তাহলে গড়িয়ে উঠতে পারব আরও

খানিকক্ষণ। অবসর নেয়ার পর থেকে এমনিতেই দিন কাটে না। ঘুমিয়ে যা একটু সময় পার করা যায়।

অন্ধকার ভেদ করে বাড়িটার রান্নাঘরের জানালার দিকে তাকালেন বৃদ্ধ। এতগুলো বছর ধরে দেখে আসছে জানালাটা। আজ একটু অন্যরকম লাগছে না? নাকি ভুল দেখছে অন্ধকারে? চোখ বন্ধ করে বিশ পর্যন্ত গুণলেন তিনি। তারপর আবার তাকালেন জানালার দিকে। নাহ, কোন ভুল হয়নি। জানালাটা খোলাই। অথচ এতকাল যাবত রাতের বেলা ওটা বন্ধ থাকত। ঘোড়াটাও আবার আজ ডাকছে না।

ঘোড়াটা না ডাকার একটা কারণই হতে পারে। আজ রাতে লভগ্রেন আস্তাবলে যায়নি। প্রতি রাতের মতো প্রস্টেটের জ্বালায় আজ বিছানা ছাড়তে হয়নি তাকে।

কীসব আবোলতাবোল ভাবছি? নিজেকে প্রশ্ন করলেন বৃদ্ধ। চোখে ঝাপসা দেখছি নিশ্চয়। সব আগের মতোই আছে, বদলায়নি কিছুই। আর যাই হোক, লুনাপের মতো একটা নির্ঝঞ্ঝাট গ্রামে কীই বা ঘটতে পারে? জায়গাটা স্কেওনার একেবারে বুক বরাবর অবস্থিত, কাডে লেকের উত্তরে। কিছুই ঘটে না এই গ্রামে। সময় থমকে আছে এখানে। নিস্তরঙ্গ স্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হয় জীবন। কিছু বৃদ্ধ কৃষকের বসতি এই গ্রামে। জমিজমা বেচে বা ইজারা দিয়ে দিন গুণছে তারা। অপেক্ষা করছে অমোঘ নিয়তির।

আরেকবার খোলা জানালাটার দিকে তাকালেন তিনি। ওটা লাগাতে তো ভুলে যাওয়ার কথা নয় মারিয়া কিংবা ইয়োহানেস লভগ্রেনের। রাতের বেলা দরজা-জানালা না লাগিয়ে ঘুমানোর কথা নয় কোন বৃদ্ধ দম্পতির। বয়স বাড়ার সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ে মনের আতঙ্ক। সেই সাথে দরজায় লাগানো তালার সংখ্যা। ফিরে আসতে থাকে ছোটবেলার অমূলক ভয়গুলো। বৃদ্ধ হওয়া মানে আতঙ্কে দিন যাপন করা।

গিয়ে একবার দেখে আসব নাকি? ভাবলেন বৃদ্ধ। নিশ্চিত হওয়া যেত তাহলে। দ্রুত পায়ে হেঁটে যাব বেড়া দেয়া সীমানার দিকে। শীতল বাতাসের ঝাপটা এসে লাগবে আমার মুখে।

তবে নড়লেন না। কিছুক্ষণ বাদেই কফি বানাতে উঠে পড়বে ইয়োহানেস। প্রথমে বাথরুমের, পরে রান্নাঘরের আলো জ্বালাবে। ঠিক যেমনটা সর্বদা করে থাকে।

সহসাই শীত করতে লাগল লোকটার। ভাবলেন মারিয়া আর ইয়োহানেসের কথা। প্রতিবেশী ও কৃষক হিসেবে আমাদের সম্পর্কটা দীর্ঘদিনের। একে অপরকে সাহায্য করেছি, দুঃসময়গুলো একসাথে পার করেছি। আছে অনেক

সুখস্মৃতিও। মিডসামার পালন করেছি একত্রে, ক্রিসমাস ডিনার খেয়েছি। আমাদের সন্তানেরা দুই খামার জুড়ে ছুটোছুটি করত, যেন দুটোই ওদের ঘরবাড়ি। আর এখন আমরা একত্রে পার করছি শেষ জীবনের অলস সময়গুলো।

সাবধানে জানালা খুললেন তিনি, যাতে তার স্ত্রী হ্যানা জেগে না উঠে। কেন খুললেন, নিজেও জানেন না। শক্ত হাতে ধরে রেখেছেন খিড়কি, যাতে দমকা বাতাসে ছুটে না যায়। অবশ্য দমকা কেন, বাতাসের ছিটেফোঁটাও নেই। ঝড় হবে, এমন কোন ইঙ্গিতও দেয়া হয়নি আবহাওয়া পূর্বাভাসে।

শান্ত রাত। আকাশ ভরা তারা। শীতল পরিবেশ। জানালাটা লাগিয়ে দিবে, এমন সময় একটা শব্দ শুনতে পেলেন যেন। তবে ঠিক ঠাহর করতে পারলেন না। ট্রাক্টরের গর্জন শুনতে শুনতে ডান পাশের কানটা গেছে। নিশ্চিত হওয়ার জন্য বাম কান জানালার দিকে পাতলেন তিনি।

পাখির ডাক, মনে হলো তার। রাতজাগা কোন পাখি। সহসাই ভয় লাগতে শুরু করল তার। গ্রাস করে নিতে লাগল অতীব আতঙ্ক। কেউ যেন আর্তনাদ করছে। বেপরোয়া হয়ে চেষ্টা করছে পুরু পাথুরে দেয়াল পেরিয়ে প্রতিবেশীর কান পর্যন্ত পৌছাতে।

সব আমার কল্পনা, ভাবলেন বৃদ্ধ। কেউ চিৎকার করছে না। কে করবে? ঠাস করে জানালা লাগিয়ে দিলেন তিনি। এত জোরে যে লাফিয়ে উঠল টেবিলের ফুলদানি।

ঘুম ভেঙ্গে গেল হ্যানার।

"কী হয়েছে?" জিজ্ঞেস করলেন বিরক্তির স্বরে।

জবাব দিতে গিয়ে বৃদ্ধ টের পেলেন, বাস্তবিকই ভয় পাচ্ছে তিনি।

"ঘোড়াটা ডাকছে না," বললেন খাটের কিনারায় বসে। "লভগ্রেনদের রান্নাঘরের জানালা খোলা। আর... আর কে যেন চিৎকার করছে।"

উঠে বসলেন হ্যানা। "কী বলছ এসব?"

উত্তর দিতে ইচ্ছা করল না লোকটার। কিন্তু এখন তিনি নিশ্চিত, ওটা কোন নিশাচর পাখির ডাক ছিল না।

"ইয়োহানেস বা মারিয়া বোধ হয় সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে।"

খাট থেকে নেমে জানালার দিকে গেলেন হ্যানা। খোলা জানালা দিয়ে তাকালেন বাইরে। তার পরনের সাদা নাইটগাউন নেমে এসেছে মেঝে পর্যন্ত।

"রান্নাঘরের জানালা খোলা না," কণ্ঠ খাদে নামিয়ে এনে বললেন তিনি। "ওটা ভাঙা হয়েছে।"

স্ত্রীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ লোকটা। ঠকঠক করে কাঁপছে এখন।

"কেউ একজন সাহায্যের আশায় চিৎকার করছে," কাঁপা স্বরে বললেন হ্যানা।

"কী করব আমরা এখন?"

"ওখানে যাও, বললেন বৃদ্ধা। এক্ষুণি!"

"কিন্তু যদি কোন বিপদ হয়?"

"সেই ভয়ে আমরা আমাদের বন্ধুদের সাহায্য করব না?"

দ্রুত পোশাক পরে, রান্নাঘরের কাবার্ড থেকে টর্চ বের করে নিয়ে, বাইরে বেরিয়ে এলেন বৃদ্ধ। পায়ের নিচে কাদা জমে শক্ত হয়ে গেছে। উল্টো ঘুরে স্ত্রীকে দেখতে পেলেন দাঁড়িয়ে আছে জানালায়। বেড়ার কাছে এসে থমকে দাঁড়ালেন তিনি। সব নিস্তব্ধ। এবার ভাঙা জানালাটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন। সাবধানে নিচু বেড়াটা পেরিয়ে এগিয়ে চললেন সাদা বাড়িটার দিকে।

সব আমার কল্পনা, ভাবলেন তিনি। ঘাটের মরা হয়েছি এক। বোধজ্ঞান সব তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। কে জানে, স্বপ্নে হয়ত ষাঁড়গুলোকেই দেখেছি। তাড়া করছিল বালক বয়সী আমাকে। ঠিক যেভাবে মৃত্যু ধাওয়া করে যায় জীবনভর।

এমন সময় শুনতে পেলেন কান্নার শব্দ। দুর্বল গলায়, অনেকটা গোঙানির মতো। মারিয়ার গলা না হয়েই যায় না। শোবার ঘরের জানালার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। সাবধানে তাকালেন পর্দা আর জানালার ফ্রেমের ফাঁক দিয়ে।

মুহূর্তেই টের পেলেন, মারা গেছে ইয়োহানেস। ভেতরে টর্চের আলো ফেললেন বৃদ্ধ। চেয়ারে বাঁধা অবস্থায় মেঝেতে পড়ে আছেন মারিয়া। মুখ রক্তে মাখামাখি, নকল দাঁত ভেঙ্গে পড়ে আছে রক্তাক্ত নাইটগাউনের ওপর। ইয়োহানেসের শুধু পা দেখা যাচ্ছে। বাকি শরীর পড়ে গেছে পর্দার আড়ালে।

থরথর করে কাঁপতে লাগল লোকটার হাঁটু। সরে গেলেন জানালার সামনে থেকে। টলোমলো পায়ে বেড়া টপকে ফিরে এলেন নিজ বাড়িতে। প্রথমে ফোন করলেন পুলিশকে। তারপর ক্লজেট থেকে বের করে আনলেন একটা ক্রোবার।

"এখানে থাকো," বললেন স্ত্রীকে। "তোমার না দেখাই ভালো।"

"কী হয়েছে?" ভয়ার্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন হ্যানা। ছলছল করছে চোখ।

"জানি না," বললেন বৃদ্ধ। "তবে আমি নিশ্চিত ঘোড়াটা ডাকেনি রাতে। একারণেই ভেঙ্গে গিয়েছিল ঘুম।"

১৯৯০ সালের সাত জানুয়ারির সূর্য উঠতে তখনও ঢের দেরি।

দুই

ইস্তা পুলিশের কাছে ফোনকলটা আসে ভোর পাঁচটা তের মিনিটে। রিসিভ করে এক ক্লান্ত অফিসার। নববর্ষের শুরু থেকে টানা ডিউটি করে হাঁপিয়ে উঠেছে। ওপ্রান্তের তোতলানো কথা শুনে প্রথমে ভাবল, কোন বয়স্ক লোকের ফাজলামো। তারপর হঠাৎ করেই সজাগ হয়ে উঠল তার মন। প্রশ্ন করতে শুরু করল ওপ্রান্তের লোকটাকে। কথা শেষ হয়ে গেলে থম মেরে বসে থাকল এক মুহূর্তের জন্য। তারপর দ্বিধা কাটিয়ে রিসিভার তুলে নিল আবার। নম্বরটা তার মুখস্থই আছে।

ঘুমিয়ে ছিল কার্ট ওয়ালান্ডার। রাতে ঘুমিয়েছে অনেক দেরিতে। বুলগেরিয়া থেকে ওর এক বন্ধু মারিয়া ক্যালাসের কিছু রেকর্ডিং পাঠিয়েছে। বারবার ট্রাভিয়াটা শুনে যখন শুতে যায়, তখন বাজে রাত দুইটা। ফোনকলটা যখন আসে, তখন সে কামনাপূর্ণ স্বপ্নে বিভোর। মিলিত হচ্ছিল এক কৃষ্ণাঙ্গ নারীর সাথে। স্বপ্নের ঘোরেই পাশে হাত বাড়ায় সে। কিন্তু সেখানে কেউ ছিল না। তার স্ত্রীও না, স্বপ্নে দেখা কৃষ্ণাঙ্গ নারীও না।

চোখ খুলে ঘড়ির দিকে তাকাল ওয়ালান্ডার। তারপর হাত বাড়ালো ফোনের দিকে। গাড়ি দুর্ঘটনা নিশ্চয়, প্রথমেই মাথায় এল তার। ই৬৫ রুট ধরে প্রচন্ড গতিতে গাড়ি চালাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে বরফে পিছলে গিয়ে। নয়তো সকালের ফেরিতে করে পোল্যান্ড থেকে আগত শরণার্থী নিয়ে কোন ঝামেলা।

উঠে বসে রিসিভারটা কানে ঠেকাল সে। না কামানো দাড়ির খোঁচা অনুভব করল হাতে।

"ওয়ালান্ডার বলছি।"

"ঘুম থেকে জাগিয়ে দিইনি আশা করি।"

"না, জেগেই ছিলাম।"

মিথ্যা বললাম কেন? ভাবল সে। কী হত সত্যি বললে? কী হত যদি বলে দিতাম যে আমার উত্তেজনাময় স্বপ্নে বাঁধা দিয়েছে?

"আপনাকে ফোন করার কথাই মনে এল।"

"সড়ক দুর্ঘটনা?"

"না। এক বয়স্ক কৃষক ফোন করেছিলেন লুনাপ থেকে। নাম নিসট্রম। বলেছে, তার পাশের বাড়ির মহিলাকে বেঁধে মেঝেতে ফেলে রেখে যাওয়া হয়েছে। আর খুন করা হয়েছে একজনকে।"

মুহূর্তেই লুনাপের অবস্থান ভেসে উঠল ওয়ালান্ডারের মানসপটে। মার্সভিন্সহোম থেকে বেশি দূরে না গ্রামটা। সে থাকে সেন্ট্রাল ইস্তার মারিয়াগতায়। লুনাপ পাহাড়ি এলাকায় অবস্থিত। সমতল স্কেওনার তুলনায় জায়গাটা কিছুটা অস্বাভাবিক বটে।

"শুনে মনে হলো সত্যই বলছে। একারণে আপনাকে ফোন করলাম।"

"স্টেশনে এখন আর কে কে আছে?"

"কন্টিনেন্টালে কে যেন জানালায় ঢিল ছুঁড়েছে। পিটার আর নরেন ওদিকটা দেখছে। ডেকে পাঠাব?"

"ওদের বল কাডে লেক আর ক্যাটসলোসার মোড়ে চলে আসতে। আমিও যাচ্ছি। ঠিকানাটা দিয়ে দিবে ওদের। কলটা এসেছিল কখন?"

"কয়েক মিনিট আগে।"

"তুমি নিশ্চিত কোন মাতালের কান্ড না?"

"শুনে তো মনে হয়নি।"

"আচ্ছা, ঠিক আছে।"

গোসল না করেই পোশাক পালটে নিল ওয়ালান্ডার। কুসুমগরম কফির কাপ নিয়ে তাকাল জানালার বাইরে। নজরে এল ধূসর, ভগ্নদশা এক দালান। কে জানে এই শীতে তুষার পড়বে কিনা স্কেওনাতে। না পড়লেই ভালো, ভাবল সে। স্ক্যানিয়ান তুষারঝড় মানেই টানা হুজ্জত। গাড়ি দুর্ঘটনা, তুষারে আটকা পড়া প্রসূতি, জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আর কেটে যাওয়া পাওয়ার লাইন। তুষারঝড় মানেই ঝামেলা, বিশৃঙ্খলা। আর এই শীতে এসব ঝামেলা মোকাবেলা করার সামর্থ্য তার নেই বললেই চলে। তিন মাস আগে ছেড়ে চলে গেছে তার স্ত্রী। সেই ক্ষত এখনও শুকায়নি।

রেগেমেন্টসগতা ধরে ওস্তেলিয়েদেনে চলে এল ওয়ালান্ডার। ড্রাগনগতায় এসে লাল বাতির সামনে পড়ল তার গাড়ি। সময়টুকু অপচয় না করে খবর শোনার জন্য গাড়ির রেডিও চালু করে দিল। বেশ উত্তেজনা নিয়ে একটা বিমান দুর্ঘটনার খবর বর্ণনা করছে সংবাদ পরিবেশক।

একবারই জন্ম, একবারই মৃত্যু, চোখ কচলাতে গিয়ে বিড়বিড় করল ওয়ালান্ডার। এই মন্ত্র আত্মস্থ করার পেছনে একটা গল্প আছে। তখন সবে পুলিশ বাহিনীতে যোগ দিয়েছে সে। বয়স মাত্র তেইশ। টহল দিয়ে বেড়াতো তার শহর মালমোর রাস্তায় রাস্তায়। একবার পিলডাম পার্ক থেকে এক মাতালকে ধরে স্কোয়াড কারে তোলার চেষ্টা করছিল সে আর তার এক সহকর্মী। কোন ফাঁকে মাতালটা একটা ধারালো ছুরি বের করে আক্রমণ করে বসেছিল। ওয়ালান্ডারের একবারে বুকে গিয়ে লাগে ছুরিটা। আরেকটু হলেই

এফোঁড়ওফোঁড় হয়ে যেত হৃদপিন্ড। সেদিনই প্রথমবারের মতো পুলিশ হওয়ার ঝুঁকি উপলব্ধি করেছিল। অতীত ভুলে থাকার জন্য তার কাছে এক অস্ত্র এই মন্ত্র।

শহর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পথে এক ঝলকের জন্য সমুদ্র দেখতে পেল সে। বিস্তৃত ধূসর জলরাশি, স্তব্ধ। স্ক্যানিয়ার মধ্য শীতে এমনটা অস্বাভাবিক। দূরে পুবগামী জাহাজের অবয়ব।

দেরিতে হলেও তুষারঝড় হবে, মনে হলো তার। রেডিও বন্ধ করে দিয়ে ভাবতে লাগল ফোনে শোনা কথাগুলো। জানালা দিয়ে এক বয়স্ক মহিলাকে চেয়ারে বাঁধা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছে এক বৃদ্ধ। কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য লোকটার কথা? বুড়োর ভীমরতিই হবে, গাড়ির গতি বাড়াতে গিয়ে ভাবল ওয়ালান্ডার। দীর্ঘ চাকুরী জীবনে বহুত দেখেছে এমন। কাজকর্ম না থাকায় পুলিশকে ফোন করে বিরক্ত করে একাকীত্বে ভোগা মানুষগুলো।

কাডে লেকের দিকে চলে যাওয়া রাস্তার ধারে অপেক্ষা করছে একটা স্কোয়াড কার। গাড়ি থেকে নেমে মাঠে একটা খরগোশের নাচাকোঁদা দেখছিল পিটারস। ওয়ালান্ডারের নীল পুজোঁ গাড়িটা এগিয়ে আসতে দেখে হাত নাড়িয়ে সম্ভাষণ জানালো সে। তারপর গিয়ে বসল হুইলের পেছনে।

পুলিশের গাড়িটা অনুসরণ করল ওয়ালান্ডার। চাকার নিচে গুড়ো হয়ে যেতে লাগল বরফজমা নুড়িপাথর। ট্রুনারাপের পথ ধরে, একসারি পাহাড় অতিক্রম করে লুনাপে প্রবেশ করল ওরা। আরও এক কিলোমিটার সরু, কাঁচা রাস্তা পাড়ি দিয়ে পৌছালো কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে। সাদা রঙের দুটো খামারবাড়ি, দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি।

এক বয়স্ক লোক এগিয়ে আসতে লাগলেন ওদের দিকে তাড়াহুড়ো করে। এক পায়ে খোঁড়াচ্ছেন বৃদ্ধ, যেন বাঁ হাঁটুতে ব্যথা পাচ্ছে হাঁটতে গিয়ে। গাড়ি থেকে বেরিয়ে ওয়ালান্ডার খেয়াল করল, বাতাস বইতে শুরু করেছে। সত্যিই তুষার পড়বে নাকি? বৃদ্ধকে দেখেই তার মনে হলো, খারাপ কিছু অপেক্ষা করছে সামনে। লোকটার চোখে যে ভয়ের ছাপ, তা আর যাই হোক, ভীমরতি হতে পারে না।

"আমি দরজা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকেছি," উগরে দিলেন বৃদ্ধ। "কেউ বেঁচে আছে কিনা দেখার জন্য। এছাড়া আর কিছু করার ছিল না। তবে মহিলা বেশিক্ষণ বাঁচবে না।"

ক্ষতিগ্রস্ত দরজা পেরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল ওরা। কটু একটা গন্ধ এসে লাগল ওয়ালান্ডারের নাকে। মৃদু আলোয় ভালো করে দেখাই যায় না কিছু।

"তা কী হয়েছে এখানে?" জিজ্ঞেস করল সে।

"ওদিকে," উত্তর দিলেন বৃদ্ধ। তারপর কাঁদতে লাগলেন হাউমাউ করে।

তিন পুলিশ সদস্য একে অপরের দিকে তাকাল। এক পা দিয়ে বৃদ্ধের দেখানো দরজাটা ঠেলা দিল ওয়ালান্ডার। যা দেখল, এমন কিছু কল্পনারও বাইরে। পরবর্তী জীবনে অনেক নৃশংস ঘটনার সম্মুখীন হবে সে। কিন্তু এটার তুলনায় সব নস্যি ঠেকবে।

রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে বৃদ্ধ দম্পতির শোবার ঘর। এমনকি সিলিঙে ঝুলন্ত পোর্সিলিন ল্যাম্পে গিয়ে লেগেছে রক্তের ছিটা। খাটের কাছে চিত হয়ে পড়ে আছে এক বৃদ্ধ। নগ্ন গা, আন্ডারওয়ার টেনে নিচে নামিয়ে আনা হয়েছে। মুখ এমনভাবে থেঁতলে দেয়া হয়েছে যে চেনার উপায় নেই। সম্ভবত তার নাক কেটে নেয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। অন্তত দেখে তাই মনে হলো ওয়ালান্ডারের। বৃদ্ধের হাত দুটো পেছনে বাঁধা, বাম উরুর যাচ্ছেতাই অবস্থা। লাল রক্তের মধ্য দিয়ে সাদা হাড্ডি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে।

"হায়, খোদা," পেছন থেকে গুঙিয়ে উঠল নরেন।

গা গুলিয়ে উঠল ওয়ালান্ডারও।

"অ্যাম্বুলেন্স ডাকো", ঢোঁক গিলে বলল সে। "জলদি।"

তারপর বৃদ্ধার দিকে ঝুঁকল ওরা। আধশোয়া অবস্থায় মেঝেতে পড়ে আছে মহিলা, চেয়ারে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা শরীর। অস্থিচর্মসার গলায় শক্ত করে বাঁধা একটা ফাঁস। গলা আর কব্জিতে চেপে বসেছে মোটা দড়ি। মন্থর হয়ে আসছে বৃদ্ধার নিঃশ্বাস। চেঁচিয়ে পিটারকে একটা ছুরি নিয়ে আসতে বলল ওয়ালান্ডার। বাঁধন মুক্ত করে বৃদ্ধাকে আলতো করে মেঝেতে শুইয়ে দিল সে। মাথাটা রাখল ওর কোলের ওপর।

পিটারসের দিকে তাকাল সে। দুজনের মনে একই প্রশ্ন-এক অশীতিপর বৃদ্ধার সাথে এমন নিষ্ঠুরতা কে করতে পারল?

"বাইরে অপেক্ষা করুন," দরজায় দাঁড়ানো ফোঁপাতে থাকা বৃদ্ধের উদ্দেশ্যে বলল ওয়ালান্ডার। "আর ভুলেও কোন কিছুতে হাত দিবেন না।"

নিজের কথাগুলো গর্জনের ন্যায় শোনালো ওর কাছে। ভয় পাচ্ছি আমি, তাই চিৎকার করছি, ভাবল সে। এ কোন দুনিয়ায় বাস করছি আমরা?

অ্যাম্বুলেন্স এসে পৌছালো মিনিট বিশেক পর। ততক্ষণে আরও দুর্বল হয়ে পড়েছে বৃদ্ধা। শ্বাসপ্রশ্বাস থেমে যায় যায় অবস্থা। ভয় হলো ওয়ালান্ডারের, দেরি হয়ে গেছে সম্ভবত।

অ্যাম্বুলেন্স চালককে চিনতে পারল সে। লোকটার নাম অ্যানটনসন। তবে লোকটার তরুণ সহকারীকে আগে কখনও দেখেনি।

"শুভ সকাল," বলল ওয়ালান্ডার। "বৃদ্ধ মারা গেছে। তার স্ত্রীর অবস্থা সংকটাপন্ন। চেষ্টা করদেখ বাঁচিয়ে রাখা যায় কিনা।"

"কী হয়েছে?" জিজ্ঞেস করল অ্যানটনসন।

"আশা করছি বৃদ্ধার মুখ থেকেই শুনতে পারব, যদি বেঁচে থাকে আরকি। এখন তাড়াতাড়ি কর!"

বৃদ্ধাকে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্স চলে গেলে বাইরে বেরিয়ে এল পিটারস ও ওয়ালান্ডার। একটা রুমাল দিয়ে মুখ মুছল নরেন। ভোর হয়ে আসছে। হাতঘড়িতে সময় দেখল ওয়ালান্ডার। সকাল সাতটা বেজে আটাশ মিনিট।

"একেবারে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়েছে," বলল পিটারস।

"বীভৎস," সায় দিল ওয়ালান্ডার। "কল করে পুরো একটা টিম পাঠিয়ে দিতে বল। নরেনকে বল জায়গাটা বন্ধ করে দিতে। আমি বৃদ্ধ লোকটার সাথে কথা বলে আসি।"

এমন সময় একটা আর্তনাদ শুনে লাফিয়ে উঠল সে। পরমুহূর্তেই চিনতে পারল ঘোড়ার ডাক। বিরতি দিয়ে আবারও ভেসে এল হ্রেষাধ্বনি। আস্তাবলে চলে এল ওরা। ভেতরে অন্ধকারে স্টলের মধ্যে অস্থির হয়ে নড়াচড়া করছে একটা ঘোড়া। সার আর প্রস্রাবের গন্ধে ভুরভুর করছে জায়গাটা।

"ঘোড়াটাকে পানি আর খড় দাও," আদেশ করল ওয়ালান্ডার। "দেখ অন্য কোন প্রাণী আছে কিনা।"

আস্তাবল থেকে বেরুতেই শিরশির করে উঠল ওর গা। চোখ পড়ল দূরে মাঠে একাকী দাঁড়িয়ে থাকা একটা গাছের ওপর। সেখান থেকে ভেসে আসছে কাকের কা কা রব। লম্বা একটা নিঃশ্বাস নিতেই শীতল বাতাস ঢুকে পড়ল ওর ফুসফুসে। সেই সাথে টের পেল, বাড়ছে বাতাসের গতি।

"আপনার নাম নিস্ট্রম," বৃদ্ধকে উদ্দেশ্যে করে বলল সে। লোকটার কান্না বন্ধ হয়ে গেছে ততক্ষণে। "আপনার সাহায্যের প্রয়োজন আমাদের। যদি ভুল না করে থাকি, আপনি পাশের বাড়িতে থাকেন।"

মাথা দোলালেন বৃদ্ধ। "কিন্তু এখানে কী ঘটেছে?" জিজ্ঞেস করলেন কাঁপা স্বরে।

"সেটা জানতেই তো আপনার সাহায্য লাগবে," জবাব দিল ওয়ালান্ডার। "চলুন, আপনার বাসায় গিয়ে বসা যাক।"

রান্নাঘরে চেয়ারে বসে কাঁদছিলেন এক বৃদ্ধা। পরনে পুরনো আমলের এক ড্রেসিং গাউন। ওয়ালান্ডার পরিচয় দিতেই চোখ মুছে উঠে গেলেন মহিলা। তারপর কফি বানাতে লাগলেন। বৃদ্ধ লোকটা ধপ বসে পড়লেন টেবিলের ওপর। ওয়ালান্ডার খেয়াল করল, ক্রিসমাসের সজ্জা এখনও ঝুলছে জানালায়।

একটা বুড়ো বিড়াল বসে আছে জানালার চৌকাঠে। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। হাত বাড়িয়ে বিড়ালটাকে আদর করতে গেল সে।

"কামড়ে দিতে পারে," বললেন নিসট্রম। "লোকজন পছন্দ করে না। হ্যানা আর আমাকে ছাড়া।"

কোথা থেকে শুরু করবে, ভেবে নিতে লাগল ওয়ালান্ডার। একটা বীভৎস খুন, ভাবল মনে মনে। যদি ভাগ্য খারাপ হয়, তাহলে হয়ত সংখ্যাটা দুইয়ে গিয়ে দাঁড়াবে। আচমকা কী খেয়াল হলো, নরেনের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য জানালার কাঁচে টোকা দিল সে।

"আমি আসছি," বলে উঠে পড়ল।

"আগে থেকেই খড় আর পানি দেয়া আছে ঘোড়াটার জন্য," জানাল নরেন। "আর অন্য কোন প্রাণী নেই আস্তাবলে।"

"কাউকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা কর," বলল ওয়ালান্ডার। "বৃদ্ধা যদি জেগে উঠে কিছু বলে, শোনার জন্য লোক রাখা দরকার। নিশ্চয় কিছু না কিছু দেখেছেন মহিলা।"

মাথা দোলাল নরেন।

"ভালো শুনতে পায় এমন কাউকে পাঠাতে বলবে হাসপাতালে," বলল ওয়ালান্ডার। "কোনও কালা-বধিরকে না। ভালো হয় লিপ-রিড করতে পারে এমন কাউকে পাঠালে।"

রান্নাঘরে ফিরে এসে গা থেকে ওভারকোট খুলে সোফার ওপর রেখে দিল সে।

"এবার বলুন," বলল বৃদ্ধের উদ্দেশ্যে। "কিছুই বাদ দিবেন না। একেবারে গোড়া থেকে শুরু করতে পারেন।"

নিসট্রম আর তার স্ত্রী খুব বেশি কিছু জানাতে পারলেন না। ঘটনার ধারাবাহিকতা আর ভিক্টিম বৃদ্ধ-বৃদ্ধার জীবন কাহিনি ছাড়া। শুনতে শুনতে দু কাপ কফি সাবাড় করে দিল ওয়ালান্ডার। দুটো প্রশ্নের উত্তর জানা দরকার তার।

"উনারা কি বাড়িতে ক্রোনার রাখতেন? বড় অঙ্কের?" জিজ্ঞেস করল সে।

"না," জবাব দিলেন নিসটর্ম। "ব্যাংকেই রাখতো সব। পেনশনের অর্থও। আর তেমন বড়লোক ছিল না ওরা। জমিজমা, গবাদিপশু বিক্রি করে যা পেয়েছিল, ভাগ করে দিয়েছিল সন্তানদের।"

পরের প্রশ্নটা অনর্থক ঠেকলেও করে ফেলল ওয়ালান্ডার। এরকম পরিস্থিতিতে মনে দ্বিধা রাখতে নেই।

"আপনার জানামতে তাদের কি কোন শত্রু ছিল?"

"শত্রু?"

"এমন কেউ যার বা যাদের দ্বারা এই কাজ করা সম্ভব?"

বয়স্ক দম্পতি সম্ভবত বুঝতে পারলেন না প্রশ্নটা। ওয়ালান্ডার আবারও জিজ্ঞেস করলে তারা একে অপরের দিকে তাকালেন বিহ্বল চাউনিতে।

"আমাদের মতো মানুষদের শত্রু থাকে না," এমনভাবে বললেন বৃদ্ধ যেন অপমানিত হয়েছেন। "জমির সীমানা কিংবা ওয়াগনের রাস্তা নিয়ে হয়ত মাঝে মধ্যে ঝগড়া হয়। কিন্তু কখনই তা খুনাখুনির পর্যায়ে যায় না।"

মাথা দোলাল ওয়ালান্ডার।

'আপনাদের সাথে পরে আরও কথা হবে," বলল কোট হাতে নিতে নিতে। "যদি মনে হয় আমাদের কিছু জানানো দরকার, কল করতে দ্বিধা করবেন না। ইন্সপেক্টর ওয়ালান্ডার বললেই আমাকে পেয়ে যাবেন।"

"যদি ওরা আবারও আসে...?" বললেন বয়স্কা মহিলা।

মাথা নাড়াল ওয়ালান্ডার।

"আসবে না," বলল বৃদ্ধার সন্দেহ উড়িয়ে দিয়ে। "ডাকাতদের কাজ সম্ভবত এটা। এরা এক জায়গায় দুবার যায় না। দুঃশ্চিন্তা করবেন না।"

আরও কিছু বলে আশ্বস্ত করতে চাইল সে। কিন্তু কী বলবে? কী সুরক্ষাই বা দিতে পারবে এদের? নিজ চোখে প্রতিবেশীদের নৃশংস ভাবে খুন হতে দেখেছে এরা। অনিরাপদ বোধ করাটাই কি স্বাভাবিক নয়?

"ঘোড়াটাকে কে খাওয়াবে?" জিজ্ঞেস করল সে।

"আমরা," দ্বিধা না করে জবাব দিলেন বৃদ্ধ। "আমরাই পারব যত্ন নিতে।"

বেরিয়ে এল ওয়ালান্ডার। বাইরে হিম শীতল পরিবেশ। ভোর হবে হবে। বাড়ছে বাতাসের গতি। গাড়ির দিকে এগোলো সে। জানে, ক্রাইম-সিন টেকনিশিয়ানদের সাহায্য করার জন্য থাকা উচিত। কিন্তু প্রচন্ড ঠান্ডায় একেবারে জমে গেছে। শরীরটাও ভালো ঠেকছে না। এখানে আর এক মুহূর্তও থাকতে ইচ্ছা করছে না তার। তাছাড়া, জানালা দিয়ে দেখেছে, রিডবার্গ এসেছে টিমের গাড়িতে। অতএব, দুশ্চিন্তার কোন কারণই নেই। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে না দেখা পর্যন্ত মুক্তি মিলবে না টেকনিশিয়ানদের। রিডবার্গ একজন দায়িত্ববান পুলিশ সদস্য। অবসরে যাবে কয়েক বছর পর। কাজকর্ম দেখে তাকে গোঁড়া আর শ্লথ মনে হতে পারে। কিন্তু তার উপস্থিতি মানে অপরাধস্থল সঠিক রূপে নিরীক্ষণের নিশ্চয়তা।

রিডবার্গ রুম্যাটিজমে আক্রান্ত। ছড়িতে ভর দিয়ে হাঁটে। ওয়ালান্ডারকে দেখে পা টেনে টেনে উঠোন পেরিয়ে আসতে লাগল।

"অবস্থা তো বেশ খারাপ," বলল সে। "একেবারে রক্তগঙা বইয়ে দিয়েছে।"

"তুমি একা না, আরও একজন একই মন্তব্য করেছে," বলল ওয়ালান্ডার।

গম্ভীর দেখাল রিডবার্গকে। "কোনও সূত্র পেয়েছ?"

মাথা নাড়াল ওয়ালান্ডার।

"কিছুই না?"

"প্রতিবেশীরা কিছু শোনেনি, দেখেওনি। আমার মনে হয়, সাধারণ ডাকাতের কাজ।"

"এই নৃশংসতাকে সাধারণ বলছ?"

কষ্ট পেল যেন রিডবার্গ। অনুতাপ হলো ওয়ালান্ডারের কথাটা বলার জন্য। "ঠিক ওভাবে বোঝাতে চাইনি। কাজটা যে বা যারা করেছে, তারা যে অমানুষ, তাতে সন্দেহ নেই। আমি বলতে চেয়েছি, সাধারণত বৃদ্ধ মানুষেরা থাকে এমন নির্জন জায়গায় গিয়ে লুটপাট চালায় এরা।"

"এদের খুঁজে বের করতেই হবে," রিডবার্গের কণ্ঠে দৃঢ়তা। "আরেক বার আঘাত হানার আগেই।"

"ঠিক বলেছ," সায় জানাল ওয়ালান্ডার। "এ বছর অন্য কোন অপরাধী ধরি বা না ধরি, এদের ধরতে হবেই।"

গাড়িতে উঠে রওনা হলো সে। মোড় নিতে গিয়ে আরেকটু হলেই সংঘর্ষ হত বিপরীত দিক থেকে আসা একটা গাড়ির সাথে। একে তো রাস্তাটা সরু, তার ওপর গাড়িটা আসছিল তীব্র বেগে। চালককে চিনতে পারল সে। একটা নামকরা জাতীয় পত্রিকার সাংবাদিক। কাটতি ভালো এমন সংবাদের গন্ধ পেলেই এরা ছুটে আসে রক্তপিপাসু হাঙ্গরের ন্যায়।

লুনাপ জুড়ে কয়েকবার চক্কর দিল ওয়ালান্ডার। জানালা দিয়ে আলো দেখা গেলেও এখনও কেউ বাড়ি থেকে বের হতে শুরু করেনি। খুনের ঘটনাটা যখন লুনাপবাসী জানতে পারবে, কেমন হবে তাদের মানসিক অবস্থা?

অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সে। বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠছে গলায় ফাঁস পরানো বৃদ্ধার প্রতিচ্ছবি। চিন্তা করা যায় এমন পাশবিকতা? কে করতে পারল? ভারী কিছু একটা দিয়ে মাথায় বাড়ি মারলেই তো হয়ে যেত। কেল্লা ফতে। অত্যাচার করতে গেল কেন?

গ্রামের রাস্তা ধরে যেতে যেতে তদন্ত কিভাবে চালাবে, ভেবে নিতে লাগল সে। ব্লেনটার্পে যাওয়ার মোড়ে এসে গাড়ি থামিয়ে হিটার বাড়িয়ে দিল। যা ঠান্ডা পড়েছে! তারপর চুপচাপ বসে তাকিয়ে রইল দিগন্ত পানে।

ওয়ালান্ডার জানে, তদন্ত ওকেই করতে হবে। আর কাউকে দিয়ে সম্ভব হবে না। ইস্তাতে রিডবার্গের পর ওরই সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে গোয়েন্দা হিসেবে। যদিও বয়স ওর মোটে বিয়াল্লিশ বছর।

তদন্ত কাজের বেশিরভাগই রুটিন মাফিক। ঘটনাস্থল পরীক্ষা কর, লুনাপের লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ কর, দুষ্কৃতকারীদের সম্ভাব্য পলায়ন পথ অনুসন্ধান কর, আশেপাশের লোকজনকে জিজ্ঞসাবাদ কর। সন্দেহজনক কিছু দেখেছেন? অস্বাভাবিক কিছু? এরই মধ্যে প্রশ্নগুলো ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে ওয়ালান্ডারের মাথায়। তবে সে জানে, খামার ডাকাতির সমাধান কঠিনই বটে। এখন ভরসা ওই ভিক্টিম বৃদ্ধা। মহিলা সব জানেন, দেখেছেন স্বচক্ষে। তিনি বেঁচে গেলেই জানা যাবে কী ঘটেছিল। কিন্তু যদি মারা যান, তাহলে ডাবল মার্ডারের কেস সমাধান করতে গলদঘর্ম ছুটে যাবে পুলিশের।

অস্বস্তি হলো ওয়ালান্ডারের। অন্য সময় এই অস্বস্তি কর্মস্পৃহা আর শক্তি জোগায় তাকে। কর্মস্পৃহা আর শক্তি-ভালো পুলিশ অফিসার হওয়ার পূর্বশর্ত। একারণে নিজেকে সবসময় একজন চমৎকার পুলিশ অফিসার বলেই ভেবে এসেছে। কিন্তু আজ সেই ভাবনায় দোলা লাগল। ভয় আর ক্লান্তিতে ন্যুব্জ সে। জোর করে ফার্স্ট গিয়ারে নিয়ে এল গাড়ির গতি। কিছুদূর গিয়ে থেমে গেল আবারও। এতক্ষণে যেন উপলব্ধি করতে পারল, কী দেখেছে আজকের এই মৃত্যুশীতল সকালে।

অসহায় দম্পতির ওপর অমন পাশবিক ও বর্বর নির্যাতন ভড়কে দিয়েছে তাকে। এমন কিছু তো ঘটার কথা না, অন্তত এখানে না।

জানালা দিয়ে গাড়ির বাইরে তাকাল ওয়ালান্ডার। বাড়ছে বাতাসের গতি। শিস তুলছে দরজা-জানালার ফাঁকে ফাঁকে। কাজে নেমে পড়া দরকার, ভাবল সে। যেমনটা রিডবার্গ বলেছে: যারা এই কাজ করেছে, তাদের খুঁজে বের করতেই হবে।

হাসপাতালে চলে এল সে। লিফটে করে উঠে এল ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে। একটা রুমের বাইরে চেয়ারে বসে থাকতে দেখল তরুণ পুলিশ ক্যাডেটকে। মার্টিনসন। বিরক্ত হলো সে। এরকম এক অনভিজ্ঞ ছোকরা ছাড়া কী পাঠানোর মতো আর কেউ ছিল না? আর রুমের বাইরেই বা বসে আছে কেন? এর তো রোগীর পাশে বসে থাকার কথা, যাতে ভিক্টিমের বলা মৃদু ফিসফিসানিও শুনতে পায়।

"হ্যালো," বলল ওয়ালান্ডার। "কেমন আছে ভিক্টিম?"

"জ্ঞান ফেরেনি," জবাব দিল মার্টিনসন। "ডাক্তাররা খুব একটা আশাবাদী নন।"

"তুমি এখানে বসে কেন? ভেতরে বসতে বলা হয়নি তোমাকে?"

"ডাক্তাররা বলেছে কিছু ঘটলে জানাবে।"

ওয়ালান্ডার খেয়াল করল, অস্বস্তি বোধ করছে মার্টিনসন।

কে জানে, স্কুলের রাগী শিক্ষকের মতো শোনাচ্ছে হয়ত আমার কথাগুলো, ভাবল সে। তারপর সাবধানে দরজা ঠেলে ভেতরে তাকাল। যমঘরে রকমারি যন্ত্রের আনাগোনা। সাপের মতো দেয়াল বেয়ে একেবেঁকে উঠে গেছে স্বচ্ছ টিউব। রোগীর খাটের কাছে দাঁড়িয়ে চার্ট দেখছিল এক নার্স।

"আপনাদের বাইরে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছিল," তীর্যক স্বরে বলল সে।

ওয়ালান্ডার কিছু বলার আগেই হুড়মুড়িয়ে রুমের ঢুকে পড়ল একজন ডাক্তার। "অননুমোদিত ব্যক্তির প্রবেশ নিষেধ এখানে," বলল ওয়ালান্ডারকে দেখতে পেয়ে।

"চলে যাচ্ছি। রোগী কেমন আছে দেখতে এসেছিলাম," কৈফিয়ত দিল ওয়ালান্ডার। এরপর পুলিশ ইন্সপেক্টর হিসেবে পরিচয় দিল নিজের। "হোমিসাইড," যোগ করল সাথে, যদিও জানে না তাতে কিছু যায়-আসে কিনা। "এই কেসের তদন্তের দায়িত্বে আছি আমি। কেমন আছেন উনি?"

"বেঁচে যে আছেন, এটাই আশ্চর্যজনক," বলল তরুণ ডাক্তার। ওয়ালান্ডারকে ইশারা করল খাটের কাছে আসতে। "দেহের অভ্যন্তরে কতটা ইনজুরি হয়েছে, তা এখনই বলা যাচ্ছে না। বেঁচে থাকলে পরে দেখা যাবে। তবে শ্বাসনালী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যেন গলায় ফাঁস পরানো হয়েছিল শক্ত করে।"

"ঠিক তাই ঘটেছে," নিশ্চিত করল ওয়ালান্ডার। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল চাদর আর নানা টিউবের মাঝে লুকিয়ে থাকা চিমসে মুখখানার দিকে।

"মারা যেতে পারতো বৃদ্ধা," বলল ডাক্তার।

"আশা করছি বেঁচে উঠবেন," বলল ওয়ালান্ডার। "এই ঘটনার একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী উনি।"

"আমরা চাই আমাদের সব রোগী বেঁচে থাকুক," মনিটরের দিকে তাকিয়ে বলল ডাক্তার। ঢেউতোলা একটা সবুজ রেখা ক্রমাগত ভেসে যাচ্ছে পর্দায়।

ডাক্তারের কাছ থেকে আর কিছু জানতে না পেরে বেরিয়ে এল ওয়ালান্ডার। ভিক্টিমের অবস্থা অনিশ্চিত। অজ্ঞান অবস্থাতেই মারা যেতে পারেন মারিয়া লভগ্রেন। জানবার কোন উপায় নেই।

"লিপ-রিড করতে পার?" বাইরে অপেক্ষারত ক্যাডেটকে জিজ্ঞেস করল ওয়ালান্ডার।

"না," ভেসে এল বিস্মিত উত্তর।

"তাহলে তো সমস্যা," বলে লিফটের দিকে পা বাড়াল ওয়ালান্ডার।

ইস্তা পুলিশ স্টেশন শহরের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। হাসপাতাল থেকে সরাসরি স্টেশনে চলে এল সে। নিজের ডেস্কে বসে জানালা দিয়ে তাকাল পুরনো লালরঙা পানির ট্যাঙ্কের দিকে।

আমার দিন বোধ হয় ফুরিয়েছে, ভাবল সে। নতুন কাউকে দরকার এখন, যে কিনা জানুয়ারির এক সকালে সুইডিশ অজপাঁড়া গায়ে কোন বীভৎস হত্যাকান্ড দেখে কেঁপে উঠবে না। আমার মতো অনিশ্চয়তা আর মানসিক পীড়ায় ভুগবে না।

টেলিফোনের শব্দে বাঁধা পেল তার চিন্তার জট। হাসপাতাল থেকে, মনে হলো প্রথমেই। মারিয়া লভগ্রেনের মৃত্যু সংবাদ দিতে কল করেছে নিশ্চয়। কিন্তু মহিলার কি জ্ঞান ফিরেছিল? বলেছেন কিছু? বাজতে থাকা টেলিফোনের দিকে তাকিয়ে রইল সে। তেমন কিছু যেন না হয়, প্রার্থনা করল মনে মনে।

কিন্তু রিসিভার তুলে দেখে তার মেয়ে লিন্ডা ফোন দিয়েছে। স্বস্তির ধাক্কায় আরেকটু হলেই ফোনটা পড়ে যেত মেঝেতে।

"বাবা," বলল লিন্ডা।

"হ্যালো," বলল ওয়ালান্ডার। অপর প্রান্ত থেকে পে-ফোনে কয়েন ঢুকানোর শব্দ কানে এসেছে তার। "কোথা থেকে ফোন করছ?"

লিমা বা কাঠমুন্ডু থেকে না হলেই হলো, ভাবল মনে মনে। কিংবা কিনশাসা।

"আমি ইস্তায়।"

শুনে খুশি হলো ওয়ালান্ডার। তার মানে মেয়েকে দেখতে পাবে।

"তোমাকে দেখতে এসেছিলাম," বলল লিন্ডা। "কিন্তু মত পাল্টেছি। এখন ট্রেন স্টেশনে। চলে যাচ্ছি। এটা জানাতে ফোন দিয়েছি যে অন্তত তোমাকে দেখতে ইচ্ছা হয়েছিল আমার।"

তারপরই কেটে গেল কল। রিসিভার হাতে নিয়ে বসে রইল ওয়ালান্ডার। এমন কেন করল মেয়েটা?

লিন্ডার বয়স এখন উনিশ। চারটা বছর আগেও চমৎকার এক সম্পর্ক ছিল বাপ-মেয়ের মধ্যে। যে কোন সমস্যা, দ্বিধায় মায়ের কাছে না গিয়ে বরং বাবার কাছে যেত সে। সেসব দিনগুলো আজও চোখে ভাসে ওয়ালান্ডারের। কত দ্রুতই না ছোট্ট এক মেয়ে থেকে রূপবতী এক তরুণীতে পরিণত হলো তার মেয়েটা! পনেরো বছর বয়সে পা দেয়ার আগে পর্যন্ত কাউকে বুঝতেই দেয়নি গোপনে এক দানব লালন করছিল সে মনের ভেতর।

পনেরোতম জন্মবার্ষিকী পালনের পর, বসন্তের এক বিকেলে আত্মহত্যার চেষ্টা করে লিন্ডা। দিনটা ছিল শনিবার। বাগানের একটা চেয়ার মেরামত করছিল ওয়ালান্ডার। জানালার কাঁচ পরিষ্কার করছিল তার স্ত্রী। হঠাৎ করে অস্বস্তি হওয়ায় হাতুড়ি রেখে বাড়ির ভেতরে যায় ওয়ালান্ডার। নিজের রুমে খাটে পড়েছিল লিন্ডা। কব্জি আর গলার কাছটায় কাটা। পাশেই পড়েছিল একটা রেজর। পরে যখন মাথার ওপর থেকে মেঘ কেটে যায়, ডাক্তার বলেছিল, ওয়ালান্ডার যদি সঠিক সময়ে দেখতে না পেত আর বুদ্ধি করে প্রেশার ব্যান্ডেজ না লাগাতো, তাহলে বাঁচানো যেত না লিন্ডাকে।

এই শক কাটিয়ে উঠতে পারছিল না ওয়ালান্ডার। মেয়ের সাথে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায় এই ঘটনার পর। নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিল লিন্ডা। কেন আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল সে, আজও বুঝে উঠতে পারেনি ওয়ালান্ডার। পড়াশোনার পাট চুকিয়ে অদ্ভুত সব কাজের সাথে জড়িয়ে পড়তে থাকে লিন্ডা। মাঝে মাঝে গায়েব হয়ে যেত লম্বা সময়ের জন্য। দুবার তার নামে মিসিং ডায়েরি করতে হয়েছিল ওয়ালান্ডারকে স্ত্রীর চাপে পড়ে। নিজের মেয়ে হয়ে উঠেছিল তার তদন্তের বিষয়। তীব্র মনোকষ্টের ছাপ ফুটে উঠত তার চেহারায়। সহকর্মীদের চোখ এড়াতো না তা। তবে ফিরে আসত লিন্ডা। মেয়ের গতিবিধি জানতে তার পাসপোর্টই ছিল ওয়ালান্ডারের একমাত্র ভরসা।

কেন মত পাল্টালে, লিন্ডা? ভাবল সে। কেন দেখা করলে না বাবার সাথে?

আবারও বেজে উঠল টেলিফোন। ছোঁ মেরে তুলে নিল ওয়ালান্ডার।

"বাবা বলছি," বলে ফেলল না ভেবেচিন্তেই।

"মানে?" জিজ্ঞেস করলেন ওর বাবা। "আমি তো তোমাকে পুলিশ ভেবেছিলাম। আর এখন দেখছি বাবা সেজে বসে আছ।"

"আমার এখন কথা বলার সময় নেই, বাবা। পরে ফোন দিই?"

"না, এখনই কথা বলতে হবে। এত কিসের তাড়া?"

"মারাত্মক এক অপরাধ ঘটেছে আজ সকালে। পরে কল দিব।"

"কী ঘটেছে?"

প্রায় প্রতিদিনই ফোন দেন ওয়ালান্ডারের বয়স্ক পিতা। মাঝে মাঝে ত্যক্তবিরক্ত ওয়ালান্ডার সুইচবোর্ডকে বলে রাখে যাতে ওর বাবার কোন কল গ্রহণ করা না হয়। ওর পিতাও কম যান না। ছেলের কান্ড ধরতে পেরে বেনামে ফোন দিই এখন। কণ্ঠস্বর পাল্টে ধোকা দিই অপারেটরকে।

পিতাকে নিরস্ত করতে একটা উপায়ই দেখতে পেল ওয়ালান্ডার।

"রাতে আপনার সাথে দেখা করতে যাব," বলল সে। "তখন বলব সব।"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও সম্মত হলেন ওর পিতা। "সাতটার দিকে এসো। তখন ফাঁকা থাকব আমি।"

"ঠিক আছে। দেখা হবে সাতটায়।"

ফোন রেখে ইনকামিং কল ব্লক করার বাটন চেপে দিল ওয়ালান্ডার। ট্রেন স্টেশনে গিয়ে মেয়েকে খুঁজবে কিনা ভাবল একবার। যদি পুরনো সম্পর্কটা কোনভাবে পুনর্জীবিত করা যায়। পরমুহূর্তেই বাদ দিল চিন্তাটা। মেয়েকে চিরতরে হারানোর কোন ইচ্ছাই নেই তার।

দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল একটা মাথা।

"হ্যালো," বলল নাসলুন্ড। "ভেতরে নিয়ে আসব?"

"কাকে?"

ঘড়ির দেখল নাসলুন্ড।

"নয়টা বেজে গেছে। গতকাল বলেছিলেন, নয়টা বাজে ক্লাস ম্যানসনের জবানবন্দি নেবেন।"

"কোন ক্লাস ম্যানসন?"

নাসলুন্ডের চোখে অবিশ্বাস। "এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলেন? ওই যে, ওস্তেলিয়েদেনের একটা দোকানে ডাকাতি করল যে লোকটা।"

মুহূর্তেই মনে পড়ে গেল ওয়ালান্ডারের। সেই সাথে খেয়াল হলো, গতরাতে ঘটে যাওয়া খুনটার কথা নাসলুন্ড জানে না।

"তুমি সামলাও গিয়ে ম্যানসনকে," বলল সে। "গতরাতে লুনাপে এক বৃদ্ধ খুন হয়েছে। তার স্ত্রী মারা গেলে ডাবল মার্ডারের কেস হবে এটা। তুমি ম্যানসনের জবানবন্দি নাও। এখন আমি এখন লুনাপের ঘটনাটার তদন্তে ব্যস্ত।"

"ম্যানসনের উকিলও চলে এসেছে," বলল নাসলুন্ড। "তুলকালাম ঘটিয়ে ফেলবে সে আজ ফেরত পাঠালে।"

"কিছু করার নেই," বলল ওয়ালান্ডার। "যা করার করুক ওই উকিল ব্যাটা। তুমি টুকটাক প্রশ্ন কর গিয়ে ম্যানসনকে। আর দশটায় আমার অফিসে কেস মিটিং এর ব্যবস্থা কর। সবাই যেন থাকে।"

অবশেষে গতি ফিরে পেয়েছে সে। আবারও পরিণত হয়েছে একজন পুলিশ অফিসারে। স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে আপাতত না ভাবলেও চলবে। শিকারে নামতে হবে তাকে। ধরতে হবে এক বা একাধিক খুনিকে। কাগজের স্তূপে বোঝাই হয়ে ছিল ডেস্ক। নিমিষেই তা খালি করে ফেলল ওয়ালান্ডার। একটা ফুটবল লটারি ফর্ম ছিড়ে ফেলল, যেটা কোনদিনই পূরণ করা হত না। তারপর ক্যান্টিনে গিয়ে চুমুক বসাল কফির কাপে।

সকাল দশটায় সকলে জমায়েত হলো তার অফিসে। ক্রাইম-সিন থেকে ডেকে আনা হয়েছে রিডবার্গকে। জানালার ধারে চেয়ারে বসে আছে সে। সাতজন পুলিশ সদস্য দাঁড়িয়ে, বসে আছে রুমটায়। হাসপাতালে ফোন দিল ওয়ালান্ডার। উন্নতি হয়নি মিসেস লভগ্রেনের, জানাল ডাক্তার। বাকিদের পুরো ঘটনাটা খুলে বলল ওয়ালান্ডার।

"কল্পনাও করতে পারবে না কী নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে," বলল সে। "তাই না, রিডবার্গ?"

"হ্যাঁ," সায় দিল রিডবার্গ। "আমেরিকান মুভিগুলোতে যেমন দেখায়, ওরকমই। এমনকি রক্তের গন্ধও পাওয়া যাচ্ছিল। এরকম হয় না সাধারণত।"

"অপরাধীদের খুঁজে বের করতে হবে। এসব পশুদের বাইরে ছেড়ে রাখা যাবে না," বলে প্রেজেন্টেশন শেষ করল ওয়ালান্ডার।

কথা জোগালো না কারও মুখে। চেয়ারের হাতলে রিডবার্গের একটানা টোকা দেয়ার শব্দ। বাইরে করিডোর থেকে ভেসে এল নারীকণ্ঠের উচ্চ হাসি। রুমের মানুষগুলোর ওপর চোখ বুলাল ওয়ালান্ডার। এরা কেউই ওর বন্ধু না। তবুও ওরা সবাই একই টিমের সদস্য।

"তাহলে বসে আছি কেন?" বলল সে। "কাজে লেগে পড়া যাক।"

তখন বাজে সকাল ১০.৪০।

তিন

বিকেল চারটার দিকে পেটে ছুঁচোর নাচন টের পেল ওয়ালান্ডার। দুপুরে কিছু মুখে ঢুকানোর সুযোগ হয়নি। কেস মিটিং এর পরের সময়টা কেটেছে খুনিদের ধরার পরিকল্পনায়। খুনির সংখ্যা এখনও জানা যায়নি ঠিকই। তবে একজনের পক্ষে এমন রক্তবন্যা বইয়ে দেয়া সম্ভব বলে মানতে কষ্ট হচ্ছে তার।

চেয়ারে গা এলিয়ে বসার সুযোগ যখন পেল, ততক্ষণে আঁধার নেমেছে বাইরে। এক গাদা মেসেজ রেখে গেছে সুইচবোর্ডের কর্মরত মহিলা। স্লিপগুলোর মধ্যে মেয়ের নাম খুঁজল ওয়ালান্ডার। না পেয়ে সব কাগজ ঢেলে দিল ইন-ট্রেতে। খানিকক্ষণ পরেই প্রেস কনফারেন্স। কিন্তু কী বলবে সাংবাদিকদের? ইয়োহানেস লভগ্রেনের খুনি বা খুনিদের ব্যাপারে পুলিশ এখনও অন্ধকারে। এই সত্যটা ক্যামেরার সামনে বলার তিক্ততা এড়াতে রিডবার্গকে টিভি ক্রুদের দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করেছে ওয়ালান্ডার। তবে প্রেস রিলিজ তাকেই লিখতে হবে আর বিতরণ করতে হবে। ডেস্কের ড্রয়ার থেকে এক পাতা কাগজ বের করে নিল সে। কিন্তু কী লিখবে বুঝতে পারছে না। কেসটা ঘিরে অসংখ্য প্রশ্ন এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। কিন্তু দিগন্তে উত্তরের নিশানা নেই।

অপেক্ষায় কেটে গেছে দিনটা। ইনটেনসিভ কেয়ারে মৃত্যুর সাথে যুঝছেন ঘটনার একমাত্র সাক্ষী বৃদ্ধা। রাতের গহীনে ওই খামারবাড়িতে কী ঘটেছিল তা কি আদৌ জানা যাবে তার থেকে? নাকি কিছু বলার আগেই পাড়ি জমাবেন তিনি পরপারে?

জানালা দিয়ে একবার বাইরে অন্ধকারে তাকাল ওয়ালান্ডার। তারপর প্রেস রিলিজের বদলে সারাদিনে যা যা ঘটেছে তার সারমর্ম লিখতে শুরু করল। লেখা শেষে দেখল, কোন অগ্রগতিই হয়নি। এক বয়স্ক দম্পতিকে নৃশংস ভাবে অত্যাচার করা হয়েছে। তাদের কোন শত্রু নেই, লুকানো সম্পদ নেই। প্রতিবেশীরা কিছুই দেখতে পায়নি। দুষ্কৃতিকারীরা চলে গেলে তারা ভাঙা জানালা দেখতে পায় এবং বৃদ্ধার আর্তনাদ শুনতে পায়। এখন পর্যন্ত কোন সূত্র পায়নি রিডবার্গ। এটুকুই।

শহরের বাইরে নিরিবিলিতে বাস করা বৃদ্ধরা বরাবরই ডাকাতদের লক্ষ্যবস্তু। অর্থের জন্য এসব বৃদ্ধদের খুন করতে পর্যন্ত দ্বিধা করে না। কিন্তু লভগ্রেনদের ঘটনাটা একদমই আলাদা, ভাবল ওয়ালান্ডার। মিসেস লভগ্রেনের

গলায় পরানো ফাঁসের মধ্যে মিশে আছে বর্বরতা আর ঘৃণার ছাপ, কিংবা হতে পারে প্রতিশোধের। কিছু একটা মিলছে না একদমই।

আশা আর অপেক্ষা করা ছাড়া এখন কিছুই করার নেই। দিনভর লুনাপে বসবাসীদের সাথে কথা বলেছে পুলিশ পেট্রল। জানতে চেয়েছে কেউ কিছু দেখেছে কিনা। এই ধরণের অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধীরা সাধারণত আগে থেকে ঘটনাস্থলের ওপর নজর রাখে। হয়ত খামারবাড়িতে কোন সূত্র পেয়ে যাবে রিডবার্গ।

ঘড়ি দেখল ওয়ালান্ডার। শেষ কতক্ষণ আগে যেন হাসপাতালে ফোন করেছিল? পঁয়তাল্লিশ মিনিট? এক ঘন্টা? প্রেস রিলিজ লেখা পর্যন্ত অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল সে। ওয়াকম্যানে জুসি বিয়োরলির ক্যাসেট ঢুকিয়ে হেডফোন লাগিয়ে নিল কানে। রিগোলেট্টো এর মনমাতানো সুর কান জুড়িয়ে দিল ওর। ত্রিশের দশকে করা রেকর্ডিং এর ঝিরিঝিরি শব্দ কোন প্রভাবই ফেলতে পারেনি।

আট লাইনে শেষ হয়ে গেল প্রেস রিলিজ। একজন কেরানিকে কাগজটা ধরিয়ে দিল ওয়ালান্ডার টাইপ করে ফটোকপি করার জন্য। সেই ফাঁকে চোখ বুলিয়ে নিল একটা প্রশ্নপত্রে। লুনাপে বসবাসকারীদের কাছে পাঠানো হবে এই প্রশ্নপত্র। অস্বাভাবিক কিছু দেখেছেন কি? এমন কিছু, যা ঘটে যাওয়া বীভৎস হত্যাকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে? ওয়ালান্ডার অবশ্য জানে, ঝামেলা বৈকি লাভ কিছু হবে না এই প্রশ্নপত্র থেকে। মানুষজনের কাছে পৌঁছানো মাত্রই ফোন আসা শুরু হবে। আর দুজন অফিসারকে ঠাঁই বসিয়ে রাখতে হবে ওসব অযাচিত কল ধরার জন্য।

তবুও, না পাঠিয়ে উপায় নেই, ভাবল সে। অন্তত নিজেদের সান্ত্বনা দিতে পারব এই বলে যে কেউ কিছু দেখেনি। অফিসে ফিরে গিয়ে হাসপাতালে ফোন দিল সে। পরিস্থিতি পাল্টায়নি। মিসেস লভগ্রেনের অবস্থা আগের মতোই। ফোন কেটে দিতেই নাসলুন্ড এসে ঢুকল।

"যা বলেছিলাম," বলল সে।

"কী হয়েছে?"

"ম্যানসনের উকিল রেগে বোম।"

শ্রাগ করল ওয়ালান্ডার। "মেনে নিতে হবে। কিছু করার নেই।"

কপাল চুলকাল নাসলুন্ড। জানতে চাইল কেমন চলছে তদন্ত।

"সবে শুরু করলাম। দেখা যাক।"

"প্রাথমিক ফরেনসিক রিপোর্ট তো চলে এসেছে দেখলাম।"

উপরে উঠে গেল ওয়ালান্ডারের ভুরু। "আমি কেন হাতে পাইনি?"

"হ্যানসনের অফিসে আছে।"

"রিপোর্ট কি সেখানে পাঠানোর কথা?"

করিডোরে বেরিয়ে এল ওয়ালান্ডার। সবসময় একই ভুল, গজগজ করল মনে মনে। যেখানে পাঠানোর কথা, সেখানে পাঠানো হয় না কাগজপত্র।

নক করে হ্যানসনের অফিসে প্রবেশ করল ওয়ালান্ডার। ফোনে কথা বলছে হ্যানসন। বেটিং স্লিপ আর রেসের ফর্ম গাইডে একাকার হয়ে আছে তার ডেস্ক। লুকানোর কোন চেষ্টাই করেনি। ঘোড়দৌড় তার নেশা। দিনের বেশিরভাগ সময় কাটায় ঘোড়া প্রশিক্ষকদের ফোন করে তাদের পরামর্শ চেয়ে। এ কথা স্টেশনের সবারই জানা। তারপর সন্ধ্যা অতিবাহিত হয় সব ধরণের বেটিং সিস্টেম পর্যালোচনা করে। কীভাবে বেশি লাভ করা যায়, এ ধান্ধায় থাকে সবসময়। গুজব আছে যে একবার বড় একটা দাও মেরেছে হ্যানসন। অবশ্য তার জীবনযাত্রা দেখে তা বোঝার উপায় নেই।

ওয়ালান্ডারকে দেখে মাউথপিসে হাত রাখল সে।

"ফরেনসিক রিপোর্ট কি তোমার কাছে?" জিজ্ঞেস করল ওয়ালান্ডার।

একটা প্লাস্টিক ফোল্ডারের দিকে ইঙ্গিত করল হ্যানসন। "তোমার কাছেই পাঠাচ্ছিলাম।"

"সাত নম্বর রেসের চার নম্বর ঘোড়া জিতবে," ডেস্ক থেকে ফোল্ডার নিতে নিতে বলল ওয়ালান্ডার।

"মানে?"

"মিলিয়ে নিও আমার কথা।"

হা হয়ে গেল হ্যানসনের মুখ। তাকে ওই অবস্থাতেই রেখে বেরিয়ে এল ওয়ালান্ডার। করিডোরের ঘড়িতে দেখল, প্রেস কনফারেন্সের আরও আধা ঘন্টা দেরি। ফিরে এল অফিসে। তারপর মন দিয়ে পড়তে লাগল ফরেনসিক রিপোর্ট।

ইয়োহানেস লভগ্রেনের মৃত্যুর আসল কারণ নির্ণয় করতে পারেনি ডাক্তার। তবে সম্ভব্য কিছু কারণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আটটা গভীর ক্ষত পাওয়া গেছে ভিক্টিমের শরীরে। ধারালো কোন যন্ত্র, সম্ভবত কম্পাস করাত দিয়ে করা হয়েছে আঘাত গুলো। গুড়িয়ে দেয়া হয়েছে ডানপাশে ফিমার হাড়, বাম হাতের অপরের অংশ আর কব্জি। পোড়া ক্ষতস্থানের চিহ্ন রয়েছে শরীরে। ফুলে গিয়েছে অন্ডথলি। আঘাতের চিহ্ন রয়েছে কপালেও।

অফিসিয়াল রিপোর্টের পাশে ছোট্ট করে একটা নোট লিখে রেখেছে ডাক্তার। "যে খুনটা করেছে, সে একটা জানোয়ার। যে পরিমাণ অত্যাচার করা হয়েছে, তাতে ভিক্টিমকে চার-পাঁচবার মেরে ফেলা যেত।"

হাত থেকে রিপোর্ট রেখে দিল ওয়ালান্ডার। তিক্ততায় ভরে গেছে মন। কিছু একটা ঠিক নেই। ঘৃণা থেকে কখনও আক্রমণ করে না ডাকাতেরা। তারা চায় শুধু টাকা। তাহলে অমন অমানুষিক অত্যাচার কেন করা হলো?

উত্তর না পেয়ে কেসের সারমর্মটা আবারও পড়ল সে। কিছু কি ভুলে গেছে? চোখ এড়িয়ে গেছে কি এমন কিছু যা হতে পারে মূল্যবান কোন সূত্র? যদিও পুলিশি কাজ মূলত ধৈর্য সহকারে সূত্র খুঁজে যাওয়া, তবে অভিজ্ঞতা বলে, ক্রাইম-সিন থেকে প্রাপ্ত প্রাথমিক ধারণাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আর যদি অন্য কেউ পৌঁছার আগে সর্বপ্রথমে ঘটনাস্থল পরীক্ষা করে দেখা যায়, তবে তো কথাই নেই।

সারমর্মে এমন কিছু আছে যা ওয়ালান্ডারকে খুঁচিয়ে যাচ্ছে। কী বাদ পড়েছে? ভেবেও কূলকিনারা পেল না সে।

দরজা খুলে প্রবেশ করল এক মহিলা। দিয়ে গেল টাইপ করা প্রেস রিলিজ আর কপিগুলো। প্রেস কনফারেন্সের যাওয়ার আগে ম্যানস রুমে গেল ওয়ালান্ডার। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখল নিজেকে। কানের পাশে বেরিয়ে আছে বাদামী চুল। কাটার সময় হয়ে গেছে। ওজনও কমাতে হবে। স্ত্রী চলে যাবার পর গত তিন মাসে অন্তত সাত কেজি ওজন বেড়েছে তার। একাকীত্বের দিনগুলি কাটছে পিৎজা, হ্যামবার্গার আর পেস্ট্রি খেয়ে। ওজন তো বাড়বেই।

"কী হাল করেছ নিজের খেয়াল আছে?" জোরে বলল সে। "একটা থলথলে মাংসের বস্তায় পরিণত হয়েছ।"

সিদ্ধান্ত নিল খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করার। দরকার হলে আবারও সিগারেট ধরবে। তবুও ওজন কমাতেই হবে। বেশিরভাগ পুলিশদেরই বিচ্ছেদ হয়ে যায় কেন, ভেবে অবাক হলো সে। কেন তাদের স্ত্রীরা চলে যায়? মাঝেমাঝে যখন রহস্য-রোমাঞ্চ উপন্যাসগুলো পড়ে, দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে তার বুক চিরে। বাস্তবতার সাথে খুব একটা তফাৎ নেই কল্পনার।

মানুষে গিজগিজ করছে প্রেস কনফারেন্স কামরা। বেশিরভাগ সাংবাদিককেই চেনে ওয়ালান্ডার। তবে অপরিচিত কিছু মুখও দেখা যাচ্ছে। একটা কমবয়সী মেয়ের ওপর চোখ পড়ল তার। মুখভর্তি ব্রণ। কামার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

প্রেস রিলিজ বিলি করে দিয়ে চেয়ারে বসে পড়ল ওয়ালান্ডার। ইস্তা পুলিশ চীফেরও থাকার কথা। কিন্তু সে এখন স্পেনে শীতকালীন ছুটি কাটাচ্ছে। টিভি ক্রুদের নিয়ে ব্যস্ত রিডবার্গ। ওদিকটা সামলানো হলে উপস্থিত হওয়ার কথা দিয়েছে সে। তার আগ পর্যন্ত সব ওয়ালান্ডারের ঘাড়ে।

"প্রেস রিলিজ পেয়ে গেছেন আশা করি," শুরু করল সে। "এর বেশি কিছু বলার নেই আপাতত।"

"প্রশ্ন করা যাবে?" জিজ্ঞেস করল এক সাংবাদিক। ওয়ালান্ডার চিনতে পারল তাকে। দ্য ওয়ার্কার এ কাজ করে।

"নিশ্চয়। সে কারণেই এসেছি আমি," বলল ওয়ালান্ডার।

"কিছু মনে করবেন না," বলতে লাগল সাংবাদিক। "এই প্রেস রিলিজে তো বলতে গেলে কিছুই নেই।"

"কারণ আমাদের হাতে এর চেয়ে বেশি কোন তথ্য নেই। খুনিদের সম্পর্কে আপাতত কিছুই জানি না।"

"তারমানে খুনির সংখ্যা একের অধিক?"

"সম্ভবত।"

"কিভাবে বুঝলেন?"

"আমাদের ধারণা। তবে আমরা নিশ্চিত নই।"

মুখ বাঁকালো সাংবাদিক। আরেকজন পরিচিত সাংবাদিকের উদ্দেশ্যে মাথা দোলাল ওয়ালান্ডার।

"মি লভগ্রেনকে কিভাবে হত্যা করা হয়েছে?"

"কোন কিছু দিয়ে আঘাত করে।"

"একটু খোলাসা করে বলুন। কথাটার অনেক রকম অর্থ হতে পারে!"

"আসলে কারণটা এখনও আমাদের অজানা। ময়নাতদন্তের কাজ শেষ হয়নি এখনও। কয়েকদিন সময় লাগবে।"

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল সাংবাদিক। কিন্তু বাঁধা পেল ব্রণওয়ালা মেয়েটার কারণে। তার হাতে একটা টেপ রেকর্ডার। রেকর্ডারের গায়ে স্থানীয় রেডিও স্টেশনের নাম লেখা।

"ডাকাতেরা কি কিছু নিয়ে গেছে?"

"জানা যায়নি," জবাব দিল ওয়ালান্ডার। "আসলে এটা কোন ডাকাতির ঘটনা কিনা, তাও নিশ্চিত হয়ে বলা যাচ্ছে না।"

"তাছাড়া আর কী হতে পারে?"

"এই মুহূর্তে বলতে পারছি না।"

"এমন কোন সূত্র পাওয়া গেছে কি যার কারণে আপনার এটাকে ডাকাতি বলে মনে হচ্ছে না?"

"না।"

গরমে ঘামাতে শুরু করেছে ওয়ালান্ডার। চাকুরির প্রথমদিকে স্বপ্ন দেখত প্রেস কনফারেন্স করার। কিন্তু তার স্বপ্নে কখনও এতটা গরম আর ভিড় ছিল না।

"একটা প্রশ্ন করেছি," কামরার পিছনদিক থেকে একজন সাংবাদিককে বলতে শুনল সে।

"শুনতে পাইনি, আবার বলুন," বলল ওয়ালান্ডার।

"পুলিশ কি এই ঘটনাটা গুরুত্ব সহকারে দেখবে?"

প্রশ্নটা শুনে বিস্মিত না হয়ে পারল না ওয়ালান্ডার।

"কেন না? অবশ্যই আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা থাকবে এই খুনের কিনারা করার।"

"বাড়তি রিসোর্সের প্রয়োজন পড়বে কি?"

"এখনই তা বলা যাচ্ছে না। দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করছি আমরা। আপনার প্রশ্নটা বুঝতে পারিনি।"

মোটা চশমা পরা এক তরুণ সাংবাদিক এগিয়ে এল সামনে। একে আগে দেখেনি ওয়ালান্ডার।

"আজকালকার দিনে তো সুইডেনে বৃদ্ধদের গুরুত্ব দেওয়া হয় না।"

"আমরা দিব," জবাব দিল ওয়ালান্ডার। "অপরাধীদের ধরতে যা যা করণীয়, সবই করব আমরা। স্কেওনাতে অনেক বয়স্ক মানুষ রয়েছেন যারা নির্জন খামারবাড়িতে থাকতে পছন্দ করেন। তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করে যাচ্ছি আমরা।"

উঠে দাঁড়াল সে। "আজকের মতো এখানেই সমাপ্তি," বলল সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে। "নতুন কিছু রিপোর্ট করার থাকলে আপনাদের জানানো হবে। ধন্যবাদ আসার জন্য।"

কামরা ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল সে। এমন সময় পথরোধ করলো স্থানীয় রেডিও স্টেশনের সেই তরুণী।

"আমার আর কিছু বলার নেই," বলে পাশ কাটাতে চাইল ওয়ালান্ডার।

"আপনার মেয়ে লিন্ডাকে চিনি আমি," বলল তরুণী।

থমকে গেল ওয়ালান্ডার। "লিন্ডাকে চেনো? কিভাবে?"

"কয়েকবার দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে আমাদের।"

সামনে দাঁড়িয়ে থাকা তরুণীকে মনে করবার চেষ্টা করল ওয়ালান্ডার। আসলেই কি লিন্ডার সহপাঠী ছিল কখনও?

ওর মনে কথা পড়তে পেরেই যেন মাথা নাড়াল তরুণী।

"আপনি আমাকে চিনবেন না। আপনার সাথে কখনও দেখা হয়নি। লিন্ডার সাথে আমার পরিচয় মালমোতে।"

"ও, আচ্ছা।"

"চমৎকার মেয়ে। আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে পারি এখন?"

একটু আগে যা বলেছিল, সে কথাটাই মেয়েটার মাইক্রোফোনে বলল ওয়ালান্ডার আবারও। লিন্ডাকে নিয়ে কথা বলার আগ্রহ যে হচ্ছে না তার, এমন না। কিন্তু হাতে সময় বা সুযোগ কোনটাই নেই।

"লিন্ডাকে বলবেন আমার কথা," টেপ রেকর্ডার গুছিয়ে নিতে নিতে বলল মেয়েটা। "বলবেন ক্যাথরিন বা ক্যাটিস হ্যালো বলেছে।"

"অবশ্যই," বলল ওয়ালান্ডার।

অফিসে ফিরে টের পেল, গুড়গুড় করছে পেটের ভেতর। ক্ষুধায়, নাকি উদ্বেগে? নাহ, এভাবে আর চলছে না, ভাবল সে। আমাকে মেনে নিতে হবে যে আমার স্ত্রী আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। লিন্ডা নিজ থেকে যোগাযোগ না করলে আমার কিছুই করার নেই। এখন এটাই আমার জীবন...

ছয়টা বাজার কিছু আগে আরেকটা মিটিং এর জন্য জড়ো হলো তদন্তকারী টিম। হাসপাতাল থেকে নতুন কোন খবর আসেনি।

"রাতের বেলায় ওখানে কাউকে বসে থাকতে হবে," বলল ওয়ালান্ডার।

"তার কি কোন দরকার আছে?" হ্যানসনের কণ্ঠে বিস্ময়। "রুমে একটা টেপ রেকর্ডার রেখে দিলেই তো হয়ে যায়। বৃদ্ধা জেগে উঠলে নার্স সেটা চালু করে দিবে।"

"দরকার আছে," বলল ওয়ালান্ডার। "আমি মাঝরাত থেকে সকাল ছয়টা পর্যন্ত থাকতে পারব। মাঝরাত পর্যন্ত কে থাকতে চাও?"

মাথা দোলাল রিডবার্গ। "আমি থাকব। বাসায় বসে থাকা যা, হাসপাতালেও তা।"

চারপাশে তাকাল ওয়ালান্ডার। ফ্লুরেসেন্টের আলোয় মুখগুলো কেমন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে।

"অগ্রগতি কতদূর?" জিজ্ঞেস করল সে।

"লুনাপে বাড়ি বাড়ি গিয়ে কথা বলেছি আমরা," বলল পিটারস। "কেউ কিছু দেখেনি। তবে চিন্তাভাবনা করার জন্য সময় দেয়া উচিত লোকজনকে। ওখানকার বেশিরভাগ অধিবাসী বয়স্ক। সবাই ভয়ে সিঁটিয়ে আছে। এক তরুণ পোলিশ দম্পতি থাকে অবশ্য। সম্ভবত অবৈধ ভাবে। তবে আমি ওসব নিয়ে বিরক্ত করিনি। আগামীকাল চেষ্টা করে দেখব আরেকবার।"

মাথা দুলিয়ে রিডবার্গের দিকে তাকাল ওয়ালান্ডার।

"ঘটনাস্থলে অনেকগুলো আঙ্গুলের ছাপ পাওয়া গেছে," বলল রিডবার্গ। "ওখান থেকে হয়ত কিছু পাওয়া যেতে পারে। তবে খুব বেশি আশা না করাই ভালো। গিঁটটাই বরং আমাকে বেশি ভাবাচ্ছে।"

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল ওয়ালান্ডার। "কিসের গিঁট?"

"ফাঁসের গিঁট।"

"ও নিয়ে ভাবাভাবির কী আছে?"

"ওরকম গিঁট আগে দেখিনি।"

"ফাঁস দেখেছ কখনও?" মাঝখান থেকে বলে উঠল হ্যানসন। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে সে, চলে যেতে প্রস্তুত।

"দেখেছি," জবাব দিল রিডবার্গ। "আমি চেষ্টা করব ওই গিঁট থেকে কিছু বের করা যায় কিনা।"

ওয়ালান্ডার জানে, রিডবার্গের মুখ থেকে আর কিছু বের করা যাবে না। তবে গিঁট নিয়ে যদি তার মনে সন্দেহ জেগে থাকে, তাহলে সেটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু না হয়েই যায় না।

"আগামীকাল সকালে প্রতিবেশীদের সাথে কথা বলতে যাব আরেকবার," বলল ওয়ালান্ডার। "আচ্ছা, লভগ্রেনদের সন্তানদের খোঁজ পাওয়া গেছে?"

"মার্টিনসন চেষ্টা করে যাচ্ছে," জানাল হ্যানসন।

"মার্টিনসন না হাসপাতালে?" ওয়ালান্ডারের কণ্ঠে বিস্ময়।

"না," সুইয়েডবারের সাথে বদল করেছে।

"তাহলে সে এখন কোথায়?"

কেউ জানে না মার্টিনসন কোথায়। সুইচবোর্ডে কল দিলে জানা গেল, প্রায় এক ঘন্টা আগে বেরিয়ে গেছে।

"ওর বাসায় ফোন দাও," বলল ওয়ালান্ডার।

তারপর ঘড়ির দিকে তাকাল।

"সকাল দশটায় আবার মিটিং বসবে," বলল সে। "আর আসার জন্য ধন্যবাদ। সকালে দেখা হবে তাহলে।"

মার্টিনসন যখন ফোন ধরল, ততক্ষণে সবাই চলে গেছে।

"ওহ, সরি," বলল সে। "ভুলেই গিয়েছিলাম যে মিটিং আছে।"

"সন্তানদের কী খবর?"

"ভালো না। রিকার্ডের জলবসন্ত হয়েছে মনে হয়।"

"আমি লভগ্রেনদের দুই মেয়ের কথা বলছি।"

"আমার মেসেজ পাননি আপনি?" মার্টিনসনের কণ্ঠে বিস্ময়।

"আমি কোন মেসেজ পাইনি।"

"সুইচবোর্ডের একটা মেয়েকে দিয়ে এসেছিলাম আপনাকে দেয়ার জন্য।"

"ঠিক আছে, দেখছি বিষয়টা। তুমি বল কী হয়েছে।"

"লভগ্রেনদের পঞ্চাশ বছর বয়স্কা এক মেয়ে থাকেন কানাডায়। উইনিপিগ না কোথায় যেন। ফোন করার সময় ভুলেই গিয়েছিলাম যে ওখানে তখন মধ্যরাত। আমার কথা বিশ্বাসই করতে চাইছিলেন না মহিলা। পরে তার স্বামী এসে ফোন ধরে। মজার ব্যাপার হলো, তিনিও একজন পুলিশ। রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশের সদস্য। আগামীকাল আবার কল দিব তাদের। তবে উনারা চলে আসবেন। আরেক মেয়ের বয়স সাতচল্লিশ বছর। ইংগাতেবোরিয়ায় অবস্থিত রুবি হোটেলের বুফে ম্যানেজার। যদিও সুইডেনে থাকেন, তবুও খুঁজে পেতে বেশ কষ্ট হয়েছে। সমস্যা হলো, ভদ্রমহিলা কোচ হিসেবে একটা হ্যান্ডবল টিমের সাথে নরওয়ে গিয়েছেন। তবে কর্তৃপক্ষ বলেছে, মহিলাকে জানিয়ে দিবে। লভগ্রেনদের আরও অনেক আত্মীয়স্বজন আছে। সুইচবোর্ডে আমি একটা লিস্ট দিয়ে এসেছি। বেশিরভাগই স্কেওনাতে থাকে। সকালের পত্রিকায় খবরটা দেখলে হয়ত অনেকেই ফোন দিবে।"

"চমৎকার কাজ করেছ," বলল ওয়ালান্ডার। "সকাল ছয়টায় কি হাসপাতালে চলে আসতে পারবে? তার আগ পর্যন্ত আমি পাহারায় থাকব। যদি মহিলা ততক্ষণ বেঁচে থাকেন আরকি।"

"আমি সময়মত পৌঁছে যাব," বলল মার্টিনসন। "কিন্তু আপনার এভাবে রাত জাগা কি ঠিক হবে?"

"কেন না?"

"এই কেসটার তদন্তে নেতৃত্ব দিচ্ছেন আপনি। আপনার বিশ্রাম দরকার।"

"এক রাত না ঘুমালে কিছু হবে না," বলে কল কেটে দিল ওয়ালান্ডার।

ওভারকোট পরে ডেস্কের ল্যাম্প নিভিয়ে দিল সে। তারপর বেরিয়ে এল অফিস থেকে। রিসেপশন এরিয়া পর্যন্ত চলে যাওয়া করিডোরে জনমানুষের চিহ্ন নেই। এটা কাঁচের কিউবিক্যালে মাথা ঢুকিয়ে দিল সে। কর্মরত অপারেটর ম্যাগাজিনের পাতা উল্টিয়ে সময় পার করছে। ভালো করে খেয়াল করে ওয়ালান্ডার দেখল, ম্যাগাজিন না, অপারেটরের হাতে ওটা ফর্ম গাইড। আজকাল কি সবাই ঘোড়দৌড়ে বাজি ধরা শুরু করেছে নাকি?

"মার্টিনসন বোধ হয় আমার জন্য কিছু রেখে গেছে," বলল সে।

এবা ত্রিশ বছর পুলিশ ডিপার্টমেন্টে কাজ করছে। ওয়ালান্ডারকে দেখে হাসল সে। তারপর মাথা দুলিয়ে ইঙ্গিত করলো কাউন্টারের দিকে।

"ইয়ুথ এমপ্লয়মেন্ট ব্যুরো থেকে আসা মেয়েটা দিতে ভুলে গিয়েছিল মনে হয়," মুখে হাসি ধরে রেখে বলল এবা। "মেয়েটা ভালো, তবে কাজকর্মে এখনও কাঁচা।"

মাথা দোলাল ওয়ালান্ডার। "আমি চলে যাচ্ছি। কয়েক ঘন্টা পর বাসায় যাব। এর মধ্যে যদি কিছু ঘটে, আমার বাবার বাসায় ফোন করে জানাবে।"

"মিসেস লভগ্রেনকে নিয়ে দু:শ্চিন্তায় আছ মনে হয়," বলল এবা।

ওপরে-নিচে মাথা দোলাল ওয়ালান্ডার।

"বেচারি। কী কষ্টটাই না পেয়েছে!"

"হ্যাঁ," দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল ওয়ালান্ডার। "মাঝে মাঝে ভেবে কূল পাই না। কী যে হলো দেশটার!"

কাঁচের দরজা বাইরে এসে দাঁড়াতেই শীতল বাতাসের এসে লাগল ওর মুখে। শীতল, হাড়ে কাঁপন ধরিয়ে দেয়। দ্রুত পা চালাল। তুষার না পড়লেই হয়, ভাবল গাড়ির দিকে যেতে যেতে। অন্তত যতক্ষণ না অপরাধীদের ধরতে পারছি।

গাড়িতে বসে গ্লোভ কম্পার্টমেন্টে রাখা ক্যাসেট ঘাটতে লাগল সে। শেষমেশ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পেরে ভার্ডির রিকুইয়াম ঢুকিয়ে দিল টেপ ডেকে। দামি স্পিকার ছাড়িয়ে সমুধুর সুর ছড়িয়ে পড়ল গাড়ির পরতে পরতে। চলতে শুরু করল গাড়ি। রাস্তায় শুকনো পাতার ঘূর্ণি তুলে চলল ড্রাগনগতা ছাড়িয়ে ওস্তেলিয়েদেনের দিকে। আবারও গুড়গুড় করে উঠল ওয়ালান্ডারের পেট, জানান দিয়ে গেল ক্ষুধার উপস্থিতি। মেইন রোড পার হয়ে ওকেস ক্যাফেটেরিয়ার সামনে গাড়ি পার্ক করল সে। আগামীকাল থেকে পাল্টে ফেলব খাদ্যাভ্যাস, বলল নিজেকে। সাতটার পর এক মিনিটও যদি দেরি হয় যেতে, বাবা বলবে, আমি তার খেয়াল রাখি না।

একটা হ্যামবার্গার স্পেশাল খেল ও। তাড়াতাড়ি খেতে গিয়ে চাপ অনুভব করল তলপেটে। টয়লেটে বসে খেয়াল করল, তার আন্ডারওয়ার বদলাতে হবে। হঠাৎ করেই ক্লান্তি জাঁকিয়ে বসল ওর সর্বাঙ্গে। দরজায় আঘাত না পড়া পর্যন্ত বের হলো না টয়লেট থেকে।

ট্যাঙ্কে পেট্রল ভরে নিয়ে পুবদিকে গাড়ি ছুটাল ওয়ালান্ডার। স্যান্ডস্কোজেন ধরে উঠল খুসবেরিয়ার রাস্তায়। একটা ছোট খামারবাড়িতে থাকে ওর বাবা। লুডেরাপ আর সমুদ্রের মাঝের মাঠে যেন ঝুলে আছে বাড়িটা। সন্ধ্যা সাতটার কিছু আগে বাড়ির সামনের ড্রাইভে প্রবেশ করল ওয়ালান্ডার। চাকার নিচে মটমট করে উঠল নুড়িপাথর। এই ড্রাইভ নিয়েই সর্বশেষ ঝগড়াটা হয়েছে ওর বাবার সাথে। আগে জায়গাটা মনোরম একটা চত্বর ছিল। কোবলস্টোন দিয়ে

বাঁধানো, এই বাড়িটার মতোই পুরনো। কী ভূত চাপলো, একদিন ওর বাবা ঠিক করলেন, চত্বরটা নুড়ি দিয়ে ঢেকে দিবেন। শুনে প্রতিবাদ করেছিল ওয়ালান্ডার। আর এতেই খেপে যান ওর বাবা।

"আমি কারও কাছে পরামর্শ চাইনি," চিৎকার করে বলেছিলেন তিনি।

"এত সুন্দর একটা চত্বর কেন নষ্ট করবেন?" জিজ্ঞেস করেছিল ওয়ালান্ডার।

তারপর শুরু হয় তুমুল ঝগড়া। তবে লাভ হয়নি। শেষ পর্যন্ত ধূসর নুড়ি দিয়ে ঢাকা পড়ে যায় চত্বরটা।

ছাউনিতে আলো দেখতে পেল ওয়ালান্ডার। পরের বার হয়ত আমার বাবার বাসায় হামলা চালাবে ওই নিশাচর খুনিগুলো, সহসাই চিন্তাটা খেলে গেল ওর মনে। খুন করতেও দ্বিধা করবে না। কেউ শুনতে পাবে না তার চিৎকার। আশেপাশের আধা কিলোমিটারের মধ্যে বুড়ো একাই বাস করে। তার ওপর এখন আবার এই বাতাসের গর্জন।

দিয়েস ইয়ারাই শেষ পর্যন্ত শুনে তবেই গাড়ি ছেড়ে নামল সে। ধীর পায়ে এগিয়ে যেতে লাগল ছাউনির দিকে। আঁকাআঁকির জন্য জায়গাটাকে স্টুডিও বানিয়ে নিয়েছেন ওর বাবা। সেই ছোটবেলা থেকে এমনটাই দেখে আসছে ওয়ালান্ডার। বাবার স্মৃতি মনে করতে গেলে নাকে এসে লাগে তারপিন আর তেলের গন্ধ। গাঢ় নীল ওভারঅল আর রাবার বুট পরে দাঁড়িয়ে আছেন ইজেলের সামনে। তারপিনের কটু গন্ধে কেটে গেছে ওয়ালান্ডার আর ওর বোন ক্রিস্টিনার শৈশব।

পাঁচ বা ছয় বছর বয়স হওয়ার আগ পর্যন্ত ওয়ালান্ডার মনে করত, বছরের পর বছর ধরে একই ছবি এঁকে যাচ্ছেন ওর বাবা। বিষণ্ন শরৎ, আয়নার মতো স্বচ্ছ হ্রদ, ডালপালা ছড়িয়ে থাকা ভুতুড়ে একটা গাছ, দূর দিগন্তে ভেসে চলা মেঘের ভেলা, পড়ন্ত সূর্যের আলোয় ঝিকমিক করতে থাকা পর্বতমালা। ভুলটা বুঝতে পারে পরে। শুধু মোটিফ একই থাকতো ছবিগুলোর। একই প্রেক্ষাপটে বারবার এঁকে যেতেন ওর বাবা। কখনোসখনো ছবির বাম দিকের কোণায় এঁকে দিতেন একটা গ্রাউস পাখি।

কিছু দিন পরপর সিল্কের স্যুট আর আঙ্গুলে সোনার আঙটি পরা লোকজন আসতো ওদের বাসায়। কেউ পুরনো ভ্যানে চড়ে, কেউবা আমেরিকান গ্যাস-গাযলারে করে। এসে ছবিগুলো কিনে নিয়ে যেত তারা। সেসব ছবির কোনটায় গ্রাউস পাখি থাকতো, কোনটায় থাকতো না।

দারুণ বিক্রি হত ছবিগুলো। বিক্রির টাকায় চলতো ওয়ালান্ডারদের পরিবার। থাকার উপযোগী করে তোলা ক্লাগশামের একটা কামারশালা ছিল

ওদের ঠিকানা। বিপত্নীক হওয়ার পর কামারশালা বিক্রি করে গ্রামাঞ্চলের দিকে সরে আসেন ওয়ালান্ডারের বাবা। একাকীত্ব নিয়ে সর্বদা ঘ্যানঘ্যান করে যান তিনি। তা সত্ত্বেও কেন শহর ছেড়ে এই নির্জন জনপদে এসে থাকা শুরু করলেন, কখনোই বুঝতে পারেনি ওয়ালান্ডার।

দরজা খুলে ছাউনিতে প্রবেশ করল সে। গ্রাউস পাখিবিহীন একটা ছবিতে তুলি বুলাচ্ছিলেন ওর বাবা। আঁকছিলেন ডালপালা ছড়িয়ে থাকা গাছটা। তুলির আঁচড় দিতে দিতে ছেলেকে সম্ভাষণ জানালেন বিড়বিড় করে। স্পিরিট স্টোভে রাখা নোংরা পট থেকে কফি ঢেলে নিল ওয়ালান্ডার।

পিতার দিকে তাকিয়ে আশি বছর বয়সের এক বৃদ্ধকে দেখতে পেল সে। কুঁজো হয়ে এসেছে ছোটখাটো গড়নের মানুষটা। তবুও ইচ্ছা আর প্রাণশক্তির আভা চোখেমুখে। যখন বুড়ো হয়ে যাব, তখন আমাকেও কি এমন দেখাবে? ভাবল সে। ছোটবেলায় সবাই বলতো, আমি নাকি দেখতে আমার মায়ের মতোন। এখন আমার দাদার মতন। অবশেষে হয়ত বাবার মতো দেখাবে আমাকে।

"কফি খেতে থাকো," বললেন ওর বাবা। "এক মিনিট লাগবে আমার।"

"এক কাপ নিয়েছি," বলল ওয়ালান্ডার।

"তাহলে আরেক কাপ খাও।"

মেজাজ ভালো নেই মনে হয় বাবার, মনে হলো ওয়ালান্ডারের। তার মেজাজমর্জির তো আবার ঠিকঠিকানা নেই। তাছাড়া, আমাকেই বা কী দরকার?

"অনেক কাজ পড়ে আছে," বলল সে। "রাতে ঘুমানোর সময়টুকুও পাব না। আপনার কিছু দরকার?"

"ঘুমানোর সময় পাবে না কেন?"

"হাসপাতালে বসে থাকতে হবে।"

"কেন? কে অসুস্থ?"

বিরক্ত হলো ওয়ালান্ডার। জীবনে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। কিন্তু ওর বাবার তুলনায় তা কিছুই না। উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত লেগেই থাকবেন। তাছাড়া, ছেলের পেশা নিয়ে তার কোন মাথাব্যথা নেই। ওয়ালান্ডার জানে, সে পুলিশে যোগ দেয়ায় আশাহত হয়েছিলেন ওর বাবা। কিন্তু তিনি ছেলেকে কী বানাতে চেয়েছিলেন, তা কখনোই মুখ খুলে বলেননি। এ নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করেও লাভ হয়নি।

ওয়ালান্ডারের বোন ক্রিস্টিনা স্টকহোমে থাকে। একটা বিউটি সেলুন আছে তার। বাবার সাথে তার সম্পর্ক বরাবরই ভালো। ওয়ালান্ডার অনেকবার

জিজ্ঞেস করেছিল বোনকে। কিন্তু ক্রিস্টিনাও কোন ধারণা দিতে পারেনি। কুসুমগরম কফিতে চুমুক দিতে দিতে অদ্ভুত একটা ভাবনা এল ওয়ালান্ডারের মাথায়। একই মোটিফের ওপর সেও ছবি এঁকে যাক, এটাই কি চেয়েছিলেন ওর বাবা?

তুলি রেখে ন্যাকড়ায় হাত মুছে নিলেন ওর বাবা। তারপর এক কাপ কফি ঢেলে নিয়ে এলেন ছেলের কাছে। তার পোশাক থেকে বের হওয়া দুর্গন্ধ এসে লাগল ওয়ালান্ডারের নাকে।

একজন ছেলে কিভাবে তার বাবাকে বলবে যে তার শরীর থেকে গন্ধ বের হচ্ছে? ভাবল সে। এখন হয়ত আর নিজের যত্ন নিতে পারেন না তিনি। কিন্তু আমি কী করতে পারি? আমার বাসায় নিয়ে গেলে কুরুক্ষেত্র বেঁধে যাবে। একে অপরকে মেরেও ফেলতে পারি।

"অনেক দিন পর এলে," কফিতে চুমুক দিতে দিতে বললেন ওর বাবা।

"গত পরশুই তো এসেছি।"

"মাত্র আধা ঘন্টার জন্য!"

"যাই হোক, এসেছিলাম তো।"

"আমাকে দেখতে আসো না কেন?"

"অবশ্যই আসি! কিন্তু এটাও আপনার বোঝা উচিত যে আমার কাজের চাপ থাকে।"

একটা মান্ধাতার আমলের স্লেজগাড়িতে বসে পড়লেন বৃদ্ধ। তার ওজনে মড়মড় করে উঠল কাঠের বাহনটা।

"তোমার মেয়ে এসেছিল গতকাল আমাকে দেখতে।"

চমকে গেল ওয়ালান্ডার কথাটা শুনে।

"লিন্ডা এসেছিল?"

"একবার বললে কানে যায় না কথা?"

"কেন এসেছিল?"

"একটা ছবি নিতে।"

"ছবি নিতে?"

"তোমার মতো না ও। আমার ছবির কদর বুঝে।"

বিশ্বাসই করতে পারছে না ওয়ালান্ডার। ছোটবেলা ছাড়া কখনোই দাদার কাজে তেমন আগ্রহ দেখায়নি লিন্ডা।

"কেন এসেছিল ও?"

"বলেছি না ছবি নিতে! আমার কথা শুনছো না তুমি!"

"শুনছি তো! কোথা থেকে এসেছিল ও? কোথায় গেছে? কিভাবে গেছে? সব কি আপনার মুখ দিয়ে বলিয়ে নিতে হবে আমাকে?"

"একটা গাড়িতে করে এসেছিল," বললেন ওয়ালান্ডারের বাবা। "একটা কালো তরুণ চালাচ্ছিল গাড়িটা।"

"কালো মানে?"

"নিগ্রো বুঝো না? তবে ছেলেটা খুব অমায়িক, আর ভালো সুইডিশ বলতে পারে। আমি ছবি দিলে ওরা চলে যায়। ভাবলাম তোমাকে জানানো উচিত। মেয়ের খোঁজখবর তো রাখো না।"

"কোথায় গেছে ওরা?"

"আমি কিভাবে জানব?"

আসলে কেউই জানে না লিন্ডা থাকে কোথায়। মাঝে মাঝে কিছুদিনের জন্য মায়ের বাসায় গিয়ে উঠে। তারপর আবার লাপাত্তা। মোনার সাথে কথা বলতে হবে, ভাবল ওয়ালান্ডার। বিচ্ছেদ হলেও আমাদের কথা বলা দরকার। এভাবে আর চলছে না।

"ড্রিঙ্ক চলবে?" জিজ্ঞেস করল ওর বাবা।

যদিও ইচ্ছা নেই, ওয়ালান্ডার জানে, না করে লাভ হবে না।

"মন্দ হয় না," বলল সে।

ছাউনি থেকে একটা পথ চলে গেছে মূল বাড়ির দিকে। প্রবেশ করা মাত্রই বাড়ির ভেতরের বেহাল দশা নজরে এল ওর। এরকম অবস্থায় কিভাবে থাকছেন বাবা? ভেবে পেল না সে। আমিও বা কেন আগে খেয়াল করলাম না? ক্রিস্টিনার সাথে কথা বলতে হবে এ ব্যাপারে। বাবাকে এভাবে রাখা যাবে না। এমন সময় বেজে উঠল টেলিফোন। ওর বাবা গিয়ে তুললেন রিসিভার।

"তোমার ফোন," বললেন বিরক্তির সুরে।

লিন্ডা নিশ্চয়, ভাবল ওয়ালান্ডার। রিসিভার কানে ঠেকাতেই ভুল ভাঙলো। রিডবার্গ ফোন করেছে হাসপাতাল থেকে।

"মারা গেছেন মহিলা," বলল সে।

"জ্ঞান ফিরেছিল?"

"হ্যাঁ, তবে দশ মিনিটের জন্য। ডাক্তাররা ভেবেছিল, বিপদ কেটে গেছে। খানিক পরেই মারা যান বৃদ্ধা।"

"কিছু বলেছেন উনি?"

খানিকটা সময় নিয়ে উত্তর দিল রিডবার্গ। "তুমি এলে ভালো হয়।"

"কী বলেছেন বৃদ্ধা?"

"শুনে ভালো লাগবে না তোমার।"

"আসছি আমি।"

"স্টেশনে যাও বরং। মহিলা তো মারাই গেছেন।"

ফোন কেটে দিল ওয়ালান্ডার। "আমাকে যেতে হবে," বলল পিতার উদ্দেশ্যে।

কটমট করে তাকালেন ওর বাবা। "তুমি আমাকে দেখতে পার না।"

"আগামীকাল আসব আবার," জবাব দিল ওয়ালান্ডার। ভাবছে, পিতার এই দুরাবস্থার সমাধান কীভাবে করবে। "কথা দিচ্ছি। তখন কথা হবে। ডিনার করব একসাথে। আপনি চাইলে পোকারও খেলতে পারি।"

যদিও সে তাস খেলায় একেবারেই কাঁচা, কিন্তু জানে, খেলার কথা বললে কিছুটা হলেও শান্ত করা যাবে তার বাবাকে। "সাতটা বাজে চলে আসব।"

ইস্তায় ফিরে এল সে। কিছুক্ষণ আগে যে কাঁচের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল, সেই দরজা দিয়েই প্রবেশ করল আবার।

"রিডবার্গ ক্যান্টিনে অপেক্ষা করছে," জানাল এবা।

কফির কাপে চুমুক বসাচ্ছিল রিডবার্গ। তার চেহারা দেখেই ওয়ালান্ডার বুঝে গেল যে খারাপ কিছু অপেক্ষা করছে তার জন্য।

চার

ওয়ালান্ডার আর রিডবার্গ ছাড়া আর কেউ নেই ক্যান্টিনে। করিডোরে চিৎকার করে গ্রেফতারের প্রতিবাদ করছে এক মাতাল। রেডিয়েটর থেকে ভেসে আসছে মৃদু গুঞ্জন।

রিডবার্গের মুখোমুখি বসল ওয়ালান্ডার।

"ওভারকোট খুলে রাখো," বলল রিডবার্গ। "নয়তো আবার যখন বাইরে যাবে, জমে কাঠ হয়ে যাবে একেবারে।"

"আগে খবর বল। ওভারকোট নিয়ে পরে ভাবা যাবে।"

শ্রাগ করল রিডবার্গ। "বৃদ্ধা মারা গেছেন।"

"আগেই বলেছ।"

"তবে মৃত্যুর আগে খানিকক্ষণের জন্য জ্ঞান ফিরেছিল।"

"কিছু বলেছেন?"

"হ্যাঁ, তবে অনেকটা ফিসফিসানির মতো। ভালো করে বোঝা যাচ্ছিল না।"

"রেকর্ড করেছ?"

মাথা নাড়াল রিডবার্গ। "করলেও কিছু বুঝতে পারতে না। বিড়বিড় করে বলছিলেন বৃদ্ধা। শোনাই যাচ্ছিল না। আমি যা যা বুঝতে পেরেছি, লিখে রেখেছি।"

পকেট থেকে একটা দুমড়ানো নোটবুক বের করল সে। একটা মোটা রাবার ব্যান্ড দিয়ে কোনমতে টিকিয়ে রাখা হয়েছে নোটবুকটা। ভেতরে একটা পেন্সিলও গুঁজে রাখা আছে।

"প্রথমে স্বামীর নাম বলেন তিনি। সম্ভবত জানতে চাইছিলেন তার স্বামী কেমন আছে। তারপর বিড়বিড় করে যে কী বলেছিলেন, বুঝতে পারিনি। তখন তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করি। জিজ্ঞেস করি, 'কারা আপনাদের আক্রমণ করেছিল? চিনতে পেরেছিলেন? দেখতে কেমন ছিল?' যতক্ষণ তার জ্ঞান ছিল, বারবার এই প্রশ্নগুলো করি। তিনি সম্ভবত বুঝতে পেরেছিলেন আমি কী জানতে চাইছিলাম।"

"উত্তরে কিছু বলেছিলেন?"

"একটা শব্দই শুধু বুঝতে পেরেছিলাম- বিদেশি।"

"বিদেশি?"

"হ্যাঁ। এই একটা শব্দই ধরতে পেরেছি।"

"তারমানে বিদেশি কেউ আক্রমণ করেছিল তাদের?"

মাথা দুলিয়ে সায় জানাল রিডবার্গ।

"তুমি নিশ্চিত?"

"নিশ্চিত না হয়ে কিছু বলি আমি?"

"না।"

ওভারকোট খুলে কফি নিয়ে বসল ওয়ালান্ডার।

"কিন্তু শব্দটা দ্বারা ঠিক কী বুঝাতে চেয়েছেন তিনি?" বিড়বিড় করল আনমনে।

"আমিও তাই ভাবছিলাম," বলল রিডবার্গ। "হয়ত মানুষগুলো দেখতে নন-সুইডিশ ছিল। হয়ত তারা অন্য কোন ভাষা কিংবা ভাঙা সুইডিশে কথা বলছিল। নানা রকমের অর্থ হতে পারে।"

"নন-সুইডিশ? মানে কী?"

"তুমি জানো মানে কী। লোকগুলোকে দেখে বৃদ্ধার তেমনই মনে হয়েছিল হয়ত।"

"কিন্তু দেখার ভুল কি হতে পারে না?"

মাথা দোলাল রিডবার্গ। "সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। কিন্তু একজন মানুষ তার জীবনের শেষ মুহূর্তে কেন ভুল কিছু বলবেন? বয়স্ক মানুষেরা সাধারণত মিথ্যা বলে না।"

কুসুমগরম কফিতে চুমুক বসাল ওয়ালান্ডার।

"তার মানে এক বা একাধিক বিদেশিকে খুঁজতে হবে আমাদের," বলল সে। এরকম কিছু উনি না বললেই বরং খুশি হতাম।"

"বুঝতে পারছি তোমার অবস্থাটা।"

চুপ হয়ে গেল দুজনে মুহূর্তের জন্য। ডুবে গেল যার যার ভাবনায়। করিডোর থেকে মাতালের চিৎকার শোনা যাচ্ছে না আর।

"পরিস্থিতিটা একবার ভেবে দেখ," মুখ খুলল ওয়ালান্ডার। "লুনাপের জোড়া খুনের একটাই মাত্র সূত্র আছে পুলিশের হাতে। আর তা হলো, অপরাধীরা সম্ভবত বিদেশি।"

"পরিস্থিতি কোন দিকে গড়াতে পারে ভেবে আমারও দুঃশ্চিন্তা হচ্ছে," বলল রিডবার্গ।

কথাটা অনুধাবন করতে কষ্ট হলো না ওয়ালান্ডারের। লুনাপ থেকে মাত্র বিশ কিলোমিটার দূরে একটা বিশাল শরণার্থী শিবির আছে। আশেপাশের বসবাসরত কমিউনিটিগুলোর তীব্র প্রতিবাদ উপেক্ষা করে হ্যাজহোমের পুরনো দুর্গে স্থাপন করা হয়েছে এই শিবির। তাই বলে থেমে থাকেনি প্রতিবাদ। বেশ

কয়েকবার হামলা চালানো হয়েছে সেখানকার বিদেশিদের ওপর। রাতের বেলায় ক্রুশ পোড়ানো, জানালা দিয়ে ঢিল ছোঁড়া, দেয়ালে দেয়ালে স্লোগান এঁকে রাখা। শরণার্থীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ বেড়েই চলেছে জনমানুষের মনে।

তবে রিডবার্গ ও ওয়ালান্ডার এমন কিছু জানে, যা সাধারণ মানুষ জানে না। ফার্ম মেশিনারি ভাড়া দেয় এমন একটা দোকানে চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা খেয়েছে হ্যাজহোমের কিছু আশ্রয়প্রার্থী। ভাগ্য ভালো যে দোকানের মালিক উগ্র শরণার্থী বিরোধী ছিল না। একারণে ঘটনাটা ধামাচাপা দেয়া সম্ভব হয়েছিল। পরে চুরির দায়ে অভিযুক্ত দুজনকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে সুইডেন থেকে। এই ঘটনা যদি প্রকাশ হয়ে যেত, তাহলে কী ঘটতে পারত, তা মাঝেমধ্যেই স্থান করে নিত ওয়ালান্ডার আর রিডবার্গের আলোচনায়।

"বিশ্বাস করতেই কষ্ট হচ্ছে যে আশ্রয়প্রার্থী কোন রিফিউজি খুন করতে পারে," মাথা নাড়িয়ে বলল ওয়ালান্ডার।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল রিডবার্গ। "ফাঁসটা সম্পর্কে কী বলেছিলাম মনে আছে?"

"ওই গিঁট সম্পর্কে?"

"হ্যাঁ। ছোটবেলায় আমার গ্রীষ্মের ছুটি কাটতো সেইলিং করে। একারণে নানা ধরণের গিঁট সম্পর্কে ভালোই ধারণা আছে। কিন্তু ফাঁসের ওই গিঁট আমি আগে দেখেনি।"

আগ্রহভরে রিডবার্গের দিকে তাকাল ওয়ালান্ডার। "কী বলতে চাইছ?"

"বলতে চাইছি ওই গিঁট সুইডিশ বয় স্কাউটের কেউ বাঁধেনি।"

"মানে?"

"ওই গিঁট কোন বিদেশির বাঁধা।"

ওয়ালান্ডার কিছু বলার আগেই এবা এসে ঢুকল।

"বাসায় গিয়ে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নাও দুজনে," বলল কফি ঢালতে ঢালতে। "ও, বলতে ভুলেই গেছি। সাংবাদিকরা ফোন করছে বারবার। স্টেটমেন্ট চাইছে তোমার কাছ থেকে।"

"কী, আবহাওয়া সম্পর্কে?" বলল ওয়ালান্ডার।

"বৃদ্ধার মৃত্যুর খবর পেয়ে গেছে মনে হচ্ছে।"

"আজ রাতে কোন স্টেটমেন্ট দেয়া হবে না," সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল ওয়ালান্ডার। "আগামীকাল বিবেচনা করে দেখা হবে।"

উঠে গিয়ে জানালার পাশে দাঁড়াল সে। জোরে বাতাস বইলেও আকাশে মেঘ নেই একরত্তি। আরেকটা শীতল রাত অপেক্ষা করছে সামনে।

"মহিলার জ্ঞান ফেরার বিষয়টা সাংবাদিকদের থেকে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই," বলল সে। "আর সেটা জানালে বলতে হবে জ্ঞান ফেরার পর বৃদ্ধা কী বলেছেন। আর তা যদি বলে দিই, তাহলে নরকগুলজার নেমে আসবে।"

"আপাতত গোপন রাখা যেতে পারে," উঠে যেতে যেতে বলল রিডবার্গ। "তদন্তের স্বার্থে।"

বিস্ময় ফুটে উঠল ওয়ালান্ডারের চেহারায়। "পরে যখন প্রেস জানতে পারবে যে আমরা তাদের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লুকিয়েছি, তখন কী হবে? ওরা তো লিখবে যে আমরা বিদেশি অপরাধীদের আড়াল করতে চেয়েছি।"

"উল্টোটা ভেবে দেখ," বলল রিডবার্গ। "জোড়া খুনের ঘটনায় পুলিশ দুজন বিদেশিকে খুঁজছে-এই কথাটা ছড়িয়ে গেলে রিফিউজি ক্যাম্পের কী অবস্থা হবে, ভেবে দেখেছ? অনেক নিরাপরাধ মানুষ এর ভুক্তভোগী হবে।"

কথাটা ভুল বলেনি রিডবার্গ। টানাপোড়নে পড়ে গেল ওয়ালান্ডার।

"আজকে এখানেই থাক," বলল সে। "কাল সকাল আটটায় তুমি আর আমি মিটিং এ বসব। তখন সিদ্ধান্ত নিব আলোচনা করে।"

মাথা দুলিয়ে সায় জানাল রিডবার্গ। তারপর পা টেনে টেনে চলল দরজার উদ্দেশ্যে। বেরিয়ে যাবার আগে পিছু ফিরে চাইল একবার।

"তবে খুনি দুজন বিদেশি হওয়ার সম্ভাবনাটা একেবারেই উড়িয়ে দেয়া ঠিক হবে না।"

কফি কাপ ধুয়ে ডিশ র‍্যাকে রেখে দিল ওয়ালান্ডার।

আমিও তাই আশা করছি, বলল মনে মনে। আমি চাই, খুনিরা যেন শরণার্থী হয়। তবেই হয়ত এই অরাজকতার অবসান ঘটবে। হুটহাট যে কেউ, তা যে কারণেই হোক না কেন, সীমানা পার হয়ে সুইডেনে ঢুকতে পারবে না।

অবশ্য রিডবার্গের মুখের ওপর এই কথাগুলো বলার প্রশ্নই উঠে না। এই মতামতটুকু নিজের কাছেই রাখবে সে।

গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছাতে তীব্র বাতাসের সাথে লড়তে হলো তাকে। ক্লান্ত হওয়া সত্ত্বেও বাসায় ফেরার কোন ইচ্ছাই নেই তার। সন্ধ্যাগুলোতে অসহ্য একাকীত্ব চেপে ধরে। দম বন্ধ হয়ে আসতে চায় ঘরের ভেতর। ইগনিশন চালু করে ক্যাসেট পাল্টে দিল সে। ফিডেলিও'র সুরে আচ্ছন্ন হলো গাড়ির ভেতরকার অন্ধকার।

স্ত্রীর প্রস্থান ওর কাছে ছিল বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো। তবে মনের গহীনে ঠিকই জানে যে আরও আগেই টের পাওয়া উচিত ছিল ওর। মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছিল শুধু। বোঝা উচিত ছিল যে নিরুত্তেজ সম্পর্ক কখনও টিকতে

পারে না। তরুণ বয়সে বিয়ে হয়েছিল ওদের। কোন ফাঁকে যে সম্পর্কে ঘুণপোকা ধরেছিল, টের পেতে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। তিনজনের মধ্যে একমাত্র লিন্ডাই উদ্বিগ্ন ছিল ওদের চারপাশ থেকে চেপে ধরা শূন্যতা নিয়ে।

অক্টোবরের সেই রাতে মোনা যখন ডিভোর্স চায়, এরকম কিছুর প্রতীক্ষাতেই ছিল যেন ওয়ালান্ডার। জানতো এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে। কিন্তু ভাবনাটা এতটাই পীড়া দিত যে মাথায় আনতে চাইতো না। কাজের চাপের ওপর দোষ দিয়ে দূরে ঠেলে রাখতো। সত্যটা যখন ওর সামনে এসে দাঁড়ায়, ততদিনে সব প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে মোনা। এক শুক্রবার সন্ধ্যায় ডিভোর্স চেয়ে চলে যায় রোববারের দিন। গিয়ে উঠে আগে থেকে ভাড়া নিয়ে রাখা মালমোর এক ফ্ল্যাটে। পরিত্যাজ্য হওয়ার অনুভূতি লজ্জা আর রাগে অন্ধ করে দিয়েছিল ওয়ালান্ডারকে। প্রচন্ড আক্রোশে চড় বসিয়ে দিয়েছিল স্ত্রীর গালে।

তারপর শুধুই নীরবতা। দিনের বেলায় ওয়ালান্ডারের অনুপস্থিতিতে টুকটাক কিছু জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখেছিল মোনা। তবে বেশিরভাগই ফেলে গেছে ওয়ালান্ডার বিহীন এক ভবিষ্যতের আশায়। বিনিময়ে বিকিয়ে দিয়েছে তার অতীত। এই ভাবনাটাই সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিয়েছিল ওয়ালান্ডারকে।

ফোন করেছিল সে। কথা বলে গেছে সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা। ঈর্ষাকাতর হয়ে জানতে চেয়েছিল, অন্য কোন পুরুষের কারণে তাকে ছেড়ে গেছে কিনা মোনা।

"অন্য জীবনের আশায়," উত্তর দিয়েছিল মোনা। "সময় থাকতে থাকতে নতুন জীবনের সন্ধানে।"

অনুনয় করেছিল ওয়ালান্ডার। প্রতিজ্ঞা করেছিল বদলে যাবার। ক্ষমা চেয়েছিল স্ত্রীকে যথাযথ সময় না দিবার জন্য। কিন্তু লাভ হয়নি কোন।

ক্রিসমাসের দুদিন আগে ডাকযোগে এসে পৌঁছে ডিভোর্সের কাগজপত্র। খামটা খোলার পর সে উপলব্ধি করতে পারে যে আর কোন আশা নেই। কী যেন হয়ে যায় ওর ভেতর। ইচ্ছা করছিল সব ছেড়েছুড়ে পালিয়ে যেতে। অমন ভাবনা থেকেই হয়ত ক্রিসমাসের ছুটি শেষ হওয়ার পর অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে ছুটি নিয়েছিল। চলে গিয়েছিল ডেনমার্ক। আটকা পড়েছিল জিল্যান্ডের উত্তরভাগে তুষারঝড়ে। গিলেলায়ে সৈকতের কাছে একটা রুমে বন্দি অবস্থায় কেটে যায় ওর ক্রিসমাস। সেখানে বসে স্ত্রীর উদ্দেশ্যে লম্বা এক চিঠি লিখেছিল। পরে ভাগ্যকে মেনে নিয়ে টুকর টুকর করে চিঠিটা ছড়িয়ে দিয়েছিল সাগরে।

নববর্ষের দুদিন আগে ইস্তায় ফিরে কাজে যোগ দিয়েছিল ওয়ালান্ডার। একটা দাম্পত্য কলহের কেস নিয়ে ব্যস্ত ছিল নববর্ষের ছুটিতে। তদন্ত করতে গিয়ে আবিষ্কার করেছিল, আরেকটু হলে সেও হয়ত মোনাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করে বসতো।

চিঁচিঁ শব্দ তুলে কেটে যায় *ফিডেলিও* এর সুর। টেপ শেষ হয়ে গেছে। অটোমেটিক্যালি চালু হয়ে গেল রেডিও। একটা আইস হকি গেমের ধারাভাষ্য শুনতে পেল ওয়ালান্ডার।

বাসায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে নিয়ে পার্কিং এরিয়া থেকে বেরিয়ে আসে সে। কিন্তু গাড়ি চালাতে থাকে উল্টো দিকে, পশ্চিমে থ্রেলেবোরি আর স্কেনরের পথে। পুরাতন কারাগার পেরিয়ে বাড়িয়ে দেয় গতি। ড্রাইভিং সবসময় বিক্ষিপ্ত করে দেয় ওর ভাবনাগুলোকে...

থ্রেলেবোরির কাছাকাছি চলে এল সে। একটা বিশাল ফেরি সবে প্রবেশ করছে পোতাশ্রয়ে। ইস্তার বেশ কয়েকজন সাবেক পুলিশ সদস্য এই ফেরি ডকের ইমিগ্রেশন অফিসার হিসেবে নিয়োজিত আছে। তাদের কেউ ডিউটিতে আছে কিনা দেখার সিদ্ধান্ত নিল সে। কিন্তু অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ নিষেধ সাইন লাগানো দরজা দিয়ে যখন প্রবেশ করল, ভেতরের একজনকেও চিনতে পারল না। দুজনের মধ্যে বয়স্ক জনের কাঁচাপাকা দাড়ি আর কপালে একটা কাটা দাগ। নিজের পরিচয় দিল ওয়ালান্ডার।

"ইস্তায় তো বাজে একটা ঘটনা ঘটে গেল," বলল বয়স্ক লোকটা। "ধরতে পেরেছেন কাউকে?"

"এখনও না," জবাব দিল ওয়ালান্ডার।

ফেরি থেকে পাসপোর্ট কন্ট্রোলের দিকে আগত যাত্রীদের কারণে কথা আর এগোলো না। যাত্রীদের বেশিরভাগই সুইডিশ, নববর্ষের ছুটি কাটিয়ে ফিরছে বার্লিন থেকে। পূর্ব জার্মানী থেকেও কিছু পর্যটক এসেছে অবশ্য। সদ্য অর্জিত স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করছে ভিনদেশে ভ্রমণের অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে।

বিশ মিনিট পর নজন মাত্র যাত্রী বাকি রইল। নানা রকম ভাবে বুঝাতে চাইছে যে তারা সুইডেনে আশ্রয়প্রার্থী।

"এটা তো তেমন কিছুই না," বলল দুজন অফিসারের মধ্যে কম বয়স্ক জন। "মাঝে মাঝে এক ফেরিতে একশজনও হাজির হয়। বুঝতেই পারছেন কী ঝড়টা যায়। অতিরিক্ত জনবলের দরকার পড়ে তখন।"

নয়জনের মধ্যে পাঁচজনই একই ইথিওপিয়ান পরিবারের। এদের একজনের শুধু পাসপোর্ট আছে। ওয়ালান্ডার ভেবে অবাক হলো, কী করে এরা মাত্র একটা

পাসপোর্ট দিয়ে এতটা পথ আর বর্ডার পাড়ি দিয়েছে। বাকি চারজনের দুজন লেবানিজ আর দুজন ইরানি।

শরণার্থীদের চেহারা পড়তে চেষ্টা করল ওয়ালান্ডার। ঠাঁই পাওয়ার আশা নাকি বিতাড়িত হওয়ার ভয়-কোনটা কাজ করছে এদের মনে?

"এখন কী হবে এদের?" জানতে চাইল সে।

"মালমোতে নিয়ে যাওয়া হবে," বলল বয়স্ক লোকটা। "সেখানকার নোঙ্গর করা কোন একটা জাহাজে রাখা হবে আপাতত। যদি সুইডেনে থাকার অনুমতি মেলে, তাহলে থাকবে। নয়তো ফেরত পাঠানো হবে।"

"এই লোকগুলোর ক্ষেত্রে কী হতে পারে বলে আপনার ধারণা?"

শ্রাগ করল লোকটা।

"অনুমতি পেয়ে যাবে মনে হচ্ছে," জবাব দিল কাঁধ নাড়িয়ে। "কফি নেবেন? পরের ফেরিটা আসতে দেরি আছে।"

মাথা নাড়াল ওয়ালান্ডার। "অন্য কোন সময়। আজ যেতে হবে।"

"আশা করি অপরাধীদের ধরতে পারবেন।"

"ধন্যবাদ," বলল ওয়ালান্ডার। "আমিও তাই আশা করি।"

ইস্তায় ফেরার পথে আরেকটু হলেই একটা খরগোশ চাপা পড়ত ওর গাড়ির চাকার তলায়। হেডলাইটের আলোয় ছোট্ট প্রাণীটাকে দেখার সাথে সাথেই ব্রেক কষে সে। তা সত্ত্বেও সামনের বাম পাশের চাকায় ধাক্কা খায় ওটা। খরগোশটা বেঁচে আছে কিনা, দেখার প্রয়োজনও বোধ করল না ওয়ালান্ডার। দিব্যি গাড়ি চালিয়ে যেতে লাগল।

কী হয়েছে আমার? প্রশ্ন জাগল ওর মনে।

রাতের ঘুম ভালো হলো না ওর। একটা দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে গেল। স্বপ্নে দেখেছে, কেউ একজন গলা টিপে খুন করতে চাইছে ওকে। পাঁচটা বাজে সবে। আবারও ঘুমানোর চেষ্টা করল সে। তবে লাভ হলো না। অগত্যা উঠে গিয়ে কফি বানাতে লাগল।

রান্নাঘরের জানালার বাইরের থার্মোমিটার অনুযায়ি, তাপমাত্রা মাইনাস ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। রাস্তা ধরে চলে যাওয়া তারে ঝুলানো বাল্বটা দুলছে বাতাসে। রান্নাঘরের টেবিলে বসে গতকাল রিডবার্গের বলা কথাগুলো ভাবতে লাগল ওয়ালান্ডার। যে ভয়টা পাচ্ছিল, ঠিক তাই ঘটেছে। মৃত্যুর আগে মিসেস লভগ্রেন তেমন কিছুই বলে যেতে পারেননি বিদেশি শব্দটা ছাড়া। আর তাতে পরিষ্কারভাবে কিছু বুঝার জো নেই। পুলিশের হাতে এমন কোন সূত্র নেই, যা ধরে সামনে এগোনো যায়।

বাসা থেকে বেরিয়ে এল ওয়ালান্ডার। যদিও মোটা একটা সোয়েটার চাপিয়েছে গায়ে, তবুও কনকনে ঠান্ডা একেবারে হাড় জমিয়ে দিবে যেন। মূল সড়কে উঠে মালমোর দিকে গাড়ি ছুটালো সে। রিডবার্গের সাথে আলোচনায় বসার আগে নিসট্রমদের সাথে দেখা করা দরকার। কেমন খচখচ করছে ওর মন। এ ধরণের হামলাগুলো সাধারণত বিচ্ছিন্ন হয় না, অর্থকড়ি জড়িত থাকে। তাছাড়া, এতটা নৃশংসও হয় না।

একটা সরু রাস্তায় প্রবেশ করল গাড়ি। এই পথেই যেতে হয় নিসট্রমদের খামারবাড়ি।

এতক্ষণে তারা জেগে গেছেন নিশ্চয়, অনুমান করল ওয়ালান্ডার। গ্রামাঞ্চলের মানুষেরা সকাল সকাল উঠে পড়ে। হয়ত নতুন কিছু জানতে পারব তাদের থেকে।

বাড়ির সামনে এসে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল সে। সাথে সাথে নিভে গেল রান্নাঘরের লাইট। উনারা বোধহয় ভয় পেয়েছেন, ভাবল সে। ভেবেছেন, খুনিরা ফিরে এসেছে। লাইট জ্বালিয়ে রেখে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল সে। নুড়িপাথর বিছানো পথ ধরে এগিয়ে যেতে লাগল সিঁড়ির দিকে।

সহসাই আলোর ঝিলিক দিয়ে উঠল বাড়ির পাশের ঝোপে। দেখার আগেই টের পেয়ে গেল ওয়ালান্ডার। কানফাটানো শব্দ কানে আসতেই লাফ দিল মাটিতে। একটা পাথরের খোঁচা লাগল গালে। এক মুহূর্তের জন্য ওর মনে হলো, গুলি লেগেছে।

"পুলিশ!" চেঁচিয়ে উঠল সে। "গুলি করবেন না! সাবধান, বন্দুক নামিয়ে রাখুন।"

টর্চের আলো এসে পড়ল ওর মুখে। এদিকওদিক নাচছে আলো। কাঁপছে টর্চ ধরে রাখা হাত। নিসট্রম এসে দাঁড়াল ওর সামনে। হাতে একটা পুরনো শটগান।

"আপনি?" বৃদ্ধের কণ্ঠে একই সাথে বিস্ময় আর স্বস্তি।

শোয়া থেকে উঠে গা থেকে ধুলো ঝাড়ল ওয়ালান্ডার। "কাকে গুলি করছিলেন?"

"আকাশের দিকে ছুঁড়েছি," জবাব দিলেন নিসট্রম।

"বন্দুক রাখার অনুমতি আছে আপনার?" জানতে চাইল ওয়ালান্ডার। "নয়তো ঝামেলায় পড়বেন।"

"সারা রাত জেগে পাহারা দিয়েছি," বললেন নিসট্রম। মর্মাহত বৃদ্ধের মনোকষ্ট বুঝতে অসুবিধা হলো না ওয়ালান্ডারের।

"আমার গাড়ির লাইট নিভিয়ে আসি," বলল সে। "তারপর কথা বলব আপনার সাথে।"

দুই বাক্স শটগান শেল পড়ে আছে রান্নাঘরের টেবিলে। সোফায় একটা ক্রোবার আর একটা স্লেজহ্যামার। জানালায় বসে ছিল কালো বেড়ালটা। ওয়ালান্ডারকে প্রবেশ করতে দেখে তাকিয়ে রইল এক দৃষ্টিতে। স্টোভের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন হ্যানা নিসট্রম। কফির পটে চামচ নাড়িয়ে যাচ্ছেন।

"আমি জানতাম না আপনি এসেছেন," ক্ষমা চাওয়ার সুরে বললেন নিসট্রম। "এত সকালে পুলিশ আসতে পারে ভাবিনি।"

স্লেজহ্যামার সরিয়ে বসে পড়ল ওয়ালান্ডার।

"মিসেস লভগ্রেন মারা গেছেন গত রাতে," জানালো সে "মনে হলো আপনাদের জানানো উচিত।"

এক অবাস্তব অনুভূতিতে ছেয়ে গেল ওর মন। প্রতিবারই হয়, যখন মৃত্যু সংবাদ বয়ে নিয়ে যায়। অপরিচিত কাউকে তার সন্তান বা আত্মীয়ের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে দেয়া আর তাতে মর্যাদা আরোপের চেষ্টা, অসম্ভব ঠেকে ওর কাছে। মৃত্যুর সাথে পুলিশ জড়ানো মানেই তা অস্বাভাবিক এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বীভৎস আর লোমহর্ষক। কেউ হয়ত দোকানে কিছু কিনতে গিয়ে মারা পড়লো। খেলা শেষে সাইকেল চালিয়ে মাঠ থেকে ফেরার সময় চাকার নিচে চাপা পড়ল কোন শিশু। ডাকাতির শিকার, আত্মহত্যা কিংবা ডুবে যাওয়া। পুলিশ দোরগোড়ায় উপস্থিত হয় দুঃসংবাদ নিয়ে।

কবরের নিস্তব্ধতা রুম জুড়ে। চামচ দিয়ে কফি নাড়িয়ে যাচ্ছেন হ্যানা। দুই হাতে অস্থিরচিত্তে শটগান নাচাচ্ছেন নিসট্রম। বন্দুকের আওতার বাইরে গিয়ে বসল ওয়ালান্ডার।

"মারিয়াও চলে গেল তাহলে," আস্তে করে বললেন নিসট্রম।

"ডাক্তাররা সাধ্যমতো চেষ্টা করেছে।"

"হয়ত এতেই ভালো হয়েছে," বললেন হ্যানা নিসট্রম। "স্বামী ছাড়া বেঁচে থাকবার মতো আর কোন কারণ তো ছিল না ওর।"

টেবিলের ওপর শটগান রেখে উঠে দাঁড়ালেন নিসট্রম। ওয়ালান্ডার খেয়াল করল, এক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছেন বৃদ্ধ।

"গিয়ে ঘোড়াটাকে কিছু খড় দিয়ে আসি," একটা পুরনো ক্যাপ মাথায় দিতে দিতে বললেন নিসট্রম।

"আমি কি সাথে যেতে পারি?" জানতে চাইল ওয়ালান্ডার।

"ইচ্ছা হলে আসুন," বললেন বৃদ্ধ। তারপর বেরিয়ে গেলেন দরজা খুলে।

ওরা আস্তাবলে প্রবেশ করতেই ডেকে উঠল মাদী ঘোড়াটা। দক্ষ হাতে স্টলে এক তোড়া খড় ছুড়ে দিলেন নিসট্রম।

"পরে পরিষ্কার করে দিব জায়গাটা," বললেন ঘোড়াটার কেশর চাপড়ে দিতে দিতে।

"উনারা ঘোড়া পালতেন কেন?" জিজ্ঞেস না করে পারল না ওয়ালান্ডার।

"অবসর নেয়া কৃষকদের কাছে শূন্য আস্তাবল মর্গের মতো," জবাব দিলেন নিসট্রম। "ঘোড়াটা ওদের সঙ্গ দিত।"

আস্তাবল থেকেই জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করার সিদ্ধান্ত নিল ওয়ালান্ডার।

"সারা রাত জেগে পাহারা দিয়েছেন," বলল সে। "ভয় পাচ্ছেন, বুঝতে পারছি। একটা প্রশ্ন নিশ্চয় জেগেছে আপনাদের মনেঃ কেন লভগ্রেনদের আক্রমণ করা হলো? কেন আমাদের না?"

"ওদের কাছে কোন টাকা ছিল না," প্রত্যুত্তরে বললেন নিসট্রম। "চুরি করবার মতো দামি কিছুও ছিল না। তাছাড়া, আপনাদের একজনকে গতকালই বলেছি, কিছুই খোয়া যায়নি। অবশ্য একটা দেয়ালঘড়ি চুরি হলেও হতে পারে।"

"হতে পারে মানে?"

"লভগ্রেনদের মেয়েদের একজন নিয়েছে হয়ত। আমার ঠিক খেয়াল নেই।"

"টাকাও ছিল না," ওয়ালান্ডার বলল। "আবার শত্রুও ছিল না।"

সহসাই একটা ধারণা উঁকি দিল ওর মনে।

"আপনারা কি ঘরে টাকাপয়সা রাখেন?" জানতে চাইল সে। "এমনও তো হতে পারে যে খুনিরা ভুল করে ওই বাড়িতে ঢুকেছে?"

"আমাদের যা কিছু আছে, সব ব্যাংকে," জবাব দিলেন নিসট্রম। "আর আমাদেরও কোন শত্রু নেই।"

ঘরে ফিরে কফির কাপে চুমুক বসাল ওরা। হ্যানা নিসট্রমের লালচে চোখ ওয়ালান্ডারের নজর এড়াল না। খানিক আগেও বোধহয় কেঁদেছেন বৃদ্ধা।

"অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়েছে আপনাদের সম্প্রতি?" বয়স্ক দম্পতিকে জিজ্ঞেস করল ওয়ালান্ডার। "এমন কেউ কি লভগ্রেনদের বাসায় এসেছিল যাদের আপনারা চেনেন না?"

মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন স্বামী-স্ত্রী। তারপর মাথা নাড়ালেন।

"উনাদের সাথে শেষ কবে কথা হয়েছে?"

"গত পরশুই তো একসাথে কফি খেলাম প্রতিদিনকার মতো," বললেন হ্যানা। "চল্লিশ বছর ধরে এমন হয়ে আসছে।"

"উনাদের কি ভয়ার্ত মনে হয়েছিল?" জানতে চাইল ওয়ালান্ডার। "কিংবা চিন্তিত?"

"ইয়োহানেসের ঠাণ্ডা লেগেছিল," জবাব দিলেন হ্যানা। "এছাড়া তেমন কিছু চোখে পড়েনি।"

লাভ হচ্ছে না কোন। জিজ্ঞেস করার মতো আর কিছু ভেবে পেল না ওয়ালান্ডার। প্রতিটা জবাবের সাথে সাথে একটা করে পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

"তাদের পরিচিত কেউ কি বিদেশি ছিল?" জিজ্ঞেস করল সে।

বিস্ময়ে ভুরু তুললেন নিসট্রম।

"বিদেশি?"

"সুইডিশ না এমন কেউ," বলল ওয়ালান্ডার।

"বছর কয়েক আগে গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময়ে কয়েকজন ডেনিশ ওদের মাঠে ক্যাম্প করেছিল।"

ঘড়ি দেখল ওয়ালান্ডার। আটটা বাজে রিডবার্গের সাথে দেখা করার কথা। দেরি করার কোন ইচ্ছাই নেই ওর।

"দেখুন কিছু মনে করতে পারেন কিনা," বলল সে। "অপরাধীদের ধরতে সুবিধা হবে তাতে।"

গাড়ি পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিতে এলেন নিসট্রম।

"শটগানের অনুমতি আছে আমার," জানালেন তিনি। "আর কাউকে গুলি করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। আমি শুধু ভয় পাইয়ে দিতে চেয়েছি।"

"এবং সফল হয়েছেন তাতে," জবাব দিল ওয়ালান্ডার। "তবে আপনার এখন ঘুমানো দরকার। যারাই এই গর্হিত অপরাধ করে থাকুক না কেন, আমার মনে হয় না ফিরে আসবে।"

"আপনি ঘুমাতে পারতেন?" জিজ্ঞেস করলেন নিসট্রম। "পারতেন যদি আপনার প্রতিবেশীদের পশুর মতো হত্যা করা হত?"

উত্তর দিতে পারল না ওয়ালান্ডার।

"কফির জন্য ধন্যবাদ," বলে চলে গেল গাড়িতে করে।

জটিল একটা কেস, ভাবল সে। একটা সূত্রও মিলল না, একটাও না। শুধু রিডবার্গের অদ্ভুত গিঁট, আর একটা শব্দ বিদেশি। বয়স্ক মানুষ দুজনকে এমনভাবে খুন করা হয়েছে যে দেখে মনে হয় প্রচন্ড ঘৃণা বা প্রতিশোধ স্পৃহা এর পেছনে দায়ী। নিছক কোন ডাকাতি নয়।

কারণ তো একটা আছে অবশ্যই, মনে মনে বলল ওয়ালান্ডার। যদি ঘোড়াটা কথা বলতে পারত! ঘোড়াটাকে নিয়ে কেমন অস্বস্তি হচ্ছে ওর। খচখচানি

রয়েই যাচ্ছে মনে। আর তার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা বলে মনের খচখচানিকে অগ্রাহ্য না করতে।

আটটার কিছু আগে পুলিশ স্টেশনের সামনে এসে ব্রেক করল সে। বাতাসের বেগ আরও বাড়লেও আজ অতটা ঠান্ডা লাগছে না। তুষার না পড়লেই হলো, বলল মনে মনে।

সুইচবোর্ড পার হওয়ার সময় এবার উদ্দেশ্যে মাথা দোলাল সে। "রিডবার্গ এসেছে?"

"অফিসে আছে," বলল এবা। "এরিমধ্যে ফোন আসা শুরু হয়ে গেছে টিভি, রেডিও আর সাংবাদিকদের থেকে। কাউন্টি পুলিশ কমিশনারও ফোন দিয়েছেন।"

"আরও কিছুক্ষণ সামলে নাও," বলল ওয়ালান্ডার। "আগে রিডবার্গের সাথে কথা বলে আসি।"

নিজের অফিসে জ্যাকেট ঝুলিয়ে রেখে বেরিয়ে এল সে। কয়েক দরজা পরেই রিডবার্গের অফিস। নক করল সে। জবাবে ভারী একটা গলা শুনতে পেল।

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল রিডবার্গ। ওয়ালান্ডার দেখেই বুঝতে পারল, রাতে ভালো ঘুম হয়নি তার।

"শুভ সকাল," বলল সে। "কফি নেবে?"

"মন্দ হয় না। তবে চিনি দিবে না। মিষ্টি খাওয়া বাদ দিয়েছি।"

দুটো প্লাস্টিকের মগে করে কফি নিয়ে রিডবার্গের অফিসে ফিরে এল ওয়ালান্ডার। দরজার বাইরে এসে থমকে গেল এক মুহূর্তের জন্য। কী করব আমি? প্রশ্ন করল নিজেকে। তদন্তের খাতিরে মিসেস লভগ্রেনের বলা কথাটা কি চেপে যাব? নাকি বলে দিব প্রেসকে?

জানি না, জবাব দিল ওর মন। বিরক্ত হলো ওয়ালান্ডার। পা দিয়ে দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল ভেতরে। ডেস্কের পেছনে বসে মাথার অবশিষ্ট চুল আঁচড়াচ্ছে রিডবার্গ। একটা চেয়ারে বসে পড়ল ওয়ালান্ডার।

"চেয়ারের তো বেহাল দশা," বলল সে। "পাল্টানো দরকার।"

"টাকা নেই কেনার জন্য," ড্রয়ারে চিরুনি রাখতে রাখতে বলল রিডবার্গ।

চেয়ারের পাশে মেঝেতে কাপ রাখল ওয়ালান্ডার।

"অনেক ভোরে ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল," বলল সে। "নিসট্রমদের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। ঝোপে বসে শটগান নিয়ে পাহারা দিচ্ছিলেন বৃদ্ধ। আমাকে দেখে গুলি করে বসেন।"

ওর গালের দিকে ইঙ্গিত করল রিডবার্গ।

"বাকশটের কারণে না," বলল ওয়ালান্ডার। "মাটিতে লাফ দিতে গিয়ে পাথরের খোঁচা লেগেছে। বুড়ো অবশ্য বলেছেন, শটগানের অনুমতি আছে তার। কে জানে সত্য বলেছে কিনা।"

"নতুন কিছু বলেছে?"

"কিচ্ছু না। অস্বাভাবিক কিছু দেখেনি। লভগ্রেনদের বাড়িতে টাকা ছিল না। অবশ্য সত্য বলছেন না মিথ্যা, যাচাই করবার উপায় নেই।"

"মিথ্যা বলবেন কেন?"

"তাই তো, কেন বলবেন?"

কফিতে চুমুক দিয়ে মুখ বাঁকাল রিডবার্গ।

"পুলিশদের পাকস্থলী ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে, জানতে?" জিজ্ঞেস করল সে।

"এখন জানলাম।"

"কথাটা যদি সত্য হয়, তার কারণ এই ম্যাড়ম্যাড়ে কফি।"

"তদন্তের সময় এই কফিই কিন্তু আমাদের ভরসা।"

"ঠিক যেমন এখন?"

মাথা নাড়াল ওয়ালান্ডার। "কী করব, বল তো? একটা সূত্রও নেই যে সামনে আগানো যায়।"

"তুমি বড্ড অধৈর্য," কার্ট, বলল রিডবার্গ। "উপদেশের মতো শোনাবে হয়ত, কিন্তু আমার মতে, এই কেসটার ক্ষেত্রে আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে।"

তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করতে লাগল ওরা। ঘটনাস্থল থেকে আঙ্গুলের ছাপ সংগ্রহ করেছে টেকনিশিয়ানরা। এখন মিলিয়ে দেখা হচ্ছে সেন্ট্রাল ডেটাবেইজের সাথে। অতীতে বৃদ্ধদের ওপর হামলা চালানোর রেকর্ড আছে, এমন সব অপরাধীদের বর্তমান অবস্থান খতিয়ে দেখছে হ্যানসন। লুনাপের অধিবাসীদের জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাওয়া হবে। হয়ত ইমেইলে পাঠানো প্রশ্নপত্র থেকে কিছু জানা যাবে। রিডবার্গ ও ওয়ালান্ডার দুজনেই জানে যে যথাযথভাবে ও নিয়মমাফিক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে ইস্তার পুলিশ। আগে হোক বা পরে, কিছু না কিছু জানা যাবে। এখন শুধু অপেক্ষা। আর নিয়মমাফিক কাজ চালিয়ে যাওয়া।

"উদ্দেশ্যটা জানতে পারলে ভালো হত," বলল ওয়ালান্ডার। "টাকাপয়সা বা এ সংক্রান্ত গুজব যদি না হয়, তাহলে কেন হামলা করল? কেনই বা ফাঁস পরিয়ে কষ্ট দিল এক বৃদ্ধাকে? আমার মতোই ভাবছো নিশ্চয়। এ ঘটনার পেছনে ঘৃণা কাজ করেছে, কিংবা প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে অপরাধীরা। অথবা দুটোই।"

"দুইজন বেপরোয়া ডাকাতের কথা ধরা যাক," বলল রিডবার্গ। "ধরে নিলাম, তারা ভেবেছে লভগ্রেনদের কাছে লুকানো টাকাকড়ি আছে। তাহলে এমন হতে পারে না যে লোকগুলোর মনে দয়ামায়া নেই একরত্তি? এভাবে ভাবলে কিন্তু খাপে খাপে মিলে যায় সব। অত্যাচার করাটা ওদের পক্ষে অসম্ভব থাকে না আর।"

"এতটা বেপরোয়া হওয়া সম্ভব?"

"ভালো করেই জানো যে ড্রাগে আসক্তরা মরিয়া হয়ে সবই করতে পারে।"

কথাটা ওয়ালান্ডারের অজানা নয়। প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায়, খুনোখুনি সহ নানা অপরাধের পেছনে ইন্ধন জুগিয়ে যাচ্ছে মাদক পাচার আর ড্রাগ আসক্তি। ইস্তায় এধরণের জঘন্য অপরাধ ঘটতো না বললেই চলে। সময় পাল্টেছে, ভাবল সে। নির্ঝঞ্ঝাট দিনগুলো হয়ত শেষ হয়ে এসেছে।

নিরাপদ বলে আর কিছু নেই। লুনাপের মতো অজপাঁড়া গাঁয়ে ঘটে যাওয়া জোড়া খুন তারই নির্দেশ করে। চেয়ারে পিঠ সোজা করে বসল ওয়ালান্ডার।

"কী করা উচিত আমাদের?" বলল সে।

"তুমিই ভালো জানো," জবাব দিল রিডবার্গ।

"তোমার মতামত জানতে চাইছি।"

উঠে জানালার কাছে গেল রিডবার্গ। আঙ্গুল দিয়ে ছুঁয়ে দেখল টবের মাটি। শুকিয়ে আছে।

"তুমি চাইলে অবশ্যই বলব। তবে এটাও বলে রাখি যে আমার ধারণাই যে সঠিক, এমনটা কিন্তু না। যে সিদ্ধান্তই নাও না কেন, ঝামেলা হবেই। তবে আপাতত চেপে যাওয়াটাই বোধ হয় ভালো হবে। সবেমাত্র তদন্ত শুরু করলাম আমরা। এখনও অনেক কিছু করা বাকি।"

"যেমন?"

"লভগ্রেনদের পরিচিত কেউ কি বিদেশি?"

"আজ সকালেই জিজ্ঞেস করেছিলাম। কিছু ডেনিশের সাথে পরিচয় থাকতে পারে।"

"দেখলে তো।"

"তুমি ভাবছো ওই ডেনিশরাই করেছে কাজটা?"

"করতেও পারে। অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। তাছাড়া, প্রতিবেশী ছাড়াও আরও অনেক মানুষজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। গতকালই তো বোধহয় বলেছিল, লভগ্রেনদের অনেক আত্মীয়স্বজন আছে।"

একমত হলো ওয়ালান্ডার। তদন্তের খাতিরেই গোপন রাখতে হবে যে পুলিশ বিদেশি কাউকে খুঁজছে।

"সুইডেনে বিদেশি অপরাধীদের সম্পর্কে কিছু জানা সম্ভব?" জিজ্ঞেস করল সে। "ন্যাশনাল পুলিশ কি এ সংক্রান্ত আলাদা ফাইল রাখে?"

"সবকিছুই নথিবদ্ধ করে রাখা হয়," জবাব দিল রিডবার্গ। "একজনকে কম্পিউটারের সামনে বসিয়ে সেন্ট্রাল ক্রিমিনাল ডেটাবেইজে খুঁজতে বল। পেলেও পেয়ে যেতে পারে কিছু।"

দাঁড়িয়ে পড়ল ওয়ালান্ডার।

"ফাঁসের ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করবে না?" বলল রিডবার্গ।

"ভুলেই গিয়েছিলাম।"

"নৌকার পাল বানায় এমন একজনের কথা পড়েছিলাম পত্রিকায় গত বছর। লিমহ্যামে থাকে লোকটা। তাকে খুঁজে বের করব ভাবছি। হয়তকোন লাভ হবে না। তাও চেষ্টা করতে তো দোষ নেই।"

"আগে মিটিং এ আসবে, বলল ওয়ালান্ডার। তারপর যেয়ো যেখানে ইচ্ছা।"

সকাল দশটায় সবাই একত্রিত হলো ওয়ালান্ডারের অফিসে।

মৃত্যুর আগে বৃদ্ধার বলে যাওয়া কথাটা সবাইকে জানালো ওয়ালান্ডার। এও জানালো যে আপাতত কথাটা প্রকাশ করা হবে না। আপত্তি করল না কেউ।

বিদেশি অপরাধীদের তালিকা খুঁজে বের করার দায়িত্ব দেয়া হলো মার্টিনসনকে। যাদের লুনাপে জিজ্ঞাসাবাদ করার কথা, তারা চলে গেল নিজেদের কাজে। ওয়ালান্ডার সুইয়েডবারকে দায়িত্ব দিল তরুণ পোলিশ দম্পতির ব্যাপারে খবরাখবর নিয়ে দেখতে তারা বৈধভাবে থাকছে কিনা। আর এত জায়গা থাকতে লুনাপে কেন থাকছে, তাও জানা দরকার। রিডবার্গ বেরিয়ে গেল লিমহ্যামের উদ্দেশ্যে।

সবাই চলে গেলে দেয়ালে ঝুলানো মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে রইল ওয়ালান্ডার। কোথা থেকে এসেছে খুনিরা? কোথায় বা গেছে?

ডেস্কের পেছনে গিয়ে বসল সে। তারপর প্রায় এক ঘন্টা যাবত কথা বলল সাংবাদিকদের সাথে। তবে স্থানীয় রেডিও স্টেশনের মেয়েটা ফোন করেনি।

কিছুক্ষণ পর নরেন উপস্থিত হলো।

"তোমার না লুনাপে যাওয়ার কথা?" বলল বিস্মিত ওয়ালান্ডার।

"হ্যাঁ," বলল নরেন। "তবে একটা কথা মনে হলো।"

শরীর ভিজে আছে বিধায় একটা চেয়ারের কোণায় বসল সে। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। তাপমাত্রা বেড়ে দাঁড়িয়েছে এক ডিগ্রি সেলসিয়াসে।

"তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু না হয়ত," বলল আমতা আমতা করে। "তবুও মনে হলো আপনাকে জানানো উচিত।"

"কোনও সূত্রই ফেলনা নয়," বলল ওয়ালান্ডার।

"ঘোড়াটার কথা মনে আছে?" জিজ্ঞেস করল নরেন।

"কেন থাকবে না?"

"ওটাকে খড় দিতে বলেছিলেন সেদিন।"

"সাথে পানিও।"

"হ্যাঁ, কিন্তু দিতে হয়নি আমাকে।"

কুঁচকে গেল ওয়ালান্ডারের ভুরু। "কেন?"

"আগে থেকেই খড় আর পানি দুটোই দেয়া ছিল।

চুপচাপ নরেনের দিকে তাকিয়ে রইল ওয়ালান্ডার। মুখ খুলল এক মুহূর্ত পর।

"বলে যাও। আরও কিছু বলতে চাইছো নিশ্চয়?"

কাঁধ ঝাকাল নরেন।

"যখন আমি ছোট ছিলাম, আমাদেরও একটা ঘোড়া ছিল," বলতে লাগল সে। "আস্তাবলে রাখা অবস্থায় ঘোড়াটাকে যখন খড় দেয়া হত, সবটাই খেয়ে ফেলতো ওটা। বলতে চাইছি, কেউ ঘোড়াটাকে খড় দিয়েছিল আমরা যাওয়ার এক ঘন্টা বা তার কিছু আগে।"

ফোনের দিকে হাত বাড়াল ওয়ালান্ডার।

"নিস্ট্রমকে ফোন দিয়ে লাভ হবে না," বলল নরেন।

শুনে হাত ফিরিয়ে নিল ওয়ালান্ডার।

"এখানে আসার আগে কথা বলেছি তার সাথে। তিনি দেননি।"

"লভগ্রেনদের পক্ষেও দেয়া সম্ভব ছিল না," বলল ওয়ালান্ডার। "তাহলে দিল কে?"

উঠে দাঁড়াল নরেন। "অস্বাভাবিক না? প্রথমে তারা এক বুড়োকে হত্যা করল। ফাঁস পরিয়ে অত্যাচার করল এক বয়স্কা মহিলার ওপর। তারপর আস্তাবলে গিয়ে খড় দিল ঘোড়াটাকে। এরকম অদ্ভুত কাজ কেন করতে গেল তারা?"

"ঠিকই বলেছ," সায় জানালো ওয়ালান্ডার। "অস্বাভাবিকই বটে। ভালো করেছ আমাকে জানিয়ে।"

বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে গেল নরেন।

বনবন করে ঘুরতে লাগল ওয়ালান্ডারের মস্তিষ্কের চাকা। নরেনের বলা কথাগুলো ভাবনায় ফেলে দিয়েছে।

ওর অনুমানই ঠিক হলো। অস্বাভাবিক কিছু জড়িয়ে আছে ঘোড়াটার সাথে।

টেলিফোনের শব্দে ছিঁড়ে গেল চিন্তার সুতো। আরেকজন সাংবাদিক। কথা বলতে চায় ওয়ালান্ডারের সাথে। বেলা বারোটা পঁয়তাল্লিশের দিকে স্টেশন থেকে বেরিয়ে গেল ওয়ালান্ডার। আজ বহু বছর বাদে দেখা করতে হবে এক পুরনো বন্ধুর সাথে।

পাঁচ

পথিমধ্যে বেগ চাপল কার্ট ওয়ালান্ডারের। অগত্যা গাড়ি থামিয়ে খালি করে নিল পেট। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা একটা সাইনের ওপর চোখ গেল ওর। কোয়ানজুল্ড ক্যাসেলের ধ্বংসাবশেষের দিকে নির্দেশ করছে। বাতাসের গর্জন ছাড়িয়ে শোনা যাচ্ছে স্টুরাপ বিমানবন্দর থেকে ভেসে আসা জেট ইঞ্জিনের শব্দ। গাড়িতে উঠার আগে জুতার তলা থেকে কাদা ছাড়িয়ে নিল সে। আচমকাই বৈরি হয়ে উঠেছে আবহাওয়া। গাড়ির থার্মোমিটার অনুযায়ি, তাপমাত্রা মাইনাস পাঁচ ডিগ্রি। আবার শুরু হলো ওর পথচলা।

ক্যাসেলের পেছনের রাস্তাটা চলে গেছে দুভাগ হয়ে। বাম দিকেরটা অনুসরণ করল ওয়ালান্ডার। যদিও আগে কখনও আসা হয়নি এদিকে, তবে নিশ্চিত যে সঠিক পথেই যাচ্ছে। ঠিকানাটা শোনার পর পেরিয়ে গেছে দশ বছর। তবুও মনে আছে ঠিকই। এসব ব্যাপারে কখনও ভুল হয় না ওর।

প্রায় এক কিলোমিটারের মতো যাওয়ার পর আরও খারাপ হয়ে গেল রাস্তা। গতি কমিয়ে দিল সে। ভেবেই পেল না, ভারী যানবাহনগুলো কী করে এই পথে যাতায়াত করে। সামনে খাড়া নেমে গেছে রাস্তা। কিছুদুর গেলেই একটা বিশাল খামারবাড়ি।

প্রাঙ্গনে ঢুকে গাড়ি থামাল ওয়ালান্ডার। বেরিয়ে এল গাড়ি ছেড়ে। এক ঝাঁক কাক তারস্বরে চেঁচিয়ে উড়ে গেল ওর মাথার ওপর দিয়ে।

জনমানুষের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না খামারে। বাতাসে দেয়ালের সাথে বাড়ি খাচ্ছে একটা আস্তাবলের দরজা। ভুল জায়গায় চলে এল কিনা সন্দেহ হলো ওয়ালান্ডারের।

কী সুনসান নীরবতা, ভাবল সে। কনকনে শীত, কা কা চিৎকার করে উড়ে যাওয়া কাকের ঝাঁক। জুতোয় আটকে থাকা কাদা।

একটা আস্তাবল থেকে স্বর্ণকেশী এক তরুণী বেরিয়ে এল। দেখতে অনেকটা লিন্ডার মতো, মনে হলো ওয়ালান্ডারের। একই রকমের চুল, একহারা গড়ন, হাঁটার ধরণ। তাকিয়ে থাকল সে।

আস্তাবলের ছাদে একটা মই বসাতে নিয়েছিল তরুণী। থমকে গেল ওয়ালান্ডারকে দেখতে পেয়ে। মই ছেড়ে হাত মুছল পরনের প্যান্টে।

"হ্যালো," বলল ওয়ালান্ডার। "এখানে কি স্টেন ওয়াইডেন নামের কেউ থাকে?"

"আপনি কি পুলিশের কেউ?" জিজ্ঞেস করল তরুণী।

"হ্যাঁ," জবাব দিল বিস্মিত ওয়ালান্ডার। "কিভাবে বুঝলে?"

"গলার স্বর শুনে," বলে ফের মইয়ে মনযোগ দিল তরুণী। চেষ্টা করেও নাড়াতে পারছে না। কোন কিছুর সাথে আটকে গেছে সম্ভবত।

"স্টেন ওয়াইডেন আছে?" জিজ্ঞেস করল ওয়ালান্ডার।

"মইটা নাড়াতে সাহায্য করুন তো," বলল মেয়েটা।

ওয়ালান্ডার খেয়াল করে দেখল, মইয়ের একটা ধাপ আটকে আছে দেয়ালের ক্ল্যাডিং এর সাথে। মোচড় দিয়ে ধাপটা খুলে আনল সে।

"ধন্যবাদ," বলল মেয়েটা। "স্টেন অফিসে আছেন বোধ হয়।" বলে লাল ইটের একটা দালানের দিকে নির্দেশ করল আঙুল দিয়ে।

"তুমি এখানে কাজ কর?" জিজ্ঞেস করল ওয়ালান্ডার।

"হ্যাঁ," মই বেয়ে উঠে যেতে যেতে জবাব দিল মেয়েটা। "এখান থেকে এখন সরে গেলেই ভালো হবে আপনার।"

আস্তাবলের দরজা দিয়ে খড়ের গাঁট ছুড়ে ফেলতে লাগল সে। অবাক না হয়ে পারল না ওয়ালান্ডার। কল্পনাও করতে পারেনি এতটা শক্তি ধারণ করে সরু হাতদুটো। অফিসের দিকে পা বাড়াল সে। ভারী দরজায় কড়া নাড়ার আগেই দেখে দালানের কোণা ঘুরে হেঁটে আসছে একজন।

স্টেন ওয়াইডেনকে চিনতে অসুবিধা হলো না ওর। এলোমেলো চুল, লম্বাটে মুখ, অধরের কাছে লালচে ফুসফুড়ি। দশ বছরের বেশি সময় পেরিয়ে গেছে মাঝে। কিছুই বদলায়নি তবুও।

"আরে, স্বপ্ন দেখছি নাকি?" নার্ভাস ভঙ্গিতে হাসলো লোকটা। "প্রথমে ভেবেছিলাম কামার লোকটা এসেছে। কিন্তু এ যে দেখি তুমি। কত বছর পর!"

"প্রায় এগারো বছর হবে," বলল ওয়ালান্ডার। "শেষ দেখা ঊনআশির সেই গ্রীষ্মে।"

"যে গ্রীষ্মে আমাদের সব স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছিল," বলল স্টেন ওয়াইডেন। "চল, ভেতরে বসবে।"

দালানের ভেতর প্রবেশ করল ওরা। তেলের গন্ধ এসে লাগল ওয়ালান্ডারের নাকে। দেয়াল থেকে বেরুচ্ছে। এক কোণে অন্ধকারে পড়ে আছে একটা মরচে পড়া ফসল কাটার যন্ত্র। আরেকটা দরজা খুলল ওয়াইডেন। ওয়ালান্ডার প্রবেশ করতেই একটা ইঁদুর বেরিয়ে গেল কিঁচকিঁচ করে। এই কামরাটাকে অফিস আর বাসস্থলের সম্মিলন বললে অত্যুক্তি হবে না। একপাশের দেয়ালের সাথে লাগোয়া একটা খাট। টেবিলের ওপর একটা টিভি আর একটা মাইক্রোওয়েভ। পুরনো একটা আর্মচেয়ারের ওপর গাদাগাদি করে রাখা কাপড়চোপড়। বাকি

জায়গাটুকুর অনেকটাই দখল করে রেখেছে বিশাল একটা ডেস্ক। চওড়া হওয়ায় কুলুঙ্গিতে এঁটে গেছে একটা ফ্যাক্স মেশিন। তার পাশেই রাখা একটা থার্মোস থেকে কফি ঢালতে লাগল ওয়াইডেন।

ওয়াইডেনের বলা কথাটা মনে পড়ে গেল ওয়ালান্ডারের। চুরমার হয়ে যাওয়া স্বপ্ন। সত্তরের দশকের শেষের দিকের স্বপ্নবাজ দুই তরুণ। অপেরা গায়ক হতে চেয়েছিল ওয়াইডেন। সুরে সুরে মাতাবে মঞ্চ। ওয়ালান্ডার চেয়েছিল ইম্প্রেসারিও হতে। আছজন করবে কনসার্ট, মঞ্চনাটক সহ নানা কিছু।

পরে পুলিশে যোগ দেয় ওয়ালান্ডার। এখনও তাই আছে। ওয়াইডেন যখন বুঝতে পারে গায়ক হবার মতো গলা তার নেই, পিতার খামার আর আস্তাবলের দায়িত্ব নেয়। ব্যর্থ হওয়ার আঘাত সইতে পারেনি ওদের বন্ধুত্ব। একদা প্রতিদিন দেখা না হলে চলতো না ওদের। এখন এগারো বছর পার হয়ে গেলেও খবর থাকে না। যদিও দুজনের মাঝের দূরত্ব পঞ্চাশ কিলোমিটারও না।

"ওজন বেড়েছে তোমার," চেয়ার থেকে পত্রিকার স্তুপ সরাতে সরাতে বলল ওয়াইডেন।

"আর তোমার কিছুই পাল্টায়নি," বলল ওয়ালান্ডার।

"রেসের ঘোড়া যারা প্রশিক্ষণ দেয়, তাদের মোটা হওয়ার সুযোগ থাকে না," বলল ওয়াইডেন। মুখে নার্ভাস হাসি। "চিকন পা, চিকন ওয়ালেট। নামীদামী প্রশিক্ষকদের কথা অবশ্য আলাদা।"

"তা তোমার দিনকাল কেমন যাচ্ছে?" চেয়ারে বসে বলল ওয়ালান্ডার।

"চলে যাচ্ছে কোন রকম," জবাব দিল ওয়াইডেন। "একটা না একটা ঘোড়া থাকেই যেটা রেসে ভালো করে। কয়েকটা নতুন ঘোড়া নিয়ে চালিয়ে নিচ্ছি। কিন্তু-"

আচমকা চুপ হয়ে গেল সে। তারপর ডেস্কের ড্রয়ার থেকে বের করে আনল আধা বোতল হুইস্কি।

"দিব?"

মাথা নাড়াল ওয়ালান্ডার। "পুলিশ হয়ে দায়িত্ব পালনকালীন মাতাল হওয়াটা ভালো দেখাবে না।"

"তাহলে কী আর করা," বলে ঢকঢক করে বোতল থেকেই গিলতে লাগল ওয়াইডেন। তারপর দুমড়ানো একটা প্যাকেট থেকে বের করে নিল সিগারেট। কাগজপত্র আর ফর্ম গাইড খুঁজেপেতে বের করল একটা লাইটার।

"মোনা কেমন আছে?" জিজ্ঞেস করল সে। "লিন্ডা? তোমার বাবা? আর তোমার বোন, কী যেন নাম, কার্সটিন?"

"ক্রিস্টিনা।"

"ও হ্যাঁ, ক্রিস্টিনা। আমার স্মৃতিশক্তি অতটা ভালো না, জানোই তো।"

"গান কখনও ভুলতে না তুমি।"

"তাই?"

বোতলে মুখ লাগাল আবার ওয়াইডেন। তাকে কোন কারণে বিক্ষুব্ধ মনে হলো ওয়ালান্ডারের। হয়ত ওর এখানে আসাই উচিত হয়নি। ওকে দেখে হয়তপুরনো দিনগুলোর কথা মনে পড়ে গেছে স্টেনের, যা সে চায়নি।

"মোনা এখন আমার সাথে থাকে না," বলল ওয়ালান্ডার। "লিন্ডা আছে ওর মতো। বাবার খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। আগের মতোই তার ওই একই ছবি এঁকে যাচ্ছেন। তবে আমার ধারণা, তার বোধবুদ্ধি লোপ পাচ্ছে ধীরে ধীরে। বুঝতে পারছি না কী করব তাকে নিয়ে।"

"আমার বিয়ে হয়েছিল জানতে?" বলল ওয়াইডেন। ওয়ালান্ডারের কথাগুলো যেন তার কানেই ঢুকেনি।

কৌতূহল বোধ করল ওয়ালান্ডার। "না।"

"শেষ পর্যন্ত এই মরার আস্তাবলগুলোরই দায়িত্ব নিতে হয় আমাকে। বাবা যখন টের পান যে বয়সের কারণে ঘোড়াগুলোর যত্ন নিতে পারছেন না, মদে ডুবে যান। আগে নিজের ওপর যা নিয়ন্ত্রণ ছিল, তার বালাই রইল না। তাকে আর তার মাতাল সঙ্গীদের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে। বাধ্য হয়ে এখানকার কর্মী একটা মেয়েকে বিয়ে করি। বাবার সাথে মেয়েটার ভালো খাতির ছিল বলেই করেছিলাম বিয়েটা। একটা বয়স্ক ঘোড়ার মতো বাবার যত্ন করত মেয়েটা। বাবার অভ্যাস পরিবর্তনের চেষ্টা না করে বরং পানের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল। বাবার গা থেকে যখন ভুরভুর করে গন্ধ বেরুতো, একটা হোস পাইপ দিয়ে গোসল করিয়ে দিত। কিন্তু বাবা মারা যাবার পর আমার মনে হত, ওর গা থেকেও বাবার মতো দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। একারণে ডিভোর্স দিয়ে দিই।"

বোতলে চুমুক দিল ওয়াইডেন। মাতাল হয়ে পড়ছে সে। ওয়ালান্ডারের চোখ এড়াল না তা।

"প্রতিদিন ভাবি বেঁচে দিব এই জায়গাটা," বলে চলল ওয়াইডেন। "পুরো খামারবাড়ি এখন আমার। বিক্রি করলে কোটি ক্রোনার পাব। বন্ধকী পরিশোধ করার পরও প্রায় চার লক্ষ ক্রোনার থেকে যাবে। তারপর একটা ক্যাম্পার কিনে বেরিয়ে পড়ব রাস্তায়।"

"কোথায় যাবে?"

"জানি না। জানি না কোথায় যেতে চাই।"

শুনে অস্বস্তি বোধ করল ওয়ালান্ডার। বাইরে না হলেও ভেতরে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে ওয়াইডেনের। দশ বছর আগেরকার স্টেন ওয়াইডেন ছিল সুখী, সদা হাসিখুশি, প্রাণবন্ত। এই ওয়াইডেনের সাথে তার কোন মিল নেই। জীবিত থেকেও যেন মৃত সে। অবসাদগ্রস্ত, জর্জরিত।

ওয়ালান্ডারকে পুলিশ কিনা জিজ্ঞেস করেছিল যেই মেয়েটা, জানালার পাশ দিয়ে চলে গেল সে।

"কে এই মেয়ে?" জিজ্ঞেস করল ওয়ালান্ডার। "দেখেই বলে দিল আমি পুলিশ।"

"ওর নাম লুইজ," জানাল ওয়াইডেন। "বারো বছর বয়স থেকে আছে ফস্টার কেয়ারে। এখন আমিই ওর গার্ডিয়ান। ঘোড়ার যত্নআত্তি করতে পারে ভালো। তবে পুলিশদের ঘৃণা করে। বলে, একজন পুলিশ নাকি ধর্ষণ করেছিল ওকে। বোধ হয় গন্ধ শুঁকে বুঝে গেছে তুমিও পুলিশ।"

আরেক ঢোক হুইস্কি গিলে খাটের উদ্দেশ্যে ইঙ্গিত করল সে।

"মাঝে মাঝে আমার সাথে বিছানায় যায় অবশ্য। আইন বিরুদ্ধ, তাই না?"

"তা কেন হবে? সে নিশ্চয় অপ্রাপ্তবয়স্ক নয়, তাই না?"

"উনিশ বছর বয়স। কিন্তু গার্ডিয়ানরা কি তাদের ওয়ার্ডদের সাথে শারীরিক সম্পর্কে জড়াতে পারে?"

ওয়াইডেনের কণ্ঠ কিছুটা আগ্রাসী বলে মনে হলো ওয়ালান্ডারের। আফসোস করল মনে মনে এখানে আসার জন্য। যদিও তদন্তের খাতিরে আসা, কিন্তু এখন দ্বন্দ্বে পড়ে গেছে সে। ওয়াইডেনের সাথে মোনাকে নিয়ে কথা বলবার উছিলায় আসেনি তো? সান্ত্বনা খুঁজতে?

"ঘোড়ার ব্যাপারে কিছু তথ্যের জন্য তোমার কাছে এসেছিলাম," বলল সে। "লুনাপের জোড়া খুনের ঘটনাটা পত্রিকায় পড়েছ নিশ্চয়?"

"পত্রিকা পড়ি না," বলল ওয়াইডেন। "আমি পড়ি শুধু রেসের ফর্ম গাইড। বাদবাকি দুনিয়া উল্টে গেলেও আমার কিছু যায়-আসে না।"

"এক বয়স্ক দম্পতিকে খুন করা হয়েছে," জানালো ওয়ালান্ডার। "আর তাদের একটা ঘোড়া ছিল।"

"ঘোড়াটাকেও মেরে ফেলা হয়েছে?"

"না। কিন্তু আমার ধারণা খুনিরা যাওয়ার আগে ঘোড়াটাকে কিছু খড় দিয়ে গিয়েছিল। এটা নিয়েই একটা প্রশ্ন ছিল। একটা ঘোড়া কত দ্রুত এক আঁটি খড় খেতে পারে?"

বোতল খালি করে আরেকটা সিগারেট ধরাল ওয়াইডেন।

"তামাশা করছ নাকি?" জিজ্ঞেস করল বন্ধুর উদ্দেশ্যে। "এতদূর এসেছ এই প্রশ্নটা করতে?"

"আসলে এসেছিলাম তোমাকে নিয়ে যেতে," সিদ্ধান্তটা মুহূর্তেই নিল ওয়ালান্ডার। "ঘোড়াটা দেখানোর জন্য।" বলার সময় টের পেল রেগে যাচ্ছে সে।

"সম্ভব না," বলল ওয়াইডেন। "অনেক কাজ পড়ে আছে। কামার আসার কথা আজকে। তাছাড়া ষোলটা ঘোড়াকে ভিটামিন ইনজেকশন দিতে হবে।"

"আগামীকাল?"

চকচক করে উঠল ওয়াইডেনের চোখ। "টাকাপয়সা পাওয়া যাবে নাকি?"

"সম্মানি দেয়া হবে।"

এক টুকর ময়লা কাগজে টেলিফোন নম্বর লিখে দিল ওয়াইডেন।

"সকালে একবার ফোন কর," বলল ওয়ালান্ডারের হাতে কাগজটা ধরিয়ে দিয়ে। "চেষ্টা করে দেখব।"

ওয়াইডেনের সাথে বেরিয়ে এল ওয়ালান্ডার। বাতাসের গতি আরও বেড়েছে বলে মনে হলো ওর। একটা ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে এল সেই তরুণী।

"ঘোড়াটা বেশ সুন্দর," বলল ওয়ালান্ডার।

"দেখতেই যা," বলল ওয়াইডেন। "রেস জিততে পারবে না কখনও। ট্রেলেবর্গ কোম্পানির এক কন্ট্রাক্টরের বিধবা স্ত্রী ঘোড়াটার মালিক। অনেক পয়সাওয়ালা। বলেছিলাম, ঘোড়া চালানো শেখায় এমন কোন স্কুলে বিক্রি করে দিতে। কিন্তু মহিলার বিশ্বাস, তার ঘোড়া জিতবেই। যাক গে, আমার কী? আমি টাকা পেলেই খুশি। তবে এটা গ্যারান্টি দিতে পারি যে এই ঘোড়া দিয়ে আর যাই হোক, রেস জেতা অসম্ভব।"

গাড়ির কাছে এসে বিদায় জানালো ওরা।

"আমার বাবা কিভাবে মারা গিয়েছেন জানো?" হঠাৎ করেই কথাটা বলল ওয়াইডেন।

"না তো।"

"বাবা ক্যাসেলের ধ্বংসস্তূপের ওখানে যেতেন প্রায়ই। সাথে নিয়ে যেতেন মদের বোতল। এক রাতে ওখানে গিয়ে আর ফিরে আসেননি। চারপাশ থেকে দুর্গটাকে ঘিরে রাখা পরিখায় ডুবে মারা যান। শৈবালে থিকথিক করছিল ওখানকার পানি। কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। উনার ক্যাপ ভেসে উঠেছিল বলেই খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়েছিল। বাঁচো মনের খুশিতে লেখা ছিল ক্যাপে। একটা ট্রাভেল ব্যুরোর বিজ্ঞাপনী স্লোগান। ব্যাংককে সেক্স হলিডে বিক্রি করে এরা।"

"ভালো লাগল তোমার সাথে দেখা হওয়ায়," বলল ওয়ালান্ডার। "আগামীকাল কল দিব তাহলে।"

"দেখা যাক," বলে আস্তাবলের দিকে ফিরে গেল ওয়াইডেন।

গাড়ি ছেড়ে দিল ওয়ালান্ডার। রিয়ার-ভিউ মিররে ওয়াইডেনকে দেখতে পেল ঘোড়ার ওপর বসা মেয়েটার সাথে কথা বলতে।

কেন এলাম এখানে? নিজেকে প্রশ্ন করল সে। একদা, অনেক অনেক আগে, বন্ধু ছিলাম আমরা। আকাশকুসুম স্বপ্ন দেখতাম দুজনে। তারপর কর্পূরের ন্যায় সেসব স্বপ্ন যখন উবে গেল, কিছুই রইল না বাকি। হয়ত অপেরা ভালোবাসতাম আমরা। কিন্তু তা হয়ত অলীক কল্পনা ছাড়া কিছুই ছিল না।

অ্যাক্সিলেটরের ওপর গিয়ে পড়ল ওর মনের অশান্তি। পাগলা ঘোড়ার ন্যায় ছুটতে লাগল গাড়ি। স্টপ সাইন দেখে যেইনা ব্রেক কষলো, বেজে উঠল ওর গাড়ির ফোন। নেটওয়ার্কের অবস্থা খারাপ হওয়ায় হ্যানসনের গলা চিনতে খানিকক্ষণ সময় লেগে গেল ওর।

"তাড়াতাড়ি চলে এসো," বলল ওপ্রান্তের কণ্ঠ। "শুনতে পাচ্ছো কি বলছি?"

"কি হয়েছে?" জানতে চাইল ওয়ালান্ডার।

"হ্যাজস্টেডের এক কৃষক দাবি করছে, খুনিদের চেনে সে," চেঁচিয়ে জবাব দিল হ্যানসন।

বেড়ে গেল ওয়ালান্ডারের হৃদপিন্ডের গতি।

"কে?" জিজ্ঞেস করল চেঁচিয়ে। "কে?"

উত্তর এল না। কেটে গেল কল। সোঁ সোঁ আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না রিসিভার থেকে।

"ধুস!" বলে জোরে চেঁচিয়ে উঠল ওয়ালান্ডার।

দ্রুত গাড়ি ছুটালো ইস্তার উদ্দেশ্যে। এত জোরে চালানো ঠিক হচ্ছে না, ভাবল সে। নরেন আর পিটারস যদি ট্রাফিক ডিউটিতে থাকে, তাহলে নিশ্চিত জরিমানা করে বসবে।

পাহাড়ের গা বেয়ে মূল শহরের দিকে যাবে, এমন সময় গড়গড় করে উঠল ইঞ্জিন। লাল বাতি বলছে, পেট্রল শেষ হয়ে এসেছে। সামনে হাসপাতালের মুখোমুখি একটা পেট্রল স্টেশন আছে অবশ্য। তবে তার জন্য পাড়ি দিতে হবে আরও কিছু পথ।

ইঞ্জিন পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবার আগেই পেট্রল স্টেশনে পৌছে গেল ওয়ালান্ডার। কিন্তু বিধি বাম! পাম্পে টাকা দিতে গিয়ে দেখে ওয়ালেট ফাঁকা। বাধ্য হয়ে কাছের একটা দালানে বসবাসকারী এক তালা-চাবি মিস্ত্রীর কাছ

থেকে বিশ ক্রোনার ধার নিল। ওয়ালান্ডারকে দেখে চিনতে পারল মিস্ত্রী কয়েক বছর আগের এক ডাকাতির ঘটনার সূত্রে।

স্টেশনে পৌঁছে, গাড়ি পার্ক করে, প্রায় দৌড় দিল ওয়ালান্ডার। এবা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু হাত নাড়িয়ে চুপ করিয়ে দিল ওয়ালান্ডার।

খোলাই ছিল হ্যানসনের অফিসের দরজা। নক না করেই ঢুকে পড়ল ওয়ালান্ডার। কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। হাতে এক গাদা কাগজ নিয়ে করিডোর দিয়ে যাচ্ছিল মার্টিনসন। তাকে পাকড়াও করল ওয়ালান্ডার।

"আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম," বলল মার্টিনসন। "কিছু চমকপ্রদ তথ্য জানতে পেরেছি। জোড়া খুনের এই ঘটনায় যদি ফিনিশ কেউ জড়িত থাকে, অবাক হব না।"

"হাতে সূত্র না থাকলে ফিনিশদেরকে দোষ তো দিবেই," বলল ওয়ালান্ডার। "এসব শোনার সময় নেই এখন। হ্যানসন কোথায়?"

"তিনি তো অফিস ছেড়ে বের হন না।"

"তাহলে বোধহয় এপিবি জারি করতে হবে ওর নামে। অফিসে নেই দেখলাম।"

ক্যান্টিনেও পাওয়া গেল না হ্যানসনকে। গেল কোথায়? চিন্তা হলো ওয়ালান্ডারের। নিজের অফিসে ঢুকল। সেখানেও নেই। শেষ ভরসা হিসেবে ফোন দিল এবাকে।

"হ্যানসন কোথায়?"

"সেটাই তো বলতে চাইছিলাম যখন স্টেশনে ঢুকলে," বলল এবা। "ইউনিয়ন ব্যাংকে গেছে সে।"

"ব্যাংকে? কেন? সাথে ছিল কেউ?"

"হ্যাঁ, কিন্তু আমি চিনি না।"

ঠাস করে রিসিভার নামিয়ে রাখল ওয়ালান্ডার। তারপর তুলে নিল আবারও।

"হ্যানসনের সাথে যোগাযোগ করা যাবে?" জিজ্ঞেস করল এবাকে।

"ইউনিয়ন ব্যাংকে কল করব?"

"যদি করা যায়, তাহলে নিশ্চয়।"

কাউকে প্রয়োজন পড়লে সাধারণত নিজেই খুঁজে নেয় ওয়ালান্ডার। এবার সাহায্য নেয়ার দরকার পড়ে খুবই কম। ছোটবেলা থেকেই গড়ে নিয়েছে এই অভ্যাস। বড়লোক, উদ্ধত ব্যক্তিরাই শুধুমাত্র নিজেদের কাজ অন্যদের দিয়ে করায়। এবাকে ফোন করতে বলাটা অবশ্য সেই কাতারে পড়ে না। ফোনবুক

থেকে একটা নম্বর বের করে নিয়ে ফোন করতে না পারাটা হলো গিয়ে আলসেমি।

টেলিফোন বেজে উঠলে ছিঁড়ে গেল ওয়ালান্ডারের চিন্তার সুতো। ইউনিয়ন ব্যাংক থেকে ফোন দিয়েছে হ্যানসন।

"ভেবেছিলাম তুমি ফিরবার পূর্বেই ফিরে যাব," চেষ্টা করল সাফাই গাইতে।

"ওখানে কী করছ?"

"লভগ্রেনের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট চেক করে দেখছি আমরা।"

"আমরা?"

"লোকটার নাম হার্ডিন। আধা ঘন্টার মাঝেই ফিরছি। তখন সামনাসামনি কথা বলতে পারবে তার সাথে।"

দেড় ঘন্টা পর হার্ডিন নামের লোকটার সাথে সাক্ষাৎ হলো ওয়ালান্ডারের। লোকটা লম্বায় প্রায় ছয় ফিট। দেখতে চিকনচাকন হলে কী হবে, জোর আছে গায়ে। ওয়ালান্ডারের মনে হলো কোন দানবের সাথে হাত মেলাচ্ছে।

"সময় লাগলেও কাজ হয়েছে," বলল হ্যানসন। "হার্ডিনের মুখ থেকেই শুনো সব।"

একটা কাঠের চেয়ারে সোজা হয়ে বসে আছে হার্ডিন। পরনে কুঁচকানো স্যুট, শার্ট। পুলিশ স্টেশনে তৈরি হয়েই এসেছে।

"প্রথম থেকে শুরু করলেই ভালো হয়," বাতলে দিল ওয়ালান্ডার।

বিহ্বল দৃষ্টিতে হ্যানসনের দিকে তাকাল হার্ডিন।

"আবার প্রথম থেকে?"

"এতে সুবিধা হবে আমাদের," বলল হ্যানসন।

"কিন্তু কাহিনি তো অনেক লম্বা," হার্ডিনের কণ্ঠে দ্বিধা।

"আপনার নাম?" জিজ্ঞেস করল ওয়ালান্ডার। "এখান থেকেই শুরু করা যাক।"

"লার্স হার্ডিন। হ্যাজস্টেডের কাছেই চল্লিশ একরের খামার আছে আমার। পশুপালন করে দুচার পয়সা কামাই করার চেষ্টা করছি। তবে খুব একটা সুবিধা করে উঠতে পারছি না।"

"উনার ব্যক্তিগত সব তথ্য আমার কাছে আছে," বাঁধা দিয়ে বলল হ্যানসন। তার তাড়াহুড়ো দেখে ওয়ালান্ডারের মনে হলো, ফর্ম গাইডের মাঝে ফিরে যেতে চাইছে সে।

"আপনি বলেছেন, মি. ও মিসেস লভগ্রেনের হত্যাকান্ড সম্পর্কিত তথ্য আছে আপনার কাছে," বলল ওয়ালান্ডার।

"এই ঘটনার পিছনে অর্থসম্পদই দায়ী," বলল লার্স হার্ডিন।

"কিসের অর্থসম্পদ?"

"তারা যেসব অর্থসম্পদের মালিক ছিল আরকি!"

"খোলাসা করে বলুন তো।"

"জার্মানী থেকে পাচার করা ক্রোনার।"

হ্যানসনের দিকে তাকাল ওয়ালান্ডার। তার শ্রাগ করা দেখে বুঝলো, ধৈর্য ধরতে হবে।

"আমার মনে হয়, আরেকটু খুলে বললে ভালো হত," বলল সে।

"যুদ্ধের সময় বেশ টুপাইস কামিয়েছিল লভগ্রেন আর তার বাবা," বলল হার্ডিন। "স্মোল্যান্ডের কোন এক বনের মধ্যে তৃণভূমিতে গোপনে গবাদিপশু পালতো তারা। কিনে নিত জীর্ণ, বুড়ো ঘোড়া। তারপর সেসব বিক্রি করত জার্মানির কালো বাজারে। অনেক টাকা কামিয়েছিল মাংস বিক্রি করে। কিন্তু কেউ জানতেও পারেনি। লভগ্রেন ছিল যেমন লোভী, তেমন ধূর্ত। কালো বাজার থেকে কামানো টাকা খাটিয়ে আরও বড়লোক হতে থাকে সে।"

"লভগ্রেনের বাবার কথা বলছেন?"

"লভগ্রেনের কথাই বলছি। ওর বাবা তো যুদ্ধের পরপরই মারা যায়।"

"তারমানে, আপনি বলতে চাইছেন, লভগ্রেনরা ধনী ছিল?"

"লভগ্রেনরা না, শুধু লভগ্রেন। তার স্ত্রী কিছুই জানতো না এ ব্যাপারে।"

"এত সব অর্থসম্পদের কথা তিনি তার স্ত্রী থেকে গোপন রেখেছেন?"

মাথা দোলাল হার্ডিন। "হ্যাঁ, আমার বোনকে ঠকিয়েছে সে।"

বিস্ময়ে উঁচু হয়ে গেল ওয়ালান্ডারের ভুরু।

"মারিয়া লভগ্রেন আমার বোন। ওই লভগ্রেনের কালো টাকার কারণে খুন হতে হয়েছে আমার নিষ্পাপ বোনটাকে।"

হার্ডিনের কণ্ঠে ফুটে উঠা তিক্ততা ওয়ালান্ডারের কান এড়াল না।

"যে অর্থসম্পদের কথা আপনি বলছেন, লভগ্রেন কি তা বাসাতেই রাখতেন?"

"মাঝে মাঝে," জবাব দিল হার্ডিন।

"মানে?"

"যখন ব্যাংক থেকে তুলে আনা টাকার অঙ্কটা বড় হত।"

"ঠিক বুঝলাম না।"

সহসাই রাগের ছাপ পড়ল হার্ডিনের চেহারায়।

"ভালোই হয়েছে ইয়োহানেস লভগ্রেন মরেছে," বলল সে। "তার মতো নরপশু দ্বিতীয়টা ছিল না। আফসোস, আমার বোনটাকেও মরতে হলো সাথে।"

এরপর লার্স হার্ডিন যা করল, তার জন্য হ্যানসন বা ওয়ালান্ডার কেউই প্রস্তুত ছিল না। টেবিল থেকে একটা গ্লাস নিয়ে সজোরে ছুড়ে মারলো দেয়ালে। চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল কাঁচের টুকরা। ওয়ালান্ডারের উপরের ঠোঁটেও এসে লাগল একটা টুকরা।

চমক কাটতেই লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল হ্যানসন। হার্ডিনের ওপর ঝাপিয়ে পড়তে প্রস্তুত। বাঁধা দিল ওয়ালান্ডার। থামিয়ে দিল হাত উঠিয়ে। ফের বসে পড়ল হ্যানসন।

"ক্ষমা করবেন, বলল হার্ডিন। ঝাড়ু থাকলে দিন। পরিষ্কার করে দিচ্ছি। দামও পরিশোধ করে দিব।"

"প্রয়োজন নেই," বলল ওয়ালান্ডার। "পরিচ্ছন্নকর্মীরা পরিষ্কার করে দিবে। আপনি বরং যা যা জানেন, বলতে থাকুন।"

হার্ডিনকে আগের মতো উত্তেজিত দেখাচ্ছে না এখন।

"ইয়োহানেস লভগ্রেনের মতো ধূর্ত খুব কমই ছিল," বলল শান্ত স্বরে। "যুদ্ধের সময় অর্জিত ধনসম্পদই ছিল তার ধ্যানজ্ঞান। কিন্তু ভান ধরত যেন অন্যদের মতোই সঙ্গিন তার অবস্থা। দাম বাড়ার কারণে তার মতো গরীব কৃষকদের দুর্দশা হা-হুতাশ করত। অথচ যে পরিমাণ ধনসম্পদ তার ছিল, তা দিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে জীবন কাটাতে পারত।"

"ব্যাংকে জমা রাখতো সেই সব অর্থ?"

শ্রাগ করল হার্ডিন। "ব্যাংকে রাখতো, শেয়ার বাজারে খাটাতো, বন্ড কিনত। আর কত কী করেছে কে জানে।"

"মাঝেমধ্যে বাড়িতে রাখতো কেন?"

"লভগ্রেনের এক রক্ষিতা ছিল," জানালো হার্ডিন। "কৃষানইস্তার এক মহিলার সাথে ছিল তার গোপন সম্পর্ক। ১৯৫০ এর দিকে একটা সন্তানও হয় তাদের। মারিয়া এসবের কিছুই জানতো না। স্ত্রীর পেছনে যা খরচ করত, তারচেয়ে বেশি ওই রক্ষিতাকে দিত লভগ্রেন।"

"পরিমাণটা কত হতে পারে?"

"বছরে দুই বা তিনবার করে পঁচিশ থেকে ত্রিশের মতো। নগদ তুলে আনত ব্যাংক থেকে। তারপর কোন একটা অজুহাত দেখিয়ে চলে যেতে কৃষানইস্তায়।"

হার্ডিনের কথাগুলো ভাবালো ওয়ালান্ডারকে। সব তথ্য যাচাই করে দেখতে অনেক সময় লেগে যাবে।

"ব্যাংক থেকে কী জানতে পারলে?" জিজ্ঞেস করল হ্যানসনকে।

"ওয়ারেন্ট ছাড়া সাহায্য করতে পারবে না তারা," জবাব দিল হ্যানসন। "লভগ্রেনের ব্যাংক স্টেটমেন্ট দেখতে দেয়নি। তবে একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে: লভগ্রেন কি সম্প্রতি ব্যাংকে গিয়েছিল?"

"কী বলেছে?"

মাথা দোলাল হ্যানসন। "গত বৃহস্পতিবার গিয়েছিল। খুন হবার তিনদিন আগে।"

"নিশ্চিত?"

"একজন কেরানি নিশ্চিত করেছে।"

"লভগ্রেন ক্রোনার তুলেছিল কিনা এ বিষয়ে কিছু বলেছে?"

"ঠিক বলেনি। তবে ব্যাংক ম্যানেজার উল্টো ঘুরলে মাথা দুলিয়ে সায় জানিয়েছে ওই কেরানি।"

"প্রসিকিউটরের সাথে কথা বলতে হবে এ ব্যাপারে," বলল ওয়ালান্ডার। "তারপর দেখা যাবে লভগ্রেনের ধনসম্পদ আমাদের কোথায় নিয়ে যায়। কিন্তু তার আগে আপনার থেকে একটা বিষয় জানা দরকার।"

শেষ কথাটা বলল হার্ডিনের উদ্দেশ্যে। "আপনি বলেছেন, আপনার বোন এসব কিছুই জানতেন না। তাহলে আপনি কিভাবে জানলেন?"

উত্তর দিল না হার্ডিন। চুপচাপ তাকিয়ে রইল মেঝের দিকে।

"উত্তরটা আমাদের জানা দরকার, মি. লার্স হার্ডিন," বলল ওয়ালান্ডার।

"কিন্তু আমি উত্তর দিতে বাধ্য নই," বলল হার্ডিন। "আমি ওদের খুন করিনি। নিজের বোনকে কেন মারতে যাব?"

ভিন্নভাবে উত্তর আদায় করার চেষ্টা করল ওয়ালান্ডার। "আপনি আমাদের যা যা বলেছেন, তা আর কতজন জানে?"

উত্তর দিল না হার্ডিন।

"নির্ভয়ে বলতে পারেন," আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল ওয়ালান্ডার। "আপনার কথা এই কামরার বাইরে যাবে না।"

মেঝের দিকে তাকিয়েই রইল হার্ডিন। ওয়ালান্ডার বুঝতে পারল, সময় লাগবে লোকটার পেট থেকে কথা বের করতে।

"আমাদের জন্য কফি আনতে পারবে?"বলল হ্যানসনকে। সাথে কয়েকটা পেস্ট্রি।"

হ্যানসন চলে গেলেও মুখ তুলল না হার্ডিন। অপেক্ষা করতে লাগল ওয়ালান্ডার। হ্যানসন ফিরে এলে একটা বাসি পেস্ট্রি খেল হার্ডিন।

আবারও প্রশ্ন করার সিদ্ধান্ত নিল ওয়ালান্ডার। "আগে হোক বা পরে, উত্তর কিন্তু আপনাকে দিতেই হবে।"

মাথা সরাসরি ওর চোখের দিকে তাকাল হার্ডিন।

"মারিয়া আমার ছোট বোন... ছিল। ওর ভালোটাই চাইতাম আমি সর্বদা। প্রথম যেবার লভগ্রেন আমার বাবা-মার বাড়িতে উপস্থিত হয়, তখন থেকেই সন্দেহ হয় আমার। ইয়োহানেস লভগ্রেনের হাবভাব কেমন খাপছাড়া মনে হত। মিশুক, আবার নিজের সম্পর্কে তেমন কিছু বলতে চাইতো না। তার আসল রূপ ধরতে ত্রিশ বছর লেগে যায় আমার। কিভাবে কাজটা করেছি, তা সম্পূর্ণই আমার ব্যাপার।"

"আপনার বোনকে জানান নি?"

"একটা শব্দও না।"

"অন্য কাউকে? আপনার স্ত্রীকে?"

"আমি অবিবাহিত।"

সামনে বসে থাকা লোকটার ওপর চোখ বুলালো ওয়ালান্ডার। এক ধরণের কাঠিন্য ফুটে আছে তার চেহারায়।

"শেষ প্রশ্ন," বলল ওয়ালান্ডার। "লভগ্রেন যেহেতু প্রচুর অর্থসম্পদের মালিক ছিলেন, তাই সেই রাতে তার বাড়িতে বড় অঙ্কের অর্থ থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। সেটা আমাদের জানতে হবে। কিন্তু আপনি ছাড়া আর কার পক্ষে এরকম কিছু জানা সম্ভব?"

মুখ তুলে তাকাল হার্ডিন। তার চোখে ভয়ের আভা দেখতে পেল ওয়ালান্ডার।

"আমি এরকম কিছুই জানতাম না।"

মাথা দোলাল ওয়ালান্ডার। "আজকের মতো এখানেই থাক," বলল হাতের প্যাড সরিয়ে রাখতে রাখতে। "তবে আপনার সাহায্য আবারও দরকার হতে পারে।"

"আমি কি এখন যেতে পারি?" উঠে দাঁড়িয়ে বলল হার্ডিন।

"জি," জবাব দিল ওয়ালান্ডার। "তবে আমাদের অনুমতি ছাড়া জেলা ছাড়বেন না। আর নতুন কিছু জানানোর থাকলে ফোন করতে দ্বিধা করবেন না।"

ইতস্তত করল হার্ডিন যাওয়ার পূর্বে, যেন কিছু একটা বলবে। তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

"মার্টিনসনকে বল লোকটার ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাতে," বলল ওয়ালান্ডার। "হয়ত কিছুই পাওয়া যাবে না। তবুও নিশ্চিত হওয়া দরকার।"

"তো, কী মনে হলো হার্ডিনের কথা শুনে?" জিজ্ঞেস করল হ্যানসন।

জবাব দেয়ার আগে ভেবে নিল ওয়ালান্ডার।

"মনে হয় না মিথ্যা বলছে। কোনভাবে হয়ত জানতে পেরেছিল লভগ্রেনের দ্বৈত জীবনের কথা। কিন্তু মুখ খুলেনি বোনের কথা ভেবে।"

"খুনের পেছনে তার হাত নেই তো?"

এবার উত্তর দিতে দ্বিধা করল না ওয়ালান্ডার। "হার্ডিন করেনি খুনগুলো। মনে হয় না, সে জানে কে করেছে। আমার ধারণা, আমাদের কাছে এসেছে সে দুটো কারণে। খুনিদের খুঁজে বের করতে সাহায্য করতে চাইছে যাতে তাদের ধন্যবাদ দিতে পারে, আবার মুখের ওপর থুথু ছিটাতে পারে। লভগ্রেনকে খুন করে হার্ডিনের মনের ইচ্ছা পূরণ করেছে খুনিরা। কিন্তু মারিয়াকে যারা মেরেছে, পারলে তাদের জনসম্মুখে গর্দান নেবে সে।"

উঠে দাঁড়াল হ্যানসন। "মার্টিনসনকে জানিয়ে দিব। আর কিছু?"

ঘড়ি দেখল ওয়ালান্ডার।

"এক ঘন্টা পর আমার অফিসে মিটিং। রিডবার্গকে পাওয়া যায় কিনা দেখ। সে সম্ভবত মালমোতে গেছে এক নৌকার পালের কারিগরের সাথে দেখা করতে।"

জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে তাকাল হ্যানসন।

"ফাঁসের গিঁট নিয়ে জিজ্ঞেস করতে। পরে জানাব সব।"

হ্যানসন চলে গেলে চুপচাপ বসে রইল ওয়ালান্ডার।। অবশেষে একটা দিকনির্দেশনা পাওয়া গেল, বলল মনে মনে। জানি না কী হবে শেষ পর্যন্ত। তবে একটা সমাধান তো আছে নিশ্চয়।

জানালার দিকে এগিয়ে গেল সে। গোধূলি নেমেছে বাইরে। হিম হিম বাতাস চুইয়ে ঢুকছে জানালার ফ্রেম বেয়ে। স্ট্রিটলাইটের দুলুনি দেখেই বোঝা যায়, বাতাস বইছে তীব্র বেগে।

নিস্ট্রম আর তার স্ত্রীর কথা মনে পড়ল ওর। এত বছর ধরে একত্রে বসবাস করেও চিনতে ভুল করেছে তারা তাদের প্রতিবেশীকে। সত্যটা যখন জানতে পারবে, কেমন হবে তাদের মনের অবস্থা? অস্বীকার করবে? নাকি ঘৃণায় মুখ বাঁকাবে?

ডেস্কে ফিরে গেল ওয়ালান্ডার। এ ধরণের অগ্রগতির ফলে মনে যে স্বস্তি নামে, তা মিলিয়ে যায় নিমিষেই। যদিও খুনের সম্ভাব্য একটা কারণ জানা গেছে, কিন্তু তা ফলপ্রসূ হবে না যদি না সন্দেহভাজন কারও নাম উঠে আসে।

ঘড়ি দেখল সে। তাড়াহুড়ো করলে হয়ত রেল স্টেশনের কাছের হট ডগ স্ট্যান্ডে গিয়ে কিছু খেয়ে নিতে পারবে মিটিং এর আগে। আজকেও খাদ্যাভ্যাস পাল্টানো সম্ভব হবে না।

জ্যাকেট গায়ে দিতে যাবে সে, অমন সময় বেজে উঠল টেলিফোন। একই মুহূর্তে নক পড়ল দরজায়। জ্যাকেট মেঝেতে ফেলে দিয়ে ফোন ধরল সে। সেই সাথে চেঁচিয়ে বলল, "ভেতরে এসো।"

রিডবার্গ দাঁড়িয়ে দোরগোড়ায়। হাতে বড় একটা প্লাস্টিক ব্যাগ।

ফোনে এবার কণ্ঠ শুনতে পেল ওয়ালান্ডার।

"টিভির লোকজন কথা বলতে চাইছে তোমার সাথে," বলল এবা।

মিডিয়ার দিকটা সামলানোর আগে রিডবার্গের সাথে কথা বলার সিদ্ধান্ত নিল ওয়ালান্ডার।

"বল জরুরি মিটিং এ আছি। আধা ঘন্টার আগে সম্ভব হবে না।"

"আধা ঘন্টা পর সময় দিতে পারবে তো? সুইডিশ টিভি তো রাজার ঘরের রাজা। অপেক্ষা করতে পছন্দ করে না। মনে করে যে সবাই এসে তাদের পায়ে লুটিয়ে পড়বে।"

"আমি পায়ে পড়তে পারব না। তবে কথা বলতে পারব আধা ঘন্টা পর।"

এই ফাঁকে জানালার পাশের চেয়ারে গিয়ে বসেছে রিডবার্গ। পেপার ন্যাপকিন দিয়ে ভেজা চুল মুছতে ব্যস্ত।

"ভালো খবর আছে," জানালো ওয়ালান্ডার।

চুল ঝেড়েই চলল রিডবার্গ।

"খুনের সম্ভাব্য কারণ জানা গেছে। ক্রোনার। আমার মনে হয় লভগ্রেনদের কাছের মানুষদের কাজ।"

ভেজা ন্যাপকিন ময়লার ঝুড়িতে ছুড়ে ফেলল রিডবার্গ।

"আমার দিনটা বাজে গেছে," জানালো সে। "ভালো কিছু শুনতে পারলে ভালোই লাগবে।"

পাঁচ মিনিট ধরে লার্স হার্ডিনের বলা কথাগুলো বর্ণনা করে গেল ওয়ালান্ডার। মেঝেতে পড়ে থাকা কাঁচের টুকরার দিকে গম্ভীর ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল রিডবার্গ।

"অদ্ভুত বটে," মন্তব্য করলওয়ালান্ডারের বলা শেষ হলে।

"পুরো ঘটনাটা এভাবে সাজানো যায়," বলে চলল ওয়ালান্ডার। "কেউ জানতো ইয়োহানেস লভগ্রেন মাঝেমাঝে বাড়িতে বড় অঙ্কের অর্থ এনে রাখতো। তা হাতিয়ে নিতেই এসেছিল ডাকাতেরা। হার্ডিনের বর্ণনা যদি ঠিক হয়ে থাকে, তাহলে লভগ্রেন কিছুতেই বলতে চায়নি ক্রোনার কোথায় লুকিয়ে

রেখেছিল। ওদিকে মারিয়া লভগ্রেন তো কিছুই জানতো না। ডাকাতেরা অত্যাচার চালিয়ে যায় মুখ খোলানোর জন্য, যা শেষ পর্যন্ত খুনে রূপ নেয়। এখন প্রশ্ন হলো, হার্ডিন ছাড়া আর কে জানতো লভগ্রেনের লুকানো টাকার ব্যাপারে? এই প্রশ্নের উত্তর মিললেই সমাধান হয়ে যাবে এই রহস্য।"

একটানা বলা শেষ করে থামল ওয়ালান্ডার। চিন্তিত দেখাল রিডবার্গকে।

"কিছু বাদ পড়েছে নাকি?" জিজ্ঞেস করল ওয়ালান্ডার।

"আমি ভাবছি মারিয়া লভগ্রেনের বলা শেষ কথাটা," বলল রিডবার্গ। "বিদেশি। আর তার গলায় পরানো ফাঁস।"

প্লাস্টিকের ব্যাগটা ডেস্কের ওপর উপুড় করে ধরল সে। বেরিয়ে এল এক গাদা দড়ি। প্রত্যেকটায় একটা করে গিঁট।

"যেমনটা তোমাকে বলেছিলাম, গিয়েছিলাম ওই পালের কারিগরের সাথে দেখা করতে," বলল রিডবার্গ। "লোকটার বয়স নব্বইয়ের কাছাকাছি হবে। বয়সের কারণে বোধবুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে। কী যে গন্ধ তার ফ্ল্যাটে! বুঝতে পারছিলাম না সোশ্যাল সার্ভিসকে খবর দিব কিনা। এমন অবস্থা যে আমাকে তার সন্তান ভেবেছিল। পরে একজন প্রতিবেশি জানায়, ত্রিশ বছর আগেই মারা গেছে বৃদ্ধের সন্তান। তবে এটা ঠিক যে গিঁট সম্পর্কে তার জানাশোনা ভালোই। আমার যাওয়ার কারণ তাকে বোঝাতে বোঝাতেই চলে যায় প্রায় চার ঘন্টা। এই রশি গুলো দিয়েছে উপহার হিসেবে।"

"আমাদের ফাঁসটা দেখে কী বলল?"

"সে আরেক ঝক্কি। গিঁটটা দেখে বলে যে ওটা নাকি বিশ্রী। পরে আমার তিন ঘন্টা লেগে যায় তাকে বুঝাতে যে আমি ওই বিশ্রী গিঁটটা সম্পর্কে জানতে চাই। মাঝখানে একবার ঘুমিয়েও পড়েছিল বুড়ো।"

বলতে বলতে দড়ির টুকরগুলো প্লাস্টিকের ব্যাগে ঢুকাতে শুরু করে রিডবার্গ। "জেগে উঠে তার সমুদ্রে কাটানো দিনগুলোর কথা বলতে শুরু করে সে। তখন বলে যে এ ধরণের গিঁট নাকি আর্জেন্টিনায় দেখেছে। আর্জেন্টাইন নাবিকেরা নাকি তাদের কুকুরের জন্য এই ধরণের ফাঁস ব্যবহার করে।"

মাথা দোলাল ওয়ালান্ডার।

"তাহলে তোমার কথাই ঠিক। গিঁটটা বিদেশি। এখন আমাদের জানতে হবে হার্ডিনের গল্পের সাথে এর সংযোগ কোথায়।"

করিডোরে বেরিয়ে এল ওরা। রিডবার্গ গেল তার অফিসের দিকে। ওয়ালান্ডার গেল মার্টিনিসনের খোঁজে। অপরাধী কিংবা অপরাধের দায়ে সন্দেহভাজন এমন সুইডেনে অবস্থানকারী বিদেশিদের সন্ধান নিয়েছে মার্টিনসন। এবং সংখ্যাটা নেহায়েত কম নয়। বয়স্ক মানুষদের ওপর হামলা

চালানোর অভিযোগ আছে এমন অপরাধীদেরও খোঁজ নিয়েছে সে। অন্তত চারজন লোক বা গ্যাঙের কথা জানা গেছে যারা গত বারো মাসে স্কেওনার বৃদ্ধদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে। কিন্তু সমস্যা হলো, এদের প্রত্যেকেই জেল খাটছে বর্তমানে। মার্টিনসন এখন জানার চেষ্টা করছে জোড়া খুনের রাতে এদের কাউকে ছুটি দেয়া হয়েছিল কিনা।

ওয়ালান্ডারের অফিসের মেঝে থেকে কাঁচ পরিষ্কার করতে হবে বিধায় রিডবার্গের অফিসে মিটিং করার সিদ্ধান্ত হলো। ওয়ালান্ডারের ফোন বেজেই চলেছে। কিন্তু রিসিভ করার কথা মাথাতেও আনল না পরিচ্ছন্নকর্মী।

লম্বা সময় ধরে চলল মিটিং। হার্ডিনের জবানবন্দি শুনে আশাবাদী হলো প্রত্যেকেই। আলোচনা চলল লুনাপের অধিবাসীদের নেয়া সাক্ষাৎকারের ওপর। পুলিশের পাঠানো প্রশ্নপত্র পেয়ে ফোন করেছে অনেকেই। এক লরি চালক জানিয়েছে, শনিবার রাত তিনটার দিকে ইয়োতেবোরিয়ার দিকে যাচ্ছিল সে। তখন লুনাপ থেকে কয়েক কিলোমিটার দুরের এক গ্রামের মধ্যে দিয়ে একটা গাড়ি যেতে দেখেছে প্রচণ্ড গতিতে। আরেকটু হলেই একটা মোড়ের কাছে সংঘর্ষ ঘটত তার লরির সাথে। জোড়া খুনের ঘটনা শুনে পুলিশকে ফোন করে সে। তার অনুমান, গাড়িটা ছিল নিসান ব্রান্ডের। তবে জোর দিয়ে বলতে পারছে না।

"হতেও পারে যে গাড়িটা ভাড়া করা," মত দিল ওয়ালান্ডার। "চুরি করবার পাশাপাশি ডাকাতেরা গাড়ি ভাড়াও নিয়ে থাকে।"

মিটিং শেষ হতে হতে সন্ধ্যা ছয়টা। ওয়ালান্ডারের মনে হলো, লার্স হার্ডিনের জবানবন্দির কারণে সকলে যেন নবোদ্যম লাভ করেছে।

অফিসে ফিরে গিয়ে হার্ডিনের সাক্ষাৎকারের সময় নেয়া নোট টাইপ করে ফেলল সে। মিলিয়ে দেখতে হ্যানসন থেকে আনিয়ে নিল তার নেয়া নোট। দেখা গেল, দুই জনের নোটে কোন রকমফের নেই। মিথ্যা বলেনি লার্স হার্ডিন।

সাতটার কিছু পরে কাগজপত্র সরিয়ে রাখল ওয়ালান্ডার। খেয়াল হলো, টিভির লোকেরা আর ফোন করেনি। সুইচবোর্ডে ফোন দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, বাড়ি যাওয়ার আগে এবা কোন মেসেজ রেখে গেছে কিনা।

"এখানে তো তেমন কিছু দেখছি না," জবাব দিল অস্থায়ীভাবে নিয়োগ পাওয়া এক তরুণী।

ক্যান্টিনে গিয়ে টিভি ছেড়ে দিল ওয়ালান্ডার। স্থানীয় সংবাদ শুরু হয়েছে সবেমাত্র। মালমো শহরের ফান্ড সংকটে ভোগা নিয়ে একটা খবর প্রচারিত হচ্ছে।

ওয়ালান্ডারকে টানতে পারল না সংবাদটা। মন জুড়ে চিন্তার জট। ওর ভুঁড়িওয়ালা পেট। স্টেন ওয়াইডেন। যুদ্ধের সময় নাৎসিদের কাছে মাংস বিক্রি করা ইয়োহানেস লভগ্রেন।

টিভি বন্ধ করে দিবে, এমন সময় ইস্তা পুলিশ স্টেশনের ছবি ভেসে উঠল ব্যাকগ্রাউন্ডে। লুনাপের জোড়া খুন নিয়ে বলতে লাগল সংবাদ পাঠিকা। মনযোগ দিল ওয়ালান্ডার। এবং তাজ্জব বনে গেল শুনে। সংবাদে বলা হলো, ইস্তার পুলিশ ধারণা, খুনের পেছনে বিদেশি কারও হাত আছে। সন্দেহ করা হচ্ছে, আশ্রয়প্রার্থী কিছু শরণার্থী জড়িত থাকতে পারে এই ঘটনায়। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও যোগাযোগ করা যায়নি তদন্তের দায়িত্বে থাকা পুলিশ স্টেশনের কোন ডিটেকটিভের সাথে। একারণে যাচাই করা সম্ভব হয়নি অজ্ঞাত তবে নির্ভরযোগ্য সূত্রে পাওয়া এই তথ্য।

তারপর সরাসরি আবহাওয়া সংবাদে চলে গেল সংবাদ পাঠিকা। একটা ঝড় এগিয়ে আসছে পশ্চিম দিক থেকে। বাতাসের বেগ থাকবে, তবে তুষারপাত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। হিমাঙ্কের ওপরে থাকবে তাপমাত্রা।

টিভি বন্ধ করে দিল ওয়ালান্ডার। অদ্ভুত অনুভূতি হলো ওর। বুঝতে পারল না কেন। ক্রোধে? ক্লান্তিতে? নাকি ক্ষুধায়?

পুলিশ স্টেশনের কেউ একজন তথ্য পাচার করেছে। আজকাল হয়ত গোপন তথ্যের বিনিময়ে ক্রোনার পাওয়া যায়।

কে করল কাজটা? ভেবে পেল না ওয়ালান্ডার। আমি ছাড়া যে কেউই হতে পারে। কিন্তু কেন? ক্রোনার ছাড়া কি অন্য কোন কারণ আছে? জাতিগত বিদ্বেষ? শরণার্থীদের প্রতি ভীতি? অফিসের দিকে পা বাড়াল সে। করিডোরে থাকতেই শুনতে পেল টেলিফোনের শব্দ।

ক্লান্ত একটা দিন গেছে। বাসায় ফিরে যেতে ইচ্ছা হলো ওর। গিয়ে নিজের হাতে ডিনার বানাবে। কিন্তু চাইলেই কি আর হয়?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে রিসিভার তুলে ওয়ালান্ডার। অস্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই, বলল আনমনে। ক্রুশ পোড়ানো ঠেকাতে হলে তথ্যটা অস্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই।

ছয়

রাতারাতি ঝড় এসে হানা দিল স্কেওনায়। নিজের ফ্ল্যাটে বসে আছে কার্ট ওয়ালান্ডার। হুইস্কিতে চুমুক দিতে দিতে শুনছে আইডার একটা জার্মান রেকর্ডিং। এমন সময় নেমে এল অন্ধকার। আর নীরবতা। উঠে জানালার কাছে গেল সে। ঘুটঘুটে আঁধার বাইরেও। সাথে বাতাসের গর্জন। কাছে কোথাও দেয়ালের সাথে বাড়ি খাচ্ছে একটা অ্যাডভার্টাইজিং সাইন।

ঘড়িতে বাজে রাত দুইটা পঞ্চাশ। অদ্ভুত হলেও ওর ক্লান্তি যেন উবে গেছে। স্টেশন থেকে ফিরতে ফিরতে মাঝরাত ধরে গিয়েছিল। শেষ ফোনকলটা যে করেছিল, নাম প্রকাশ করেনি। লোকটা প্রস্তাব করে যে পুলিশের উচিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলোর সাথে একাত্ম হয়ে চিরতরের জন্য বিদেশিদের দেশ থেকে বের করে দেয়া। প্রথমে তার কথাগুলো শুনবার চেষ্টা করেছিল ওয়ালান্ডার। পরমুহূর্তেই ধরাস করে নামিয়ে রাখে রিসিভার। সুইচবোর্ডকে ফোন দিয়ে আদেশ দেয় সব ইনকামিং কল ব্লক করে দিতে। তারপর লাইট নিভিয়ে, নিস্তব্ধ করিডোর পার হয়ে, গাড়ি চালিয়ে সোজা চলে আসে বাসায়। দরজা খুলতে খুলতে সিদ্ধান্ত নেয় তথ্য ফাঁসকারীকে খুঁজে বের করবার। কাজটা অবশ্য ওর না। পুলিশ বাহিনীর মধ্যে যদি কোন ঝামেলা হয়, সামাল দেয়ার দায়িত্ব চীফ অফ পুলিসের। দিন কয়েকের মধ্যে ছুটি কাটিয়ে ফিরবে বিয়র্ক। সে এসে বাকিটা দেখবে। সত্যটা প্রকাশ পাবেই।

কিন্তু পেটে হুইস্কি পড়তেই ওয়ালান্ডারের মনে হলো, কিছুই করবে না বিয়র্ক। যদিও প্রত্যেক পুলিশ অফিসার মুখ বন্ধ রাখতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তবুও একজন অফিসার যদি সুইডিশ টেলিভিশনে ফোন করে কোন তথ্য ফাঁস করে দেয়, অপরাধ হিসেবে অতটা মারাত্মক বলে গণ্য হবে না। আবার সুইডিশ টেলিভিশন এর পেছনে টাকা ঢেলেছে কিনা তা প্রমাণ করা কষ্টসাধ্য। তাছাড়া, এরকম একটা খুনের তদন্তের মাঝখানে পুলিশ বাহিনীর সততা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে, এমন কিছুই করবে না বিয়র্ক।

প্রথম গ্লাস শেষ করে যখন দ্বিতীয় গ্লাস ধরল, ফের একই চিন্তা খেলে গেল ওয়ালান্ডারের মাথায়। কে করলো কাজটা? রিডবার্গের নাম বাদ দেয়া যায়। কিন্তু অতটা নিশ্চিতই বা কীভাবে হওয়া সম্ভব? অন্যদের চেয়ে তাকে কতটুকু বেশি চেনে সে?

ঝড়ের কারণে বিচ্ছিন্ন বৈদ্যুতিক সংযোগ। অন্ধকারে বসে রইল ওয়ালান্ডার। মাথায় হাজারো চিন্তা। খুন হয়ে যাওয়া দম্পতি। লার্স হার্ডিন। ফাঁসের অদ্ভুত গিঁট। স্টেন ওয়াইডেন। মোনা। লিন্ডা। ওর বাবা। যতই গুছিয়ে আনার চেষ্টা করে, এলোমেলো হয়ে যায় সব। আঁধারের মধ্যে থেকে কে যেন বিদ্রুপ করে হাসে।

ঘুম ভেঙ্গে গেল ঘড়ি দেখল ওয়ালান্ডার। মাত্র এক ঘন্টা ঘুমিয়েছে। কারেন্ট চলে এসেছে এরমাঝে। বেজে চলেছে রেকর্ডিং। এক চুমুকে গ্লাসের বাকি হুইস্কি শেষ করে ফেলল সে।

মোনার সাথে কথা বলা দরকার, ভাবল খাটের দিকে যেতে যেতে। এতকিছুর পরও কথা বলতে হবে। কথা বলতে হবে আমার মেয়ের সাথে। দেখতে যেতে হবে বাবাকে। কোন একটা ব্যবস্থা করতে হবে তার। সবকিছুর ওপরে ধরতে হবে খুনিদের...

ঘুমিয়ে পড়ল সে আবারও। টেলিফোনের শব্দ শুনে ভাবল এখন অফিসে আছে। ঘুম ঘুম চোখে তুলে নিল রিসিভার। কে ফোন করল এই সময়ে? মনে মনে প্রার্থনা করল যেন মোনা হয়। কিন্তু আশাভঙ্গ হলো ওপ্রান্ত থেকে ভেসে আসা কণ্ঠ শুনে।

স্টেন ওয়াইডেন কল করেছে বলে মনে হয়েছিল ওর প্রথমে।

"তিন দিন সময় দিলাম আপনাকে," বলল লোকটা।

"মানে?" জিজ্ঞেস করল ওয়ালান্ডার। "কে বলছেন?"

"আমার পরিচয় না জানলেও চলবে," জবাব দিল লোকটা।

"অপরিচিত কারও সাথে কথা বলার কোন আগ্রহই আমার নেই," বলল ওয়ালান্ডার। "পুরোপুরি সজাগ এখন।"

"এখনই রেখে দিবেন না," বলল লোকটা। "তিন দিন সময় দেয়া হলো আপনাকে। মনে রাখবেন, তিন দিন...এর বেশি না। এর মধ্যে বিদেশি খুনিদের ধরতে হবে। না পারলে আমরা দেখে নিব বাকিটা।"

"কী বলতে চাইছেন আপনি? কারা আপনারা?"

"তিন দিন। নাহয় আগুন জ্বলবে।"

কেটে গেল কল।

নিচে রান্নাঘরে নেমে এল ওয়ালান্ডার। চেয়ারে বসে একটু আগের ফোনালাপ লিখে নিতে লাগল একটা নোটবুকে। আগে শপিং লিস্ট লেখার জন্য নোটবুকটা ব্যবহার করত মোনা। প্যাডের উপরের দিকে লেখা *পাউরুটি*। তার নিচের লেখাটা ঠাহর করতে পারল না ওয়ালান্ডার।

হুমকির ঘটনা আজই প্রথম না। বছর কয়েক আগে, নিজেকে নির্দোষ ও অবিচারের শিকার দাবি করা এক লোক চিঠি আর রাতের বেলা ফোন দিয়ে উত্ত্যক্ত করত ওয়ালান্ডারকে। প্রথম দিকে পাত্তা দিত না সে। শেষ পর্যন্ত মোনাই ওকে বাধ্য করে কিছু একটা করতে। সুইয়েডবারকে লোকটার কাছে পাঠিয়েছিল ওয়ালান্ডার। সতর্ক করে জানিয়ে দিয়েছিল যে তার কর্মকান্ডে সাজার মেয়াদ বাড়বে বৈ কমবে না। আরেকবার ফুটো করে দেয়া হয়েছিল ওয়ালান্ডারের গাড়ির চাকা।

কিন্তু একটু আগে আসা ফোনটা একদমই আলাদা। *আগুন জ্বলবে* বলে কী বোঝালো লোকটা? কী পোড়ানো হবে? শরণার্থী শিবির? নাকি বিদেশিদের মালিকানাধীন কিছু?

তিন দিন- বাহাত্তর ঘন্টা। তারমানে শুক্রবার বা শনিবার হলো গিয়ে শেষ সময়।

খাটে গিয়ে শুয়ে পড়ল ওয়ালান্ডার। সোঁ সোঁ শব্দে বাতাস বইছে বাইরে। ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছে জানালার কাঁচে। ঘুমানোর চেষ্টা করল সে। কিন্তু পারল না। যদি আবার ফোন করে লোকটা?

সকাল ছয়টা ত্রিশের দিকে স্টেশনে চলে এল সে। ডিউটি অফিসারের সাথে কথা বলে জেনে নিল সর্বশেষ পরিস্থিতি। একটা আর্টিকুলেটেড লরি উল্টে গেছে ইস্তার বাইরে। স্কারবিতে খুলে পড়ে গেছে কিছু স্ক্যাফোল্ডিং। এছাড়া মারাত্মক কিছু ঘটেনি। ঝড়ো রাতটা মোটামুটি নিরুপদ্রবে কেটেছে শুনে স্বস্তির নি:শ্বাস ফেলল সে। কফি নিয়ে চলে এল নিজের অফিসে।

ড্রয়ারে রাখা একটা পুরনো ইলেক্ট্রিক শেভার দিয়ে থুতনির দাঁড়িটুকু কামিয়ে নিল ওয়ালান্ডার। তারপর চোখ বুলাতে লাগল পত্রিকায়। এবং যতই দেখতে লাগলো, বিরক্ত হলো ততই। গতকাল রাতে টেলিফোনে একাধিক সাংবাদিকের কাছে জানিয়েছে যে পুলিশ নির্দিষ্ট করে বিদেশিদের অপরাধী ভাবছে না। তা সত্ত্বেও আজকের খবরের কাগজে তার প্রতিফলন ঘটেনি। সত্যটা যেন তাদের মনোপুত হয়নি।

তদন্ত সম্পর্কে বিস্তারিত জানানোর জন্য বিকেলবেলা আবারও প্রেস কনফারেন্স ডাকার সিদ্ধান্ত নিল সে। সেই সাথে গতকাল রাতে আসা হুমকির কথাও উপস্থাপন করবে।

ডেস্কের পেছনের তাক থেকে একটা ফোল্ডার নামিয়ে নিল ওয়ালান্ডার। ইস্তার বৃহৎ ক্যাম্পটা ছাড়াও জেলার নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা শরণার্থী শিবিরের তালিকা করা আছে ওতে। কিন্তু এমন কোন প্রমাণ তো নেই যে হুমকিটা দেয়া

হয়েছে শরণার্থী শিবিরকে উদ্দেশ্য করেই। রেঁস্তোরা বা বাড়িও তো হতে পারে এই হুমকির শিকার।

তবে একটা বিষয়ে নিশ্চিত সে-হুমকিটা হেলাফেলার নয়। বিগত বছরগুলোতে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে, যা থেকে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে হুমকি দেয়া এই লোকগুলো একটা সংঘবদ্ধ গোষ্ঠী। এবং সুইডেনে বসবাসকারী বিদেশি কিংবা শরণার্থীদের তাড়াতে প্রকাশ্যে হামলা চালাতে দ্বিধাবোধ করবে না এরা।

ঘড়ি দেখল ওয়ালান্ডার। সাতটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিট। ফোন দিল রিডবার্গের বাসায়। কিন্তু রিসিভ করল না কেউ। দশ বারের পর হাল ছেড়ে দিল সে।

দরজায় উপস্থিত হলো মার্টিনসন। "হ্যালো, আজকের মিটিং কয়টায়?"

"দশটায়," জবাব দিল ওয়ালান্ডার।

"বাজে আবহাওয়া, তাই না?"

"তুষার না পড়লেই হলো। বাতাসে আমার সমস্যা নেই।"

রিডবার্গের জন্য অপেক্ষা করার ফাঁকে স্টেন ওয়াইডেনের দেয়া নোটটা খুঁজল ওয়ালান্ডার। হার্ডিনের মুখ থেকে যা শুনেছে, তাতে রাতের বেলা ঘোড়াকে খড় দেয়া অতটা অস্বাভাবিক ঠেকছে না এখন। খুনিরা যদি ইয়োহানেস আর মারিয়ার নিকটাত্মীয় বা পারিবারিক কেউ হয়, তাহলে ঘোড়াটার কথা তাদের জানার কথা। হয়ত এটাও জানতো যে রাতের বেলা আস্তাবলে যাওয়ার অভ্যাস আছে ইয়োহানেস লভগ্রেনের।

ওয়াইডেন বাড়তি কিছু জানাতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে ওয়ালান্ডারের। তবুও পূর্বের কথা মোতাবেক ফোন দিল। আসল কারণ হয়ত সাবেক বন্ধুকে হারাতে চায় না সে। এক মিনিট পরেও কেউ রিসিভ করল না। পরে আবারও কল দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল সে।

রিডবার্গ পৌছানোর পূর্বে আরও একটা কল করতে হবে তাকে। নম্বরে ডায়াল করে অপেক্ষা করতে লাগল সে।

"পাবলিক প্রোসিকিউটরের অফিস," ভেসে এল মোলায়েম এক নারী কণ্ঠ।

"কার্ট ওয়ালান্ডার বলছি। আকিসন আছেন?"

"ছুটিতে গেছেন। ভুলে গেলেন এরমাঝে?"

আসলেই ভুলে গিয়েছিল ওয়ালান্ডার। কী একটা কোর্স করতে ছুটি নিয়েছেন পাবলিক প্রোসিকিউটর পার আকিসন। নভেম্বরের শেষ দিকে একসাথে ডিনার করেছিল ওরা।

"চাইলে উনার ডেপুটির সাথে কথা বলতে পারেন," বলল রিসিপশনিস্ট। "দিব কানেকশন?"

"ঠিক আছে," উপায় না দেখে রাজি হলো ওয়ালান্ডার। এবং বিস্মিত হলো আরেকটা নারী কণ্ঠ শুনতে পেয়ে।

"অ্যানেট ব্রোলিন।"

"আমি প্রোসিকিউটরের সাথে কথা বলতে চাই," জানালো ওয়ালান্ডার।

"বলুন কী বলতে চান," বলল ওপ্রান্ত থেকে।

প্রথমে নিজের পরিচয় দিল ওয়ালান্ডার। তারপর বলতে লাগল, "লুনাপের জোড়া খুন নিয়ে কথা বলার জন্য ফোন দিয়েছি। মনে হলো, এবার পাবলিক প্রোসিকিউটর অফিসকে একটা রিপোর্ট দেয়া দরকার। ভুলেই গিয়েছিলাম যে পার ছুটিতে আছে।"

"আপনি আজ সকালে ফোন না করলে আমিই করতাম।"

মহিলার কণ্ঠে ভৎর্সনার আভাস পেল যেন ওয়ালান্ডার। শালী, বলল মনে মনে। আমাকে শেখাতে এসেছিস প্রোসিকিটর অফিসের সাথে পুলিশের কেমন ব্যবহার করা উচিত?

"আসলে বেশি কিছু জানানোর নেই," বলল সে। বলার পর টের পেল, একটু কড়া সুরেই বলেছে কথাটা।

"কাউকে গ্রেফতার করার সম্ভাবনা আছে?"

"না। আপনাকে বিস্তারিত জানিয়ে রাখতে চাইছিলাম আরকি।"

"ঠিক আছে," বলল মহিলা। "সোয়া দশটার দিকে তো আমার একটা ওয়ারেন্ট আবেদনের শুনানি আছে। এগারোটায় চলে আসুন আমার অফিসে।"

"একটু দেরি হতে পারে। দশটার দিকে আমার কেস মিটিং আছে। কতক্ষণ চলবে বলা যাচ্ছে না।"

"চেষ্টা করবেন এগারোটার মধ্যে চলে আসতে।"

কল কেটে দিল মহিলা। ওয়ালান্ডার বসে রইল রিসিভার ধরে।

পুলিশ আর প্রোসিকিউটর অফিসের মাঝে সৌহার্দ্য বজায় রাখা সহজ কাজ নয়। তবে পার আকিসনের সাথে চমৎকার একটা সম্পর্ক থাকায় এতকাল সমস্যায় পড়তে হয়নি ওয়ালান্ডারকে। নিয়মিত যোগাযোগ রাখে ওরা। পরস্পর থেকে উপদেশ নিতে কুণ্ঠাবোধ করে না।

"ধুস," চেঁচিয়ে উঠল সে। "কোথা থেকে এসে জুড়ে বসল এই অ্যানেট ব্রোলিন?"

এমন সময় শুনতে পেল করিডোর দিয়ে রিডবার্গের খুঁড়িয়ে আসার পদশব্দ। দরজার বাড়িয়ে মাথা গলিয়ে ভেতরে আসতে বলল তাকে।

রিডবার্গের পরনে পুরনো উলের জ্যাকেট আর বেরেট। বসতে গিয়ে যন্ত্রণায় মুখ বাঁকালো সে।

"আবার সমস্যা করছে নাকি?" পায়ের দিকে ইঙ্গিত করে জিজ্ঞেস করল ওয়ালান্ডার।

"বৃষ্টি বা তুষার মানা যায়," বলল রিডবার্গ। "বা ঠান্ডা। কিন্তু এই মরার পা কিছুতেই বাতাস সইতে পারে না। যাই হোক, কেন ডেকেছ?"

গতকাল রাতে আসা ফোনটার কথা জানালো ওয়ালান্ডার।

"তোমার কী মনে হয়? জিজ্ঞেস করল বলা শেষে। পাত্তা দেয়া উচিত?"

"অবশ্যই। গুরুত্ব না দেয়াটা ভুল হবে।"

"ভাবছি প্রেস কনফারেন্স ডাকব বিকালে। তদন্তের বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরব। সেই সাথে জানাব লার্স হার্ডিনের বলা কথাগুলো। তবে অবশ্যই তার নাম না উল্লেখ করে। তারপর বলব এই হুমকির কথা। সাফ বলে দিব যে অপরাধীদের বিদেশি হওয়া নিয়ে যেসব গুজব ছড়িয়ে, তা ভিত্তিহীন।"

"যদিও তা সত্য না," বলল রিডবার্গ।

"মানে?"

"মারিয়া লভগ্রেনের কথাটা ভুলে যেও না। তাছাড়া, ফাঁসের গিঁটটা আর্জেন্টাইন।"

"তদন্ত বলছে খুনিরা হয়ত লভগ্রেনদের চিনতো। এদিকে তুমি বলছ বিদেশি কারও জড়িত থাকার সম্ভাবনা। কোনটা ঠিক?"

"জানি না। এখনও অনুমান করার সময় হয়নি।"

"পুলিশের কাজ অনুমানের ওপর নির্ভর করে। অনুমান কর। তারপর প্রমাণ না পেলে বাতিল করে দাও, কিংবা ওটার ওপর ভিত্তি করে সামনে এগিয়ে যাও।"

আহত পা-টা নাড়াতে গিয়ে গুঙিয়ে উঠল রিডবার্গ।

"তথ্য ফাঁস হওয়ার ব্যাপারে কী করবে?" জিজ্ঞেস করল সে।

"মিটিং এ বারোটা বাজিয়ে ছাড়ব ভাবছি," জবাব দিল ওয়ালান্ডার। "বাকিটা বিয়র্ক এসে দেখবে।"

"সে কী করবে বলে তোমার মনে হয়?"

"কিছুই না।"

"ঠিক তাই।"

আলিঙ্গনের ভঙ্গিতে দুই পাশে হাত ছড়িয়ে দিল ওয়ালান্ডার।

"বিয়র্ককে আমাদের চেয়ে ভালো কে চেনে? যাই হোক, তথ্য পাচারের জন্য সুইডিশ টেলিভিশন পুলিশদের কত করে দেয় বলে তোমার মনে হয়?"

"অনেক," জবাব দিল রিডবার্গ। "একারণেই ভালো অনুষ্ঠান বানানোর জন্য টাকা থাকে না তাদের কাছে।"

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে।

"একটা কথা ভুলে যেও না," বলল দরজায় দাঁড়িয়ে। "অর্থের আকর্ষণ এড়ানো প্রায় অসম্ভব।"

"মানে কী?"

"যে একবার ক্রোনার খেয়েছে, সে আবারও খেতে পারে। হয়ত প্রমাণ করেই ছাড়বে যে তদন্তের একটা সূত্র বিদেশিদের প্রতি ইঙ্গিত করে।"

"এটা কোন সূত্রই না," বলল ওয়ালান্ডার। "মৃতপ্রায় এক বৃদ্ধার প্রলাপ মাত্র।"

শ্রাগ করল রিডবার্গ।

"তুমি যেমনটা বুঝো। পরে দেখা হবে তাহলে।"

ওয়ালান্ডার ভেবেছিল, প্রথমে তথ্য ফাঁস আর এর পরিণামের ওপর আলোকপাতের মাধ্যনে শুরু করবে কেস মিটিং। তারপর ফোনে আসা হুমকির কথা জানিয়ে আলোচনা করবে কিভাবে ডেডলাইনের মধ্যে খুনিদের ধরা যায়। কিন্তু যখন সে রাগান্বিত হয়ে বলল যে তাদেরই মধ্যে কেউ একজন ঘুষ খেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ফাঁস করেছে, সমস্বরে প্রতিবাদ করল সবাই। কয়েকজন অফিসার বলল, "তথ্য পাচারের পেছনে হাসপাতালের কারো হাতও তো থাকতে পারে। বৃদ্ধা যখন শেষশয়নে বিড়বিড় করে কথাটা বলেছিলেন, তখন কি ডাক্তার আর নার্স উপস্থিত ছিল না?

যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেও সুবিধা করে উঠতে পারল না ওয়ালান্ডার। শেষ পর্যন্ত যখন আলোচনার মোড় ঘুরাতে সক্ষম হলো, থমথমে একটা পরিবেশ নেমে এসেছে ততক্ষণে। চাপা পড়েছে গেছে গতকালকের উদ্দীপনা।

লরি চালক যে গাড়িটার কথা বলেছিল, তার হদিস পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে খোঁজ নিতে বাড়তি আরেকজনকে নিয়োজিত করা হলো।

তদন্ত চলমান লার্স হার্ডিনের ওপর। প্রাথমিক অবস্থায় কিছুই পাওয়া যায়নি। পুলিশের রেকর্ডে তার নাম নেই। সন্দেহজনক দিহার সাথেও সংশ্লিষ্ট করা যায়নি।

"এই লোকটার ওপর পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করতে হবে," বলল ওয়ালান্ডার। "জানতে হবে তার অতীত-বর্তমান। আমি প্রোসিকিউটরের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি কিছুক্ষণের মধ্যে। ব্যাংক যাতে লভগ্রেনের আর্থিক তথ্যাদি দিয়ে আমাদের সহায়তা করে, তার অনুমতি চাইব।"

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবরটা দিল পিটারস।

"দুইটা সেফ-ডিপোজিট বক্সআছেলভগ্রেনের," জানালো সে। "একটা ইউনিয়ন ব্যাংকে, আরেকটা মার্চেন্টস ব্যাংকে। আমার কাছে তার চাবির রিং আছে।"

"অসাধারণ,"বলল ওয়ালান্ডার। "পরে পরীক্ষা করে দেখব ওগুলো।"

লভগ্রেনদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের তালিকা বানানো চলছে এখনও। কানাডায় বসবাসরত তাদের এক মেয়ে আজ দুপুর তিনটার দিকে এসে পৌছাবে মালমোর হোভারক্রাফট টার্মিনালে। সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, ওই দিকটা রিডবার্গ সামলাবে।

"অন্য মেয়ের খবর কী?" জানতে চাইল ওয়ালান্ডার। "হ্যান্ডবল খেলেন যিনি?"

"চলে এসেছেন এরিমধ্যে," বলল সুইয়েডবার। "আত্মীয়ের বাসায় উঠেছেন।"

"গিয়ে কথা বল তার সাথে," বলল ওয়ালান্ডার। "এছাড়া আর কোন খবর? ও, লভগ্রেনদের মেয়েদের জিজ্ঞেস করতে ভুলবে না যে তাদের কোন দেয়ালঘড়ি দেয়া হয়েছিল কিনা।"

নামে-বেনামে যত তথ্য এসেছে ফোন-ইমেইলের মাধ্যমে, যাচাই করে দেখেছে মার্টিনসন। যা যা জানতে পেরেছে, সব লিপিবদ্ধ করেছে কম্পিউটারে। তারপর বাছাই করেছে গুরুত্ব অনুযায়ি। এসেছে কিছু হাস্যকর মেসেজও।

"ভ্যালবি থেকে ফোন করেছিলেন হুলডা ইংভেসন," বলল সে। "তার মতে, এসব খোদার অসন্তুষ্টির ফসল।"

"এটা তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে," বলল রিডবার্গ। "একটা বাছুর পালালেও দেখবে ফোন দিয়ে বলছে খোদা অসন্তুষ্ট।"

"আমি উনাকে পাছা তালিকায় রেখেছি," বলল মার্টিনসন।

শুনে প্রথমে কেউ বুঝতে পারল না। যখন মার্টিনসন খোলাসা করল যে পা.ছা. হলো পাগল আর ছাগলের সংক্ষিপ্ত রুপ, অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সবাই।

প্রাথমিক বাছাইয়ে কাজে লাগতে পারে এমন কিছু পাওয়া যায়নি। তবে প্রত্যেকের পাঠানো মেসেজ পরীক্ষা করে দেখা হবে। এরপর অবশেষে আলোচনায় উঠে এল লভগ্রেনের গোপন সম্পর্ক আর তার অবৈধ সন্তান।

কামরায় চোখ বুলাল ওয়ালান্ডার। চোখ পড়ল কোণায় বসে থাকা ত্রিশ বছর বয়সী থমাস নাসলুন্ডের ওপর। স্বভাবে চুপচাপ হলেও কাজে বেশ পাকা সে।

"তুমি আমার সাথে থাকবে," বলল ওয়ালান্ডার। "তার আগে একটা কাজ কর। হার্ডিনকে ফোন দিয়ে দেখ কৃষানইস্তার ওই মহিলা সম্পর্কে কিছু জানা যায় কিনা। আর তার ছেলে সম্পর্কেও।"

ঠিক হলো, বিকাল চারটায় বসবে প্রেস কনফারেন্স। ততক্ষণে আশা করা যায় কৃষানইস্তা থেকে ফিরে আসবে ওয়ালান্ডার আর নাসলুন্ড। যদিওবা দেরি হয়ে যায়, সামলে নেবে রিডবার্গ।

"আমি প্রেস রিলিজ লিখে দিব," বলল ওয়ালান্ডার। "কারও যদি কিছু বলার না থাকে, এবার তাহলে উঠা যাক।"

পার আকিসনের অফিস পুলিশ বিল্ডিং এর অন্য পাশটায়। ওয়ালান্ডার যখন সেখানে পৌছালো, ঘড়িতে এগারোটা বেজে পঁচিশ মিনিট। দরজা খুলে দিল কমবয়সী, আকর্ষণীয় এক রমণী।

"অবশেষে আসার সময় হলো," ভৎর্সনার সুরে বলল সে। "আধা ঘন্টা দেরি করেছেন।"

"আগেই জানিয়েছি যে দেরি হতে পারে," জবাব দিতে দেরি করল না ওয়ালান্ডার।

ভেতরে ঢুকে ওর চক্ষু চড়কগাছ। রাতারাতি বদলে গেছে অফিসের চেহারাসুরত। পার আকিসনের নির্জীব, ধূসর কামরা প্রাণ পেয়েছে রঙিন পর্দা আর টবে বসানো গাছের কল্যাণে।

ডেস্কের পেছনে গিয়ে বসল রমণী। ওয়ালান্ডারের চোখ অনুসরণ করল তাকে। বয়স ত্রিশের বেশি হবে না মহিলার। গাঢ় বাদামি চুল ছোট করে কাটা। এক থোকা চুল টেনে রাখা হয়েছে এক কানের পিছনে। পরনে বাদামী রঙের স্যুট। দেখেই বোঝা যায়, কাপড় উন্নত মানের ও বেশ দামি।

"বসুন," বলল সে। "আগে বোধহয় হাত মেলানো উচিত ভদ্রতার খাতিরে। আকিসনের অনুপস্থিতিতে আমি তার দায়িত্ব পালন করব। বুঝতেই পারছেন, বেশ কিছুদিন একত্রে কাজ করতে হবে আমাদের।"

হাত মেলাতে গিয়ে মহিলার আঙুলে চোখ পড়ল ওয়ালান্ডারের। অবাক হয়ে টের পেল, হতাশ হয়েছে মহিলাকে বিয়ের আঙটি পরে থাকতে দেখে।

"আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম যে পার ছুটিতে আছে," বলল সে। "যাই হোক, ইস্তায় স্বাগতম। আমি কার্ট।"

"আমাকে অ্যানেট বলে সম্বোধন করতে পারেন।"

"তা কেমন লাগছে ইস্তা?"

অবজ্ঞার ভঙ্গি করল মহিলা। "বুঝতে পারছি না এখনও। তবে স্কেওনার মানুষজন বোধহয় স্টকহোমবাসীর চেয়ে অলস।"

"অলস?"

"আধা ঘন্টা দেরি করেছেন আপনি।"

ভেতরে ভেতরে ফুঁসতে লাগল ওয়ালান্ডার। ইচ্ছা করে কি ওকে রাগাতে চাইছে নাকি এই মহিলা? কেস মিটিং এ সময় লাগতেই পারে। এটা না বোঝার কী আছে?

"মনে হয় না স্কেনিয়ানরা অন্য কারও চেয়ে বেশি অলস," জবাব দিল সে। "সব স্টকহোমবাসীই নিশ্চয় উদ্ধত না, তাই না?"

"মানে?"

"কিছু না।"

চেয়ার হেলান দিয়ে বসল অ্যানেট। "তাহলে কেসটা নিয়ে কথা বলা যাক।"

যতটা সম্ভব গুছিয়ে রিপোর্ট পেশ করার চেষ্টা করল ওয়ালান্ডার। তবে এড়িয়ে গেল তথ্য ফাঁসের ব্যাপারটা। উত্তর দিল অ্যানেটের দুয়েকটা প্রশ্নের। আর মনে মনে তারিফ করল অল্প বয়সেই মহিলার পেশাগত অভিজ্ঞতার পরিচয় পেয়ে।

"লভগ্রেনের ব্যাংক স্টেটমেন্ট দেখা দরকার," বলল সে। "তাছাড়া, তার দুটো সেফ-ডিপোজিট বক্সের খোঁজ পেয়েছি আমরা। সেগুলোও পরীক্ষা করে দেখতে হবে।"

প্রয়োজনীয় অনুমতিপত্র লিখে দিল অ্যানেট।

"বিচারকের সই লাগবে না?" কাগজ গুলোয় চোখ বুলিয়ে জিজ্ঞেস করল ওয়ালান্ডার।

"পরে নিলেও চলবে," বলল অ্যানেট। "আর নিয়মিত জানাবেন তদন্তের অবস্থা।"

মাথা দুলিয়ে উঠে দাঁড়াল ওয়ালান্ডার।

"পত্রিকায় বিদেশিদের দায়ী করে লেখালেখি হচ্ছে দেখলাম," বলল অ্যানেট। "আপনার কী মত?"

"গুজব," জবাব দিল ওয়ালান্ডার। "বোঝেনই তো সব।"

"আসলেই কি গুজব?" অ্যানেটের কণ্ঠে সন্দেহের আভাস।

প্রসিকিউটরের অফিস ছেড়ে বেরিয়ে এল ওয়ালান্ডার। ঠান্ডার মাঝেও ঘামতে শুরু করেছে শার্টের ভেতর। কী অপচয়, বলল মনে মনে। এরকম সুন্দরী এক রমণী প্রোসিকিউটর হয়ে জীবনভর দুর্বৃত্তদের সাথে লড়াই করবে।

স্টেশনের রিসিপশনে এসে থমকে গেল ওর পা। কী করবে ঠিক করে উঠতে পারছে না। আগে পেটপুজো, সিদ্ধান্ত নিল শেষতক। পরে আর খাওয়ার সময় পাব না। খাওয়ার পর না হয় প্রেস রিলিজ লিখব।

স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে আসতেই দমকা বাতাস এসে লাগল ওর গায়ে। ঠিক করল, বাসায় গিয়ে সালাদ বানাবে নিজের জন্য। সারাদিন কিছু না খাওয়া সত্ত্বেও পেট ভরা মনে হচ্ছে। কিন্তু হর্নপাইপারের সামনে এসে উবে গেল সব সংকল্প। আজও খাদ্যাভ্যাস পাল্টানো হবে না।

পৌনে একটার দিকে স্টেশনে ফিরে এল ওয়ালান্ডার। দ্রুত খাওয়ায় আবারও সমস্যা করছে পেটে। তাড়াহুড়ো করে ছুটল টয়লেটের উদ্দেশ্যে ছুটলো। কোনকমে পেট শান্ত করে প্রেস রিলিজ লিখে ফেলল সে। তারপর অফিসের একজন কেরানির হাতে কাগজটা ধরিয়ে দিয়ে চলল নাসলুন্ডের কামরার দিকে।

"হার্ডিনের সাথে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না," বলল নাসলুন্ড। "খবর পেয়েছি ফিলেদালেনে হাইকিং এ গেছে সে।"

"তাহলে ওখানে গিয়ে তাকে খুঁজে বের করতে হবে," বলল ওয়ালান্ডার।

"আমিই পারব। আপনি বরং সেফ-ডিপোজিট বক্সগুলো খুলে দেখুন গিয়ে। সময় বাঁচবে এতে।"

কথাটা মনে ধরল ওয়ালান্ডারের। "ঠিক আছে। আজ সম্ভব না হলে আগামীকাল সকালে কৃষানইস্তায় যাব আমরা।"

ব্যাংকে যাবার পূর্বে স্টেন ওয়াইডেনকে কল দিল একবার। এবারও রিসিভ করল না কেউ। রিসিপশন ডেস্কে চলে এল সে।

"দেখ তো এই নম্বরে কাউকে পাও কিনা," বলল এবাকে। "নম্বরটা ঠিক কিনা তাও দেখ। স্টেন ওয়াইডেন বা কোন রেসিং ঘোড়ার আস্তাবলের নামে রেজিস্টার করা থাকার কথা। আমি ইউনিয়ন ব্যাংকে থাকব। জরুরি কিছু হলে জানাবে।"

একটা বইয়ের দোকানের বিপরীতে গাড়ি পার্ক করল ওয়ালান্ডার। বাতাসের তোড়ে আরেকটু হলেই উড়ে যেত পার্কিং টিকেট। শহরটাকে দেখে মনে হচ্ছে পরিত্যক্ত। বাতাসের কারণে লোকজন দরজায় খিল দিয়েছে।

ইলেকট্রিক্যাল জিনিসপাতির দোকানের সামনে থামল সে। ভাবছে সন্ধ্যার একাকীত্ব কাটাতে একটা ভিডিও কিনবে। কিন্তু দাম দেখে অন্য একটা চিন্তা চাড়া দিল ওর মাথায়। এরচে বরং নতুন একটা স্টেরিও কিনলে কেমন হয়? হাজার হোক, নিদ্রাহীন রজনীগুলোতে সঙ্গীতই ওর একমাত্র সঙ্গী।

পরমুহূর্তেই বিদায় করল সব চিন্তা। এগিয়ে চলল একটা চাইনিজ রেঁস্তোরার সামনে দিয়ে চলে যাওয়া ফুটপাত ধরে। একটু আগাতেই ডানপাশে ইউনিয়ন ব্যাংক। কাঁচের দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করল সে। একজন কৃষককে দেখতে পেল সুদের চড়া হার নিয়ে অভিযোগ করতে। এছাড়া দ্বিতীয় কোন কাস্টোমার নেই। বামপাশের অফিসের দরজা খোলা। ভেতরে কম্পিউটারের স্ক্রিনে মুখ ডুবিয়ে রেখেছে এক লোক। ওয়ালান্ডার দোরগোড়ায় পৌছাতেই ঝট করে মাথা তুলল লোকটা। চোর-ডাকাত দেখবে ভেবেছিল বোধ হয়। ভেতরে ঢুকে নিজের পরিচয় দিল ওয়ালান্ডার।

"বিষয়টা অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে আমাদের," বলল লোকটা। "এত বছর ধরে আছি এখানে। কখনও পুলিশি ঝামেলায় পড়তে হয়নি।"

তার হাবভাব দেখে বিরক্ত না হয়ে পারল না ওয়ালান্ডার।

"কিছু করার নেই," বলে বাড়িয়ে দিল অ্যানেট ব্রোলিনের দেয়া কাগজপত্র। মনযোগ দিয়ে সেগুলো পড়তে লাগল লোকটা।

"এসবের কি আদৌ দরকার আছে?" জিজ্ঞেস করল পড়া শেষে। "মানুষ সেফ-ডিপোজিট বক্স ব্যবহার করে গোপনীয়তার স্বার্থে। গোপনই যদি না থাকল, তাহলে কেন ব্যবহার করবে?"

"হ্যাঁ, দরকার আছে," জবাব দিল ওয়ালান্ডার। "আর আপনার সাথে প্যাঁচাল পারার সময় আমার নেই।"

অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা। তবে তার আচরণই বলে দিচ্ছে যে এই পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিল। একটা জনশূন্য করিডোর পেরিয়ে সেফ-ডিপোজিট ভল্টে ঢুকল তারা। এক কোণার নিচের দিকে ছিল লভগ্রেনের বক্স। তালা খুলে ড্রয়ার টেনে বের করল ওয়ালান্ডার। রাখল টেবিলের ওপরে। তারপর ঢাকনা তুলে হাতড়াতে লাগল ভেতরের জিনিসপত্র। বেশিরভাগই দলিলাদি। দাফন সংক্রান্ত অছিয়তনামা আর লুনাপের খামারের আইনি চুক্তিপত্র। কিছু পুরনো ছবিও আছে। আর আছে মলিন একটা খাম।

নাহ, হতাশ হলো ওয়ালান্ডার। তেমন কিছুই পেলাম না।

একপাশে দাঁড়িয়ে নজর রাখছে লোকটা। চুক্তিপত্রের নম্বর আর অছিয়তনামায় উল্লেখিত নামগুলো লিখে নিল ওয়ালান্ডার। তারপর নামিয়ে দিল বক্সের ঢাকনা।

"আর কিছু?"

"লভগ্রেনের অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত সকল তথ্য লাগবে আমার," বলল ওয়ালান্ডার।

ভল্ট ছেড়ে বেরিয়ে যাবে, এমন সময় একটা ভাবনা খেলে গেল ওর মাথায়। "লভগ্রেন ছাড়া আর কারও কি এই সেফ-ডিপোজিট বক্স খোলার অনুমতি আছে?"

"না," জবাব দিল ব্যাংক কর্মকর্তা।

"সম্প্রতি কি এই বক্স খুলেছিলেন তিনি?"

"না। শেষবার খোলার পর বহু বছর পার হয়ে গেছে। রেজিস্টার দেখেছি আমি।"

ওরা যখন লবিতে ফিরে এল, তখনও অভিযোগ করেই যাচ্ছে কৃষকটি। চেঁচাচ্ছে শস্যের পড়তি দাম নিয়ে।

ব্যাংক কর্মকর্তার অফিসে চলে এল ওরা। ওয়ালান্ডারের হাতে দুই পাতা কাগজ ধরিয়ে দিল ব্যাংক কর্মকর্তা। চেয়ারে বসে কাগজে চোখ বুলাতে লাগল ওয়ালান্ডার। চারটা অ্যাকাউন্ট আছে ইয়োহানেস লভগ্রেনের নামে। এর মধ্যে দুটো আবার মারিয়া লভগ্রেনের সাথে যৌথভাবে করা। এই দুটো অ্যাকাউন্টে মোট জমা আছে নব্বই হাজার ক্রোনার। অনেক দিন যাবত হাত দেয়া হয়নি এগুলোতে। কিছুদিন আগে সুদ জমা হয়েছে অ্যাকাউন্ট গুলোতে। তৃতীয় অ্যাকাউন্টে আছে মোটে ১৩২ ক্রোনার আর ৯৭ ওর।

তবে চমকপ্রদ হলো চতুর্থ অ্যাকাউন্টের সংখ্যাটা। প্রায় দশ লক্ষ ক্রোনার জমা আছে এতে। জানুয়ারির এক তারিখে নব্বই হাজারের মতো সুদ দেয়া হয়েছে। জানুয়ারির চার তারিখে সাতাশ হাজার ক্রোনার তুলে নিয়েছিল লভগ্রেন। ডেস্কের অপর পাশে বসে থাকা কর্মকর্তার দিকে তাকাল ওয়ালান্ডার।

"এই অ্যাকাউন্টের যাবতীয় লেনদেনের হিসাব চাই," বলল সে।

"দশ বছর পূর্ব পর্যন্ত দেয়া যাবে। তবে সময় লাগবে।"

"গত বছর থেকে শুরু করুন। ১৯৮৯ সালের সকল হিসাব বের করুন আগে।"

রুম ছেড়ে বেরিয়ে গেল লোকটা। দ্বিতীয় কাগজটায় চোখ বুলালো ওয়ালান্ডার। তাতে লেখা তথ্য অনুযায়ি, এই ব্যাংকের অধীনে বিভিন্ন মিউচুয়াল ফান্ডে প্রায় সাত লক্ষ ক্রোনার আছে ইয়োহানেস লভগ্রেনের।

হার্ডিন দেখি মিথ্যা বলেনি, ভাবল ওয়ালান্ডার।

নিসটর্মের কথা মনে পড়ল ওর। এতকাল পাশাপাশি থেকেও প্রতিবেশীর আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে কিছুই টের পায়নি বুড়ো।

মিনিট পাঁচেক পর লবি থেকে ফিরে এল ব্যাংক কর্মকর্তা। আরেকটা কাগজ বাড়িয়ে দিল ওয়ালান্ডারের উদ্দেশ্যে। ১৯৮৯ এ তিনবারে মোট আটাত্তর হাজার

ক্রোনার তুলেছিল লভগ্রেন। উত্তোলন গুলো করা হয়েছিল জানুয়ারি, জুলাই আর সেপ্টেম্বরে।

"আমি কি এই কাগজগুলো রাখতে পারি?" জিজ্ঞেস করল ওয়ালান্ডার।

মাথা দুলিয়ে সায় জানালো লোকটা।

"শেষবার যে ক্লার্ক ইয়োহানেস লভগ্রেনকে টাকা দিয়েছিল, সে কি আছে?"

"জি, ব্রিটা লেনা বোডেন ওর নাম।"

"আমি তার সাথে কথা বলতে চাই।"

কম বয়সী এক তরুণী ঢুকল অফিসে।

"ওকে সবকিছু জানিয়েছি আমি," বলল ব্যাঙ্ক কর্মকর্তা।

মাথা দুলিয়ে নিজের পরিচয় দিল ওয়ালান্ডার। "আপনার যা যা মনে আছে, বলুন।"

"ক্রোনারের পরিমাণটা বড় ছিল," বলল তরুণী। "নাহলে মনে থাকতো না হয়ত।"

"লভগ্রেনের মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু দেখেছিলেন? উদ্বিগ্ন ভাবভঙ্গি বা এরকম কিছু?"

"তেমন কিছু তো মনে পড়ছে না।"

"কত ক্রোনারের নোট চেয়েছিলেন তিনি?"

"হাজারের নোটে দিতে বলেছিলেন।"

"শুধুই হাজার?"

"কয়েকটা পাঁচশো ক্রোনারের নোটও নিয়েছিলেন।"

"ক্রোনার রাখার জন্য সাথে কিছু এনেছিলেন?"

উত্তর দিতে দেরি করল না তরুণী।

"একটা বাদামি ব্রিফকেস। আদ্যিকালের ব্রিফকেসগুলোর মতো। কাঁধে ঝুলানোর বেল্ট আছে।"

"দেখলে চিনতে পারবেন?"

"হয়ত। বেল্টের চামড়া ছেঁড়া ছিল।"

চমৎকৃত হলো ওয়ালান্ডার তরুণীর স্মৃতিশক্তি দেখে। "আর কিছু মনে করতে পারছেন?"

"নাহ। ক্রোনার নিয়ে চলে যান তিনি।"

"একা ছিলেন?"

"জি।"

"বাইরে তার জন্য অপেক্ষা করছে এমন কাউকে দেখতে পেয়েছিলেন?"

"যে কাউন্টারে বসে ছিলাম, সেখান থেকে বাইরে দেখা যায় না।"

"সময়টা খেয়াল আছে?"

জবাব দেয়ার আগে ভাবল তরুণী। "উনাকে ক্রোনার দিয়েই আমি দুপুরের খাবার খেতে গিয়েছিলাম। তখন মধ্য দুপুর।"

"ধন্যবাদ আপনার সাহায্যের জন্য। পরে কিছু মনে পড়লে জানাতে দ্বিধা করবেন না।"

লবিতে চলে এল ওয়ালান্ডার। চোখ বুলালো চারপাশে। মিথ্যা বলেনি তরুণী। কাউন্টার গুলো থেকে বাইরে পর্যন্ত দৃষ্টি যায় না।

একটু আগে চেঁচামেচি করছিল যে কৃষক, চলে গেছে সে। এসেছে নতুন কাস্টোমার। বিদেশি ভাষায় কী যেন বলছে কাউন্টারে বসে থাকা ক্লার্ককে।

বেরিয়ে এল ওয়ালান্ডার। পরের গন্তব্য মার্চেন্টস ব্যাংক। জায়গাটা কাছেই, হ্যামনগতায়।

ইউনিয়ন ব্যাংকের লোকটার মতো বৈরিভাব দেখাল না মার্চেন্টস ব্যাংকের কর্মকর্তা। বিনাবাক্য ব্যয়ে ওয়ালান্ডারকে নিয়ে এল ভল্টে। স্টিলের ড্রয়ার খোলামাত্রই আশাহত হলো ওয়ালান্ডার। কিছুই নেই বক্সে। এই বক্সও ইয়োহানেস লভগ্রেন ছাড়া আর কারও পক্ষে খোলা সম্ভব ছিল না। ১৯৬২ সালে বক্সটা ভাড়া নিয়েছিলেন তিনি।

"শেষ কবে এসেছিলেন তিনি?" জিজ্ঞেস করল ওয়ালান্ডার।

"জানুয়ারি মাসের চার তারিখে," রেজিস্টার দেখে জানালো ব্যাংক কর্মকর্তা। "দুপুর একটা পনেরো মিনিটে। বিশ মিনিট অবস্থান করেছিলেন তিনি।"

এরপর ব্যাংকের সব কর্মীদের সাথে কথা বলল ওয়ালান্ডার। কিন্তু কেউই মনে করতে পারল না সেদিন ব্যাংক থেকে বেরিয়ে যাবার সময় লভগ্রেনের সাথে কিছু ছিল কিনা। ইউনিয়ন ব্যাংকের ওই তরুণীর মতো একজন কর্মী রাখা উচিত সব ব্যাংকের, মনে মনে বলল সে।

বাতাসের গতিবেগ যেন কমবেই না। ব্যাংক থেকে ফ্রিডলফ ক্যাফেতে চলে এল সে। অর্ডার দিল এক কাপ কফি আর একটা সিনামন বানের।

দুপুর বারোটা আর ১.১৫ এর মাঝখানের সময়টায় লভগ্রেন কী করছিলেন, জানতে পারলে ভালো হত, ভাবল ওয়ালান্ডার। কোথায় ছিলেন তিনি ব্যাংক দুটোতে যাওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে? ইস্তায় বা ফিরে গেলেন কিভাবে? তার তো কোন গাড়ি নেই।

নোটবুক বের করে আনল ওয়ালান্ডার। হাত দিয়ে টেবিল থেকে ঝেড়ে ফেলল খাবারের গুড়ো। তারপর লিখতে শুরু করল নোটবুকে। বেশ কিছু প্রশ্ন জমেছে। উত্তর জানা দরকার শীঘ্রই।

আধা ঘন্টা পর ক্যাফে ছেড়ে বেরিয়ে এল সে। ফিরবার পথে থামল একটা কাপড়ের দোকানে। কিনলো এক জোড়া মোজা। চড়া দাম দেখে চোখ কপালে উঠবার জোগাড় হলেও কিছু করার ছিল না। আগে মোনাই ওর কাপড়চোপড়ের ব্যবস্থা করত। শেষ কবে নিজে এক জোড়া মোজা কিনেছে, মনেই করতে পারল না।

গাড়িতে ফিরে দেখে উইন্ডস্ক্রিন ওয়াইপারের নিচে একটা পার্কিং টিকেট আটকানো। যদি জরিমানা পরিশোধ না করি, তাহলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে আমার বিরুদ্ধে, জানে সে। তারপর আদালতে মুখোমুখি হতে হবে পাবলিক প্রোসিকিউটর ব্রোলিনের।

টিকেটটা গ্লোভ কম্পার্টমেন্টে রেখে দিল ওয়ালান্ডার। মনে মনে ভাবছে অ্যানেট ব্রোলিনের কথা। এখনও চোখে ভাসছে তার অপরূপ মুখখানা।

তিনটার দিকে ফোন দিল নাসলুন্ড। ততক্ষণে কৃষানইস্তায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল করেছে ওয়ালান্ডার।

"হার্ডিনকে খুঁজতে খুঁজতে জান বেরোবার জোগাড়," বলল নাসলুন্ড। "কাদা-পানিতে একাকার হয়ে গেছি। চষে ফেলেছি পুরো ফিলেদালেন।"

"লোকটার মুখ খোলাবার চেষ্টা কর," বলল ওয়ালান্ডার। "চাপ দাও দরকার হলে। সে যা যা জানে, তা জানা দরকার আমাদের।"

"স্টেশনে নিয়ে আসব?" জিজ্ঞেস করল নাসলুন্ড।

"না। তারচেয়ে বরং তার বাসায় যাও সাথে। নিজের বাসায় হয়ত কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে।"

বিকাল চারটার দিকে শুরু হলো প্রেস কনফারেন্স। রিডবার্গকে খুঁজল ওয়ালান্ডার। কিন্তু পেল না। কেউ দেখেনি তাকে।

মানুষে গিজগিজ করছে কনফারেন্স কামরা। স্থানীয় রেডিও এর সেই তরুণী রিপোর্টারকে দেখতে পেল ওয়ালান্ডার। মনস্থির করল, লিন্ডা সম্পর্কে কী জানে আজ জিজ্ঞেস করবে মেয়েটাকে।

বুকের ভেতর শুণ্যতা অনুভব করল সে। পাশ কাটিয়ে যাচ্ছি, মনে হলো তার। মৃতদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতে গিয়ে এড়িয়ে যাচ্ছি জীবিতদের। এক মুহূর্তের জন্য একটা চিন্তাই শুধু ছেয়ে রইল ওর চেতনা জুড়ে। পালিয়ে যাওয়ার তীব্র ইচ্ছা। অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার তাড়না। নতুন এক জীবন।

ডায়াসের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ওয়ালান্ডার। প্রেস কনফারেন্সে স্বাগত জানালো উপস্থিতদের। তারপর বিনা সংকোচে উড়িয়ে দিল জোড়া খুনের পেছনে বিদেশি কারও জড়িত থাকার গুজব। কঠিন প্রশ্ন করে তাকে ঝামেলায় ফেলল না কোন সাংবাদিক। এক ঘন্টার মধ্যেই শেষ হয়ে গেল কনফারেন্স।

মঞ্চ ছেড়ে সন্তুষ্ট মনে নেমে এল ওয়ালান্ডার। মুখোমুখি হলো টিভি সাংবাদিকদের। বরাবরের মতোই ক্যামেরার সামনে নার্ভাস হয়ে পড়ল সে। জড়িয়ে গেল কথা। তবে অযথা প্রশ্নবাণে বিরক্ত করল না রিপোর্টাররা। তাদেরও সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে আজ।

"পরবর্তীতে চেষ্টা করবেন আরও নির্ভুল তথ্য ফাঁস করতে," শেষ পর্যায়ে গিয়ে বলল ওয়ালান্ডার।

"মাথায় থাকবে," হেসে বলল এক রিপোর্টার।

তখনও অপেক্ষা করছিল স্থানীয় রেডিও এর তরুণী সাংবাদিক। ওয়ালান্ডার অফিসে আমন্ত্রণ জানালো তাকে। ক্যামেরার চেয়ে রেডিও মাইক্রোফোন অনেক বেশি স্বস্তিদায়ক। সাক্ষাৎকার শেষ হলে টেপ রেকর্ডার বন্ধ করে দিল তরুণী। যেই না লিন্ডার কথা তুলবে ওয়ালান্ডার, দরজায় হাজির হলো রিডবার্গ।

"আমাদের কথা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে," বলল ওয়ালান্ডার।

"না, শেষ। আর কিছু জানবার নেই আমার," বলে উঠে দাঁড়াল তরুণী।

অসহায় চোখে তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইল ওয়ালান্ডার। লিন্ডার কথা তুলতেই পারল না।

"ঝামেলা শুরু হয়ে গেছে," জানালো রিডবার্গ। "ইস্তার রিফিউজি প্রোসেসিং ইউনিট থেকে কল এসেছিল। জোরপূর্বক একটা গাড়ি নাকি ঢুকে পড়েছিল প্রাঙ্গনে। ভেতর থেকে এক ব্যাগ পচা শালগম ছুড়ে মারা হয়েছে লেবানন থেকে আসা এক বুড়োর দিকে। একেবারে মাথায় গিয়ে লেগেছে।"

"বুড়োর কী অবস্থা এখন?"

"হাসপাতালে আছে। ব্যান্ডেজ করে হয়েছে। তবে পরিচালক বেশ চিন্তিত।"

"গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নম্বর জানা গেছে?"

"না। মনে রাখার কথা খেয়াল হয়নি কারও।"

কী যেন ভেবে নিয়ে মুখ খুলল ওয়ালান্ডার। "এই মুহূর্তে কিছু করার নেই তাহলে। প্রেস কনফারেন্সে আমি বলে দিয়েছি যে বিদেশিদের জড়িত থাকার যে গুজব ছড়িয়েছে তার কোন ভিত্তি নেই। আগামীকাল সকালের পত্রিকায় চলে আসবে তা। এছাড়া আজ রাতেই প্রচারিত হবে টিভিতে। আশা করি, পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসবে এতে। তবুও নিরাপত্তার খাতিরে রাতে ক্যাম্পে পাহারার ব্যবস্থা করা যায়।"

"আমি ব্যবস্থা নিচ্ছি এখনই," বলল রিডবার্গ।

"এরপর আমার অফিসে এসো একবার। কথা আছে।"

পাহারার ব্যবস্থা করতে চলে গেল রিডবার্গ। ফিরে এল একটু পরেই।

"তোমার কী মনে হয়?" কাগজপত্র জড়ো করতে করতে জিজ্ঞেস করল ওয়ালান্ডার।

কপাল চুলকাল রিডবার্গ। "হার্ডিনের কথার সাথে মিলে যাচ্ছে লভগ্রেনের আর্থিক অবস্থা। এখন তার রক্ষিতা আর অবৈধ সন্তানের হদিস পেলেই হয়। এই রহস্যের সমাধানের দ্বারপ্রান্তে চলে এসেছি হয়ত আমরা। হয়ত আমাদের চোখের সামনেই আছে তা। কিন্তু একই সাথে..." থেমে গেল বলতে বলতে।

"কী?"

"আসলে সব কেমন জট পাকানো ঠেকছে। বিশেষ করে ওই ফাঁস।"

কাঁধ ঝাকিয়ে উঠে দাঁড়াল রিডবার্গ। "দেখা হবে আগামীকাল।"

"লভগ্রেনদের বাড়িতে কি বাদামি রঙের একটা ব্রিফকেস চোখে পড়েছিল?" জিজ্ঞেস করল ওয়ালান্ডার।

মাথা নাড়াল রিডবার্গ। "তেমন কিছু তো মনে পড়ছে না। তবে এক গাদা জিনিসপাতি জমে ছিল তাদের ওয়ারড্রবে। বুঝি না, বয়স হলে মানুষ যক্ষের ধনের মতো সব আগলে রাখতে চায় কেন।"

"আগামীকাল সকালেই একজনকে পাঠাবে ওখানে," বলল ওয়ালান্ডার। "একটা বাদামি রঙের ব্রিফকেস পাওয়া যায় কিনা খুঁজে দেখতে বলবে।"

চলে গেল রিডবার্গ। তার হাঁটার ধরণই বলে দিচ্ছে, হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে বেশ। এবাকে ফোন দেয়ার কথা মনে হলো ওয়ালান্ডারের। স্টেন ওয়াইডেনের সাথে যোগাযোগ করতে পেরেছে কিনা জানা দরকার। তবে ব্যাপারটা গায়ে মাখালো না সে। তার বদলে ডিপার্টমেন্ট ডিরেক্টরিতে অ্যানেট ব্রোলিনের ঠিকানা খোঁজ করল। অবাক হয়ে আবিষ্কার করল যে মহিলা তার বাসার কাছেই থাকে।

তাকে ডিনারের নিমন্ত্রণ জানানো যায়, ভাবল সে। তখনই মনে পড়ে গেল, অ্যানেট ব্রোলিন বিবাহিত।

ঝড়ের মধ্যে দিয়ে বাসায় ফিরে এল ওয়ালান্ডার। গোসল শেষে শুয়ে পড়ল য়ুসেপ পে ভান্দির জীবনী নিয়ে। টেরই পেল না কখন ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙল প্রচন্ড শীতে। ঘড়িতে মাঝরাত। বিরক্ত হলো সে। আরও একটা রাত কাটবে নিদ্রাহীন। হতাশ হয়ে পোশাক পরে নিল। জেগে থাকতেই হবে যেহেতু, অফিসে ব্যয় করা যাক সময়টুকু।

বাইরে ধরে এসেছে বাতাস। ঠান্ডা পড়তে শুরু করেছে আবারও। তুষার পড়বে যেকোনও সময়, মনে হলো ওর।

ওস্তেলিয়েদেনের দিকে চলল গাড়ি। একটা খালি ট্যাক্সি পাশ কাটালো বিপরীত দিকে। রাস্তা জনশূন্য হলেও ধীর গতিতেই গাড়ি চালাতে লাগল ওয়ালান্ডার। আচমকা কী মনে হতে ঠিক করল শরণার্থী শিবিরের সামনে দিয়ে চক্কর দিয়ে যাবে একবার।

খোলা মাঠে স্থাপন করা হয়েছে এই শিবির। অস্থায়ীভাবে তৈরি করে দেয়া হয়েছে কিছু কাঠের কুটির। ফ্লাডলাইটের আলোয় মলিন দেখাচ্ছে সবুজ রঙের ঘরগুলো। পার্কিং এরিয়ায় গাড়ি রেখে বেরিয়ে এল ওয়ালান্ডার। ঢেউ আছড়ে পড়ার কল্লোল ভেসে আসছে কাছের সৈকত থেকে।

ক্যাম্পের ওপর চোখ বুলালো সে। বেড়া দিয়ে ঘিরে দিলে এটা আর কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের মাঝে তফাৎ থাকবে না, মনে হলো ওর। গাড়িতে ফিরে যাবে, এমন সময় কানে এল কাঁচ ভাঙার শব্দ। এক মুহূর্ত পরে বুউউম।

তারপর দাউদাউ করে জ্বলে উঠল একটা কুটির।

সাত

আগুনের লেলিহান শিখা স্তব্ধ করে দিল ওয়ালান্ডারকে খানিকের জন্য। বিহ্বল হয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল নিজেও জানে না। সম্বিত ফিরে পেতেই তুলে নিল কার ফোন।

"ইস্তার শরণার্থী শিবিরে আগুন লেগেছে!" বলল চিৎকার করে। "এখনই ফায়ার ডিপার্টমেন্টকে খবর দাও। বাতাসের কারণে আগুন ছড়িয়ে পড়তে পারে।"

"আপনার নাম?" জিজ্ঞেস করল একটা পুরুষ কণ্ঠ।

"আমি ওয়ালান্ডার, ইস্তা পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে বলছি। শিবিরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময় আগুন দেখতে পাই।"

"আপনার পরিচয়?" অবিচল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ওপ্রান্তের কণ্ঠস্বর।

বিরক্তি চাপা দিতে পারল না ওয়ালান্ডার। "৪-৭-১-১-২-১! প্যাঁচাল না পেরে এখনই ফায়ার সার্ভিস পাঠান!"

তৃতীয় প্রশ্ন ধেয়ে আসার আগেই ফোন রেখে দিল সে। তাছাড়া, জানে যে দায়িত্বে থাকা সব অফিসারের পরিচয় জানতে অসুবিধা হবে না ইমার্জেন্সি সুইচবোর্ডের। দেরি না করে জ্বলতে থাকা কুটিরের দিকে দৌড় দিল সে। বাতাস পেয়ে দাউদাউ করে জ্বলছে আগুন। গতকাল রাতে ঝড়ের সময় যদি এই আগুন লাগতো, তাহলে কী ঘটতে পারতো কল্পনা করেই শিউরে উঠল সে। এরিমধ্যে পরের ঘরটা ছুঁইছুঁই করছে লকলকে অগ্নিশিখা।

অ্যালার্ম বাজানো হয়নি কেন? প্রশ্ন জাগলো ওর মনে। অবশ্য সবগুলো ঘরেই মানুষ থাকছে কিনা কে জানে। আগুনে পুড়তে থাকা ঘরটার সামনে চলে এল ওয়ালান্ডার। গরম হলকা লাগল চোখেমুখে। জোরে জোরে দরজায় থাবা বসাতে লাগল সে। কিন্তু কোন সাড়া পেল না।

মুহূর্ত খানিকের মধ্যেই পুরো ঘরটা গ্রাস করে নিল লেলিহান শিখা। দরজার সামনে থেকে সরে আসতে বাধ্য হলো ওয়ালান্ডার। ঘুরে চলে গেল ঘরটার একপাশে। একটাই জানালা। কাঁচে আঘাত করল সে। চেষ্টা করল ভেতরে দেখতে। কিন্তু সাদা ধোঁয়া ছাড়া কিছুই চোখে পড়ল না। আশেপাশে তাকিয়ে কিছু একটা খুঁজল কাঁচ ভাঙার জন্য, কিন্তু পেল না। অগত্যা গায়ের জ্যাকেট খুলে নিয়ে পেঁচালো হাতে। তারপর মুষ্টি পাকিয়ে সজোরে আঘাত করল কাঁচে।

গলগল করে ভাঙা জানালা দিয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল ধোঁয়া। নিঃশ্বাস বন্ধ রেখে জানালার হাতল খুঁজতে লাগল ওয়ালান্ডার। দম শেষ হয়ে যাওয়ায় দুবার পেছনে ফিরে যেতে হলো তাকে। তৃতীয় বার গিয়ে খুঁজে পেল হাতল।

"বেরিয়ে আসুন!" চেঁচালো সে। "বেরিয়ে আসুন! এদিক দিয়ে!"

কুটিরের ভেতর দোতলা একটা খাট নজরে এল ওর। চটপট উঠে পড়ল জানালার চৌকাঠে। ভাঙা কাঁচের টুকর উরুতে গেঁথে গেলেও পাত্তা দিল না সে। উপরের খাটটা খালি। তবে নিচের বাঙ্কারে শুয়ে আছে একজন।

ফের চেঁচালো ওয়ালান্ডার। কিন্তু সাড়া পেল না। উপায় না দেখে লাফ দিল ঘরের ভেতর। মেঝেতে পড়তে গিয়ে বাড়ি খেল টেবিলের কোণায়। ধোঁয়ায় কষ্ট হলো নিঃশ্বাস নিতে, জ্বালাপোড়া করছে চোখ। হাচড়েপাচড়ে খাটের দিকে এগোল সে। খাটে শুয়ে থাকা আকৃতিটা স্পর্শ করতেই মনে হলো, হাত দিয়েছে একটা লাশে। এক মুহূর্ত পরেই বুঝতে পারল ভুলটা। যেটাকে সে লাশ ভেবেছে, তা আসলে একটা রোল করে রাখা ম্যাট্রেস। এমন সময় আগুন ধরে গেল ওর হাতের জ্যাকেটে। জানালা দিয়ে লাফিয়ে বেরিয়ে এল সে।

দূরে সাইরেনের শব্দ শোনা যাচ্ছে। টলোমলো পায়ে কুটিরটা থেকে সরে যেতে লাগল ওয়ালান্ডার। জনাকয়েক মানুষকে দেখল কুটিরের বাইরে ঘুরাঘুরি করতে। ইতোমধ্যে আরও দুইটা কুটিরে আগুন ধরে গেছে। ধাক্কা দিয়ে ঘরগুলোর দরজা খুলে ফেলল সে। মানুষ বসবাসের ছাপ রয়েছে এই কুটিরগুলোতে। সৌভাগ্যবশত টের পেয়ে বেরিয়ে গেছে তারা। দপদপ করছে ওয়ালান্ডারের মাথা। উরুতে প্রচণ্ড যন্ত্রণা। ফুসফুসে ধোঁয়া ঢুকে যাওয়ায় কষ্ট হচ্ছে নিঃশ্বাস নিতে। পুড়ে গেছে এক হাতের কিছু জায়গা।

অবশেষে উপস্থিত হলো ফায়ার সার্ভিসের প্রথম গাড়ি। পিছনে একটা অ্যাম্বুলেন্স। ফায়ার ক্যাপ্টেনকে চিনতে পারল ওয়ালান্ডার। পিটার এডলার। বয়স ত্রিশের কোঠায়। মনে পড়ল, লোকটার শখ ঘুড়ি উড়ানো। তার সম্পর্কে শুধু ভালো কথাই শুনেছে ওয়ালান্ডার। সে নাকি প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী একজন মানুষ। এগিয়ে গেল ওয়ালান্ডার।

"যে কুটির গুলোয় আগুন ধরেছে, ওগুলো খালি," বলল হাঁপাতে হাঁপাতে। "তবে অন্য গুলোর কথা জানি না।"

"আপনার দেখি ভয়াবহ অবস্থা," বলল এডলার। "বিশ্রাম নিন। বাকিটুকু আমরা সামলে নিতে পারব।"

এরিমধ্যে হোস পাইপ দিয়ে পানি ছিটাতে শুরু করেছে ফায়ার কর্মীরা। ট্রাক্টর দিয়ে আগুন ধরে যাওয়া কুটির গুলোকে ধ্বসিয়ে দিতে আদেশ দিল এডলার, যাতে আগুন ছড়িয়ে পড়তে না পারে।

নীল বাতি জ্বালিয়ে আর সাইরেন বাজিয়ে উপস্থিত হলো পুলিশের প্রথম গাড়ি। পিটারস আর নরেনকে নেমে আসতে দেখে এগিয়ে গেল ওয়ালান্ডার।

"কী হয়েছে?" জিজ্ঞেস করল নরেন।

"মারাত্মক কিছু ঘটেনি," আশ্বস্ত করল ওয়ালান্ডার। "পুরো জায়গাটা টেপ দিয়ে ঘিরে দাও। আর এডলারের সাথে কথা বলে দেখ কোন সাহায্য লাগবে কিনা।"

ওর ওপর চোখ বুলালো পিটারস। "আপনার অবস্থা তো সুবিধার মনে হচ্ছে না। এখানে এলেন কিভাবে?"

"শিবিরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম," জবাব দিল ওয়ালান্ডার। "এখন যাও, কাজে লেগে পড়ো।"

হইহল্লা আর আগুনের সাথে যুদ্ধ করে কেটে গেল পরের ঘন্টাটা। এলোমেলো পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল শরণার্থী শিবিরের পরিচালক। তাকে ধরে নিয়ে এল ওয়ালান্ডার। শিবিরে বসবাসকারীর সংখ্যা আর বর্তমানে কতজন আছে জানা দরকার। হতবিহ্বল পরিচালকের মুখ খোলাতে বেগ পেতে হলো তাকে। অবাক হয়ে আবিষ্কার করল, ইমিগ্রেশন সার্ভিসের কাছে যে রেকর্ড আছে তা সঠিক নয়। এমনকি শিবিরের পরিচালকও এই বিষয়ে সাহায্য করতে পারল না। ইতোমধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে ফায়ার কর্মীরা। হাসপাতালে যাওয়ার প্রয়োজন পড়েনি খুব বেশি শরণার্থীর। জখম হয়নি কেউই, তবে পড়ে গিয়ে পাথরের সাথে লেগে মাথায় আঘাত পেয়েছে এক লেবানিজ বালক।

ওয়ালান্ডারকে একপাশে নিয়ে এল এডলার। "আপনার মেডিক্যাল সাহায্য প্রয়োজন।"

মাথা দুলিয়ে সায় জানালো ওয়ালান্ডার। জ্বালা করছে হাতের পুড়ে যাওয়া জখম। রক্তে ভিজে গেছে এক পা।

"আপনি ফায়ার সার্ভিসে খবর দিতে দেরি করলে পরিস্থিতি মারাত্মক রুপ নিতে পারতো," বলল এডলার।

"কুটির গুলোর মাঝে আরও ফাঁকা স্থান রাখা উচিত ছিল," বলল ওয়ালান্ডার।

"তা ঠিকই বলেছেন," মাথা ঝাঁকিয়ে বলল এডলার।

নরেনকে টেপ দিয়ে জায়গাটা ঘিরে ফেলতে দেখল ওয়ালান্ডার। চলল সেদিকে।

"আগামীকাল সকালেই শিবিরের পরিচালক যেন আমার অফিসে থাকে," বলল সে।

মাথা দুলিয়ে সায় জানালো নরেন। তারপর জিজ্ঞেস করল, "কিছু চোখে পড়েছে আপনার?"

"একটা আওয়াজ শুনতে পাই। তারপরই দেখি আগুন ধরে গেছে একটা কুটিরে। কোন মানুষ বা গাড়ি চোখে পড়েনি। সম্ভবত আগে থেকেই বোম জাতীয় কিছু রেখে গিয়েছিল কেউ।"

"আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসব? নাকি হাসপাতালে যাবেন?"

"নিজেই যেতে পারব। আসি এখন।"

ক্যাজুয়ালটি ওয়ার্ডে গিয়ে ওয়ালান্ডার আবিষ্কার করল, যতটা ভেবেছে, তারচেয়ে বেশি আহত হয়েছে সে। পুড়ে গেছে এক হাতের অনেকখানি। কাঁচে কেটে গেছে উরুর কাছটায়। ফুলে আলুর আকার ধারণ করেছে ডান চোখের ওপর অংশ। আর কালশিটে দাগ তো আছেই। তার ওপর অজান্তেই কামড় বসিয়েছে জিহ্বায়।

হাসপাতাল ছেড়ে যখন বের হলো সে, সকাল বাজে চারটা। নড়াচড়া করতে সমস্যা হচ্ছে শক্ত করে বাঁধা ব্যান্ডেজের কারণে। ধোঁয়ার কারণে ফুসফুসের জ্বালাপোড়া এখনও কমেনি।

গাড়ির দিকে পা বাড়াবে, এমন সময় ফ্ল্যাশ লাইট জ্বলে উঠল ওর মুখের ওপর। ক্যামেরার মালিককে চিনতে পারল সে। স্কেওনার এক নামকরা পত্রিকার ফটোগ্রাফার। ছায়া ছেড়ে বেরিয়ে এল এক সাংবাদিক। ইন্টারভিউ নিয়ে চাইলে হাত নাড়িয়ে নিষেধ করে দিল ওয়ালান্ডার।

গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরে এল সে। অবাক হয়ে আবিষ্কার করল, ঘুম পাচ্ছে তার। পোশাক খুলেই শুয়ে পড়ল খাটে। সারা শরীরে যন্ত্রণা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল মুহূর্তের মধ্যে।

ঘুম ভাঙল সকাল আটটায়। আবারও স্বপ্নে দেখেছে ওই রহস্যময়ী কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাকে। যেই না ছুঁতে গেছে, অমনি সেখানে হুইস্কির বোতল নিয়ে উপস্থিত হয় স্টেন ওয়াইডেন। তারপর ওয়ালান্ডারকে রেখে স্টেনের সাথে চলে যায় ওই মহিলা।

চুপচাপ শুয়ে রইল ওয়ালান্ডার। দপদপ করছে মাথার ভেতরটা। ঘাড়-হাতে অসহ্য যন্ত্রণা। আবারও ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছা হলো ওর। ভুলে যেতে ইচ্ছে করল গতরাতের কথা।

অবশ্য সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ পেল না। তার আগেই বেজে উঠল টেলিফোন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও রিসিভার তুলল সে।

মোনা ফোন করেছে।

"কার্ট," বলল সে। "আমি মোনা।"

খুশিতে ভরে গেল ওয়ালান্ডারের হৃদয়।

মোনা, বলল মনে মনে। ও, মোনা! এত দিন পর। কতটা মিস করেছি তোমাকে!

"পত্রিকায় তোমার ছবি দেখলাম," বলল মোনা। "তুমি ঠিক আছ?"

গতকাল রাতে হাসপাতালের বাইরের ফটোগ্রাফারের কথা মনে পড়ল ওয়ালান্ডারের। "হ্যাঁ," জবাব দিল। "তেমন কিছু হয়নি।"

"সত্যি?"

সহসাই তিক্ততায় ছেয়ে গেল ওয়ালান্ডারের মন। "আমার কিছু হলেও বা তোমার কী?"

"এসব কী বলছ?"

"ভুল বললাম?"

মোনার নিঃশ্বাসের শব্দ কানে এল ওয়ালান্ডারের।

"পত্রিকায় দেখলাম নিজের জীবন বাজি রেখে বিপদে ঝাপিয়ে পড়েছ তুমি," বলল মোনা। "তোমার মতো সাহসী মানুষ কমই আছে।"

"আমি মোটেও নিজের জীবন বাজি রাখিনি। বাজে কথা সব!"

"তুমি ঠিক আছ কিনা জানতে ফোন করেছি আমি।"

"যদি ঠিক না থাকতাম?"

"মানে?"

"মানে, যদি আমি আহত হতাম, যদি মৃত্যুশয্যায় থাকতাম, তাতেও কি তোমার কিছু যায়-আসে?"

"এভাবে কথা বলছ কেন তুমি?"

"কিভাবে কথা বলছি? কেন চলে গেলে আমাকে ফেলে? ফিরে এসো আমার কাছে।"

"তুমি জানো তা আর সম্ভব না। তবে তুমি চাইলে আমরা কথা বলতে পারি।"

"তুমি তো ফোনই দাও না! তাহলে কিভাবে কথা বলব?"

মোনার দীর্ঘশ্বাস কানে এল ওয়ালান্ডারের। এতে আরও রেগে গেল সে।

"আমরা দেখা করতে পারি," বলল মোনা। "তবে আমার কিংবা তোমার বাসায় না।"

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ওয়ালান্ডার। যা বলল তা সত্য না হলেও, মিথ্যাও নয় অবশ্য।

"অনেক কিছু আলোচনা করার আছে আমাদের। না, বাজে কোন কথা না। তুমি চাইলে আমি মালমোতে যেতে পারি।"

উত্তর দেয়ার আগে সময় নিল মোনা। "আজ না। আগামীকাল?"

"একসাথে ডিনার করলে কেমন হয়? অবশ্য আমি স্যাভয় আর সেন্ট্রাল ছাড়া আর কিছু চিনি না।"

"স্যাভয় তো অনেক দামি।"

"তাহলে সেন্ট্রালে? কয়টায়?"

"আটটায় হলে কেমন হয়?"

"ঠিক আছে।"

ফোন রেখে দিল ওয়ালান্ডার। আয়নায় তাকাল নিজের বিকৃত চেহারার দিকে। সত্যিই কি মোনার সাথে দেখা করতে চায় সে? দ্বিধা জাগলো মনে। মোনার বদলে নিজেকে স্যাভয়ে দেখতে পেল অ্যানেট ব্রোলিনের সাথে। কিভাবে যেন এক কৃষ্ণাঙ্গ নারীতে রূপ নিয়েছে ব্রোলিন।

পোশাক পরে গাড়িতে গিয়ে বসল ওয়ালান্ডার। তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করেছে। সমুদ্রের বুক ছেড়ে শহরের দিকে ভেসে আসছে অবশিষ্ট কুয়াশা। বাতাস নেই বললেই চলে।

পুলিশ স্টেশনে যখন প্রবেশ করল, পিঠে চাপড় দিয়ে সবাই অভ্যর্থনা জানালো তাকে। এবা জড়িয়ে ধরে উপহার দিল এক বোতল জ্যাম। বিব্রত হলেও কম খুশি হলো না ওয়ালান্ডার।

বিয়র্ক থাকলে ভালো হত, ভাবল সে। এরকম হিরোই চায় সে তার ডিপার্টমেন্টে।

সাড়ে নয়টা বাজতে বাজতে ফিরে এল স্বাভাবিক পরিস্থিতি। এর মাঝে শরণার্থী শিবিরের পরিচালকের সাথে বৈঠকে বসেছিল ওয়ালান্ডার। কড়া ভাষায় সতর্ক করেছে শিবিরের বেহাল দশা নিয়ে। ছোটখাটো, অলস ধরণের লোকটা অবশ্য প্রতিবাদ করেছে দ্বিধাহীন কণ্ঠে। তার মতে, ইমিগ্রেশন সার্ভিসের আদেশ সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে যাচ্ছে।

"শিবিরের নিরাপত্তার দায়িত্ব পুলিশের," বলল জোর গলায়।

পুলিশের ওপর দোষ চাপানোর চেষ্টা করছে দেখে মেজাজ খারাপ হলো ওয়ালান্ডারের। "আপনি শিবিরের পরিচালক হয়ে জানেন না আপনার শিবিরে কতজন শরণার্থী থাকছে বা কারা থাকছে। আমরা তাহলে কিভাবে নিরাপত্তা দিব?"

রেগে গিয়ে চলে যেতে উদ্যত হলো লোকটা। "আমি অভিযোগ করব আপনার ডিপার্টমেন্টের নামে।"

"যা ইচ্ছে করুন," পাল্টা জবাব দিল ওয়ালান্ডার। "যেখানে খুশি যান। কিন্তু এখন থেকে আপনার শিবিরে কতজন থাকছে, কারা থাকছে, তাদের পূর্নাঙ্গ পরিচয় যেন রেকর্ডে থাকে।"

কেস মিটিং শুরু হওয়ার খানিক আগে ফোন দিল এডলার। "তা কেমন আছেন, হিরো?"

"মেজাজ ভালো নেই," জবাব দিল ওয়ালান্ডার। "কিছু জানা গেছে?"

"হ্যাঁ। ছোটখাটো একটা ডিটোনেটর দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছিল পেট্রলে চুবানো কাপড়ে।"

"নিশ্চিত?"

"অবশ্যই। কিছুক্ষণের মাঝেই রিপোর্ট পেয়ে যাবেন।"

"জোড়াখুনের পাশাপাশি এই অগ্নিকান্ডের তদন্তও চালিয়ে যেতে হবে। পরিস্থিতি যদি এর বাইরে চলে যায়, তাহলে হয়ত সিমরিশাম বা মালমো পুলিশের সাহায্য লাগবে।"

"আমি তো জানতাম সিমরিশামের স্টেশন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।"

"ভুল শুনেছেন। ভলান্টিয়ার ফায়ার ফাইটারদের গ্রুপটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আমি তো শুনেছি, ওখানে নাকি কিছু নতুন পদে নিয়োগ দিবার প্রক্রিয়া চলছে।"

এডলার থেকে জানা তথ্য দিয়ে মিটিং শুরু করল ওয়ালান্ডার। আলোচনা চলল হামলার পেছনের সম্ভাব্য কারণ নিয়ে। সবাই একমত হলো যে কাজটা হয়ত কমবয়সী কারও প্রাঙ্ক, যা অসাবধানতায় মারাত্মক রুপ নিয়েছে।

"লুনাপের জোড়াখুনের খুনিদের ধরার মতো এই অপরাধীদের ধরাও আমাদের কর্তব্য," বলল হ্যানসন।

"এরাই হয়ত ওই বৃদ্ধের মাথায় শালগম ছুড়েছে," বলল সুইয়েডবার। "সংঘবদ্ধভাবে কাজ করছে।"

তার কন্ঠের অসন্তুষ্টি ওয়ালান্ডারের কান এড়াল না।

"বৃদ্ধের সাথে কথা বল। হয়ত সে আক্রমণকারীর বর্ণনা দিতে পারবে।"

"আমি আরবি জানি না," বলল সুইয়েডবার।

"তাহলে দোভাষীর সাহায্য নেবে। এটাও কি বলে দিতে হয়! যাই হোক, বিকেলের মধ্যে আমি বৃদ্ধের বয়ান জানতে চাই।"

দ্রুতই শেষ হয়ে গেল মিটিং।

"বিকালের মিটিং বাতিল," ঘোষণা করল ওয়ালান্ডার। "তবে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটলে ভিন্ন হিসাব। তোমার কী খবর, মার্টিনসন?"

"লরি চালক যে গাড়িটা দেখেছিল, আমি সেটার খোঁজ করছি," জানালো মার্টিনসন। "আপনাকে রিপোর্ট দিব আমার কাজ শেষ হলে।"

"ঠিক আছে। তবে আপাতত তুমি শিবিরে চলে যাও। আর তোমার কাজটা দেখবে সুইয়েডবার।"

মিটিং শেষ হলে চলে লাগলো সবাই। রয়ে গেল শুধু নাসলুন্ড আর রিডবার্গ।

"ওভারটাইম করতে হবে মনে হচ্ছে," বলল ওয়ালান্ডার। "বিয়র্ক কবে ফিরবে?"

উত্তর দিল না কেউ। জানা নেই কারও।

"এখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে কি তার কোন ধারণা আছে?" নিজেকেই যেন জিজ্ঞেস করল রিডবার্গ।

"থাকলেও বা কী? তার কোন মাথাব্যথা থাকতো?"

এবাকে ফোন দিল ওয়ালান্ডার। সময় সহ কোন বিমানে আসবেন পুলিশ প্রধান, তাও জানিয়ে দিল এবা।

"শনিবার রাতে," অন্যদের জানালো ওয়ালান্ডার। "কিন্তু আমি যেহেতু ভারপ্রাপ্ত প্রধান হিসেবে দায়িত্বে আছি, সব ধরণের ওভারটাইমের অনুমতি দিয়ে দিব।"

লভগ্রেন খামারে গিয়েছিল রিডবার্গ। কিন্তু কোন বাদামি ব্রিফকেস খুঁজে পায়নি।

"পুরো জায়গাটা তোলপাড় করে ফেলেছি। এমনকি আস্তাবলের খড়ের গাদাও খুঁজে দেখেছি। কিন্তু বাদামি ব্রিফকেস পাইনি।"

ব্রিফকেসটা যে তাহলে খামারবাড়িতে নেই, এ বিষয়ে সন্দেহ রইল না ওয়ালান্ডারের। একশো ভাগ নিশ্চিত না হলে বলতো না রিডবার্গ।

"তারমানে সাতাশ হাজার ক্রোনার সহ গায়েব একটা বাদামি ব্রিফকেস," সারমর্ম টানলো ওয়ালান্ডার।

"এরচেয়ে কম অর্থের জন্যেও খুন হয়ে যায় মানুষ," বলল রিডবার্গ।

ভাবনাটা মুহূর্তের জন্য চুপ করিয়ে দিল ওদের তিনজনকে।

"গাড়িটা কেন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বুঝলাম না," কপাল চুলকাতে চুলকাতে বলল ওয়ালান্ডার। "প্রেসের কাছে বর্ণনা দিয়ে চালককে আহবান করেছি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে।"

"ধৈর্য ধরতে হবে," বলল রিডবার্গ।

"লভগ্রেনদের মেয়েরা কী বলে? কোন রিপোর্ট থাকলে দিতে পার। কৃষানইস্তায় যাওয়ার পথে গাড়িতে পড়ে নিব। আচ্ছা, তোমাদের কি মনে হয়

গতকাল রাতের ঘটনার সাথে আমার কাছে আসা হুমকির কোন সম্পর্ক আছে?"

মাথা নাড়িয়ে না বুঝালো রিডবার্গ আর নাসলুন্ড।

"আমারও না," বলল ওয়ালান্ডার। "তারমানে শুক্রবার বা শনিবার কিছু ঘটার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে আমাদের। আশা করি কী পদক্ষেপ নেয়া যেতে এ বিষয়ে, তা ভেবে আজ বিকালের মাঝে জানাবে, রিডবার্গ।"

মুখভঙ্গি করল রিডবার্গ। "আমাকে আবার এসব ভাবাভাবির মধ্যে টানা হচ্ছে কেন?"

"কারণ তুমি একজন অসাধারণ পুলিশ অফিসার। ঠিকই বের করে ফেলবে কিছু না কিছু।"

দ্বিধান্বিত চোখে ওয়ালান্ডারের দিকে তাকাল রিডবার্গ। চলে যেতে উদ্যত হয়েও থেমে গেল দরজায় গিয়ে।

"লভগ্রেনদের যে মেয়ে কানাডায় থাকে, তার সাথে কথা হয়েছে আমার। তার স্বামীর সাথেও হয়েছে। আমরা সাথে পিস্তল রাখি না দেখে অবাক হয়েছেন তিনি।"

"বছর দুয়েকের মধ্যে হয়ত আমাদেরও রাখতে হবে," বলল ওয়ালান্ডার।

লার্স হার্ডিনের বিষয়ে নাসলুন্ডের সাথে কথা বলতে যাবে, এমন সময় বেজে উঠল ফোন। এবা জানালো, ইমিগ্রেশন সার্ভিসের প্রধান লাইনে আছেন।

নারীকণ্ঠ শুনে অবাক হলো ওয়ালান্ডার। উচ্চপদগুলো আজকাল নারী দিয়ে ভরে যাচ্ছে নাকি? সে ভেবেছিল, সরকারি উপরের পদগুলো উদ্ধত বুড়ো দিয়ে ভর্তি।

মহিলার কণ্ঠ মধুর হলেও তার কথা শুনে মুহূর্তেই মেজাজ চড়ে গেল ওয়ালান্ডারের।

"বিষয়টা হতাশাজনক," বলল মহিলা। "আমাদের শরণার্থীদের নিরাপত্তার ভার পুলিশের ওপরই ন্যস্ত।"

ওই মাথামোটা পরিচালকের সুরেই কথা বলছে দেখছি, মনে মনে বলল ওয়ালান্ডার।

"আমরা চেষ্টা করছি যতটুকু সম্ভব," বিরক্তি চাপা দিয়ে বলল সে। ছোট্ট এক শহরের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ প্রধান হয়ে এক উচ্চপদস্থ সরকারি আমলার সাথে লাগতে না যাওয়াটাই শ্রেয়।

"কিন্তু তা যথেষ্ট না।"

"আমাদের কাজটা আরও সহজ হত যদি বিভিন্ন শিবিরে বসবাসরত শরণার্থীদের একটা সঠিক পরিসংখ্যান থাকতো।"

"শরণার্থীদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা আমাদের কাছে আছে।"

"আমার তা মনে হয়নি।"

"অভিবাসন মন্ত্রী এ ঘটনায় খুবই উদ্বিগ্ন।"

লালচুলো এক নারী ভেসে উঠল ওয়ালান্ডারের মনের পর্দায়। প্রায়শ তার দেখা মেলে টিভিতে।

"প্রয়োজন মনে হলে তিনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন," নাসলুন্ডের দিকে মুখভঙ্গি করে বলল ওয়ালান্ডার।

"স্পষ্টতই শরণার্থীদের রক্ষার্থে পুলিশ যথেষ্ট লোকবল নিয়োগ করছে না।"

"কিংবা সংখ্যাটা এত বড় যে আমরা কুলিয়ে উঠতে পারছি না। আর তাদের আবাসন ব্যবস্থা নিয়েও মনে হয় না কেউ ভাবে।"

"কী বলতে চাইছেন আপনি?" ভদ্র কণ্ঠস্বর এবার শীতলে রূপ নিল।

ওদিকে ভেতরে ফুঁসতে লাগল ওয়ালান্ডার।

"তেমন কিছু না। গতকালের অগ্নিকান্ডের ঘটনায় শিবিরের বেহাল দশা অনেকখানি ফুটে উঠেছে। ইমিগ্রেশন সার্ভিস থেকে যথাযথ নির্দেশনা পাওয়া যায় না। আপনারা প্রায় বলেন অবৈধ অভিবাসীদের বের করে দিতে। অথচ এই অবৈধ অভিবাসীদের অবস্থান সম্পর্কে কোন ধারণা দিতে পারেন না। আর আমরা সপ্তাহের পর সপ্তাহ এদের খুঁজে খুঁজে গলদঘর্ম হই।"

মিথ্যা বলেনি কথাটা। ইমিগ্রেশন সার্ভিসের ব্যর্থতার মাশুল প্রায় দিতে হয় পুলিশ বাহিনীকে। এরকম কাহিনি সে শুনেছে মালমোর অফিসারদের থেকে।

"সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কথাবার্তা," বলল মহিলা। "আর এধরণের অবান্তর কথা বলার সময় আমার নেই।"

কেটে গেল কল।

শালী, ঠাস করে রিসিভার নামিয়ে রেখে বলল ওয়ালান্ডার।

"কে ফোন করেছে?" জানতে চাইল নাসলুন্ড।

"ইমিগ্রেশন সার্ভিসের প্রধান," জবাব দিল ওয়ালান্ডার। "বোকার স্বর্গে থেকে আবার হম্বিতম্বি করে। কফি খাবে?"

কফি আনতে চলে গেল নাসলুন্ড। লভগ্রেনের মেয়েদের নেয়া জবানবন্দির অনুলিপি নিয়ে হাজির হলো রিডবার্গ। ইমিগ্রেশন প্রধানের সাথে হওয়া ফোনালাপের কথা তাকে জানালো ওয়ালান্ডার।

"শীঘ্রই ফোন আসবে উদ্বিগ্ন অভিবাসন মন্ত্রী থেকে," মুখ টিপে হাসলো রিডবার্গ।

"তোমাকে সামাল দিতে হবে সেক্ষেত্রে," বলল ওয়ালান্ডার। "আমি একবার কৃষানইস্তা থেকে ঘুরে আসি।"

দুই মগ কফি নিয়ে উপস্থিত হলো নাসলুন্ড। কিন্তু ততক্ষণে কফির তৃষ্ণা মিটে গেছে ওয়ালান্ডারের। চার দেয়াল ছেড়ে বের হতে হাঁসফাঁস করছে ওর প্রাণ। মাথায় চিনচিনে ব্যথা। গাড়ি চালাতে পারলে ভালো লাগবে হয়ত।

"গাড়িতে বসে শুনব তোমার কথা," কফির মগ ঠেলে রেখে বলল সে।

দ্বিধান্বিত দেখাল নাসলুন্ডকে। "কিন্তু আমি তো জানি না কোথায় যেতে হবে। লভগ্রেনের রক্ষিতার সম্পর্কে কিছুই বলতে পারেনি হার্ডিন।"

"কিছু একটা তো জানে অবশ্যই।"

"আমার মনে হয় না মিথ্যা বলেছে সে। ভালোই চাপ দিয়েছি আমি। সে শুধু জানে যে লভগ্রেনের একজন রক্ষিতা আছে।"

"কিভাবে জানলো?"

"একদা কৃষানইস্তায় থাকতো সে। তখন রাস্তায় দেখেছে লভগ্রেনের সাথে।"

"কখনকার কথা এটা?"

নোটবুকের পাতা উল্টালো নাসলুন্ড। "এগারো বছর আগের।"

কফির মগে হাত বুলালো ওয়ালান্ডার।

"তবুও অনেক ফোঁকড় থেকে যায়," বলল সে। "আরও বেশি কিছু জানে সে। নাহয় কিভাবে লভগ্রেনের অবৈধ ছেলে সন্তানের কথা জানলো? কিভানে জানলো যে লভগ্রেন তার রক্ষিতাকে টাকা দিত? এসব কিছু বলেছে?"

"বলেছে কে একজন নাকি তাকে লিখে পাঠিয়েছে।"

"কে?"

"বলেনি।"

কী যেন ভাবল ওয়ালান্ডার। "এমনিতেও যেতে হবে কৃষানইস্তায়। আমাদের ওখানকার সহকর্মীদের সাহায্য লাগবে এ ব্যাপারে। তারপর আমি হার্ডিনেরর মুখ খোলাচ্ছি।"

একটা স্কোয়াড কারে উঠে বসল ওরা। নাসলুন্ডের ওপর গাড়ি চালানোর ভার চাপিয়ে পেছনে সিটে বসল ওয়ালান্ডার। শহরের বাইরে এসে তার মনে হলো, মাত্রাতিরিক্ত গতিতে গাড়ি চালাচ্ছে নাসলুন্ড।

"আমরা কোন জরুরি কাজে যাচ্ছি না," বলল সে। "আস্তে চালাও। কাগজগুলো পড়ার সুযোগ দাও আমাকে।"

গতি কমিয়ে আনল নাসলুন্ড।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ওয়ালান্ডার। ধূসর আর রুক্ষ রুপ নিয়েছে প্রকৃতি। বসন্ত আর গ্রীষ্মের স্কেনিয়া কাউন্টিকে যতটা আপন মনে হয়, ঠিক ততটাই পর ঠেকে শরৎ আর শীতের পরিবেশ।

হেলান দিয়ে চোখ মুদলো সে। নিজ হৃদপিন্ডের ধুকধুকানি শুনতে পাচ্ছে যেন। বিপত্নীকদের হার্ট অ্যাটাক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে, মনে হলো তার। লাগামহীন খাওয়াদাওয়া ওজন বাড়িয়ে দেয়। আর ভগ্ন হৃদয়ের পীড়া তো আছেই। এমনকি নতুন সম্পর্কে জড়ালেও পরিণতি সুখকর হয় না।

মোনার ভাবনা একই সাথে বিষণ্ন আর ক্রোধান্বিত করল ওকে। চোখ খুলে আবারও বাইরে তাকাল। তারপর পড়তে লাগল রিডবার্গের দেয়া অনুলিপি। এমন কিছু লেখা নেই যা কাজে আসতে পারে। উল্লেখ নেই কোন শত্রু বা বৈরিতার কথা। এমনকি অর্থসম্পদের কথাও না। লভগ্রেন নিজের মেয়েদেরও তার অর্থসম্পদের কথা জানায়নি।

ইয়োহানেস লভগ্রেনকে কল্পনা করার চেষ্টা করল ওয়ালান্ডার। কেমন ছিল তার চিন্তাধারা? কখনও কি ভেবেছিলেন মৃত্যুর পর তার এই অগাধ সম্পত্তির কী হবে?

সহসাই ভাবনাটা খেলে গেল ওর মাথায়। নিশ্চয় কোন অছিয়তনামা রেখে গিয়েছেন লভগ্রেন। যেহেতু সেটা সেফ-ডিপোজিট বক্সগুলোতে নেই, তাহলে গেল কোথায়? তবে কি তৃতীয় কোনবক্স আছে?

"ইস্তায় মোট কতটা ব্যাংক আছে?" নাসলুন্ডকে জিজ্ঞেস করল ওয়ালান্ডার।

শহরের অলিগলি হাতের তালুর মতো চেনে নাসলুন্ড। "দশটা।"

"যেগুলোতে আমরা যাইনি, আগামীকাল সেগুলোতে যাবে তুমি। এমনও তো হতে পারে যে লভগ্রেনের নামে আরও সেফ-ডিপোজিট বক্স আছে? আর লুনাপ থেকে তিনি কিভাবে যাওয়া-আসা করতেন, সে খবরাখবরও নেবে।"

মাথা দোলাল নাসলুন্ড। "হয়ত স্কুল বাসে চড়তেন।"

"কেউ না কেউ দেখে থাকবে নিশ্চয়।"

টোমেলিলা রুট ধরে, মালমো যাওয়ার মূল সড়ক ক্রস করে, সোজা উত্তরে চলল গাড়ি।

"হার্ডিনের বাসা দেখতে কেমন?" জানতে চাইল ওয়ালান্ডার।

"পুরনো ধাঁচের। মজার ব্যাপার হলো, রান্না করতে মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করে সে। আমাকে ঘরে বানানো রোল খেতে দিয়েছিল। একটা পোষা তোতা আছে তার। খামার দেখেই বোঝা যায়, ভালো যত্ন নেয়া হয়। একেবারে পরিপাটি। বেড়ার কোথাও ভাঙা নেই।"

"গাড়ি আছে?"

"একটা লাল মার্সিডিজ।"

"মার্সিডিজ?"

"হ্যাঁ, কেন?"

"অথচ আমাদের বলল তার নাকি নুন আনতে পান্তা ফুরোয়।"

"তার গাড়িটার দাম কমসে কম তিন লক্ষের ওপরে হবে।"

কথাটা ভাবালো ওয়ালান্ডারকে। "এই লার্স হার্ডিন সম্পর্কে আরও খোঁজখবর নিতে হবে। যদিও বলছে যে খুনিদের সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই তার, কিন্তু এমনও হতে পারে যে অজান্তেই কিছু জেনে বসে আছে।"

"এর সাথে মার্সিডিজের সম্পর্ক কী?"

"কিছুই না। অনুমান মাত্র। তাছাড়া তোমার মনে কি প্রশ্ন জাগছে না যে কিভাবে একজন কৃষক একটা মার্সিডিজ কেনার অর্থ পেল? দেখ গিয়ে, কাগজে কলমে হয়ত মার্সিডিজের বদলে ট্রাক্টর লেখা।"

কৃষানইস্তা পুলিশ স্টেশনের সামনে গাড়ি পার্ক করল নাসলুন্ড। এমন সময় শুরু হলো শিলাবৃষ্টি। মৌসুমে প্রথমবারের মতো গলাব্যথা অনুভব করল ওয়ালান্ডার। শঙ্কিত হয়ে পড়ল সে। না না, এখন অসুস্থ হওয়া যাবে না। অসুস্থ অবস্থায় মোনার মুখোমুখি হতে চাই না।

কৃষানইস্তা পুলিশের সাথে ইস্তা পুলিশের সম্পর্ক সম্পূর্ণই পেশাগত। তবে বেশ কয়েকজন অফিসারের সাথে ওয়ালান্ডারের ব্যক্তিগত খাতির রয়েছে। বিশেষ করে সমবয়সী গোরান বোম্যানের সাথে সম্পর্কটা বন্ধুত্বপূর্ণ। দুজনেই ন্যাশনাল পুলিশের শিক্ষা ডিপার্টমেন্টের আছজিত একদিন ব্যাপী কর্মশালায় অংশ নিয়েছিল সেবার। নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রের স্টাফ পলিসি কী করে আরও উন্নত করা যায়, এটাই ছিল কর্মশালার বিষয়। পরিচয়পর্বটা ওখানেই। সন্ধ্যায় টাইলোস্যান্ডে হুইস্কির বোতল শেয়ার করতে গিয়ে আবিষ্কার করে ওদের দুজনের গল্পে অনেকখানি মিল। বিশেষ করে দুজনেই পিতার আদেশ অমান্য করে যোগ দিয়েছে পুলিশ বাহিনীতে।

স্টেশনে ঢুকতে গিয়ে বোম্যানের চেহারা ভেসে উঠল ওয়ালান্ডারের মনে। সে এখন ডিউটিতে থাকলেই হয়।

রিসিপশনে উপস্থিত হলো ওয়ালান্ডার আর নাসলুন্ড। সুইচবোর্ডে বসে থাকা তরুণী জানালো, গোরান বোম্যান ডিউটিতেই আছে।

"একটা ইন্টারভিউতে আছেন তিনি এখন," বলল তরুণী। "তবে বেশিক্ষণ লাগবে না শেষ হতে।"

মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করে টয়লেটে চলে এল ওয়ালান্ডার। আয়নায় নিজের চেহারা দেখে আরেকটু হলেই হার্ট অ্যাটাক করত। লাল কালশিটে দাগের কারণে চেনাই দায়। ঠান্ডা পানিতে মুখ ভেজালো সে। এমন সময় করিডর থেকে শুনতে পেল বোম্যানের কণ্ঠ।

কোলাকুলি করল দুই বন্ধুতে। অনেক দিন পর সাক্ষাৎ হওয়ায় খুশি হলো দুজনে। কফি নিয়ে চলে এল বোম্যানের অফিসে। ঢুকতেই ওয়ালান্ডারের নজর গেল বোম্যানের ডেস্কে। দেখতে ওরটার মতোই। তবে বোম্যানের কামরা বেশ গোছালো। দেখে অ্যানেট ব্রোলিনের অফিসের কথা মনে পড়ে গেল ওর।

সবই জানা আছে বোম্যানের। লুনাপের জোড়াখুন, শিবিরে আগুন, এমনকি পত্রিকায় রঙ চড়িয়ে ছাপা হওয়া ওয়ালান্ডারের সাহসী কীর্তি। শরণার্থীদের নিয়ে কথা বলল দুজনে কিছুক্ষণ। ওয়ালান্ডারের সাথে সহমত প্রকাশ করল বোম্যান। যথাযথ ব্যবস্থাপনার অভাব রয়েছে শরণার্থী শিবিরগুলোতে। অবৈধ অভিবাসীদের নিয়ে বেকায়দায় পড়তে হচ্ছে কৃষানইস্তার পুলিশদেরও। এই তো, ক্রিসমাসের কয়েক সপ্তাহ আগেও বলা হলো যে কয়েকজন বুলগেরিয়ান নাগরিককে বের করে দিতে হবে। ইমিগ্রেশন সার্ভিসের রেকর্ড অনুযায়ি, কৃষানইস্তার একটা ক্যাম্পে বাস করছে তারা। দিনকয়েক গরু খোঁজা হয়রানির পর কৃষানইস্তা নয়, আরও এক হাজার কিলোমিটার দক্ষিণে, আরিয়েপ্লুগের এক শিবিরে সন্ধান পাওয়া গেল ওই বুলগেরিয়ানদের।

এরপর মূল কথায় চলে এল ওয়ালান্ডার। বিস্তারিত জানালো বোম্যানকে।

"তুমি চাইছো আমরা যাতে ওই মহিলাকে খুঁজে বের করি," শোনা শেষে বলল বোম্যান।

"খুব উপকার হয় তাতে।"

এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল নাসলুন্ড।

"আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছ," মুখ খুলল অবশেষে। "ইয়োহানেস লভগ্রেন আর তার এই রক্ষিতার যদি সত্যিই কোন সন্তান থেকে থাকে, আর আমরা যদি ধরে নেই ওই ছেলে এই শহরেই জন্মগ্রহণ করেছে, তা নিশ্চয় শহরের রেকর্ডে উল্লেখ থাকবে। সন্তানের পিতা হিসেবে লভগ্রেনের নামই থাকবে, তাই না?"

মাথা দুলিয়ে সায় জানালো ওয়ালান্ডার। "তাছাড়া হার্ডিনের কথা যদি সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে ছেলেটার জন্ম হয়েছে ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৭ এর মধ্যে। এই দশ বছরের রেকর্ড খুঁজলেই হয়ত পেয়ে যাব ওই মহিলার পরিচয়।"

"দশ বছরে কৃষানইস্তায় কতজন জন্ম নিয়েছিল কে জানে," বলল বোম্যান। "কম্পিউটার না থাকলে ঘাম ছুটে যেত খুঁজতে খুঁজতে।"

"এমনও হতে পারে যে ছেলেটার পিতৃ পরিচয় হয়ত উহ্য রাখা হয়েছে রেকর্ডে," বলল ওয়ালান্ডার। "সবদিক বিবেচনা করে সতর্কতার সাথে এগোতে হবে আমাদের।"

"মহিলার খোঁজ চেয়ে বিজ্ঞপ্তি দিলে কেমন হয়?" বলল বোম্যান।

"আমি নিশ্চিত লাভ হবে না," বলল ওয়ালান্ডার। "আমার মন বলছে, বিজ্ঞপ্তি দেখলেও যোগাযোগ করবে না মহিলা। জিজ্ঞেস কর না কেন এমন মনে হচ্ছে। কারণ দেখাতে পারব না। তবে আপাতত এই রাস্তায় না হাঁটি।"

"চিন্তা কর না," আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল বোম্যান। "খুঁজে পাওয়া যাবেই। এই যুগে হারিয়ে যাওয়া অসম্ভব। অবশ্য চেহারা বিকৃত হয়ে যায় এমনভাবে আত্মহত্যা করলে ভিন্ন কথা। এরকম একটা কেস হাতে এসেছিল গত গ্রীষ্মে। স্ত্রী এসে রিপোর্ট করে যে তার স্বামীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সেই সাথে গায়েব তাদের নৌকা। স্বামীটাকে আমরা খুঁজে পাইনি। মনে হয় না পাওয়া যাবে কখনও। আমার ধারণা, নৌকা নিয়ে সাগরে চলে গিয়েছিল লোকটা। তারপর নৌকা ফুটো করে আত্মহত্যা করে। তবে এই মহিলা আর তার সন্তানের যদি অস্তিত্ব থেকে থাকে, খুঁজে বের করব আমরা। এখনই একজন অফিসারকে এই কাজের দায়িত্ব দিচ্ছি।"

গলার ব্যথাটা বাড়ছে ওয়ালান্ডারের। ঘামাতে শুরু করেছে এই ঠান্ডার মাঝে। ইচ্ছা ছিল কেসটা নিয়ে বোম্যানের সাথে আরও কিছুক্ষণ আলাপ করার। বোম্যানের মতো একজন দক্ষ পুলিশ অফিসারের মতামত কাজে লাগতে পারে। কিন্তু আচমকাই নিজেকে বড্ড ক্লান্ত মনে হচ্ছে ওর। দ্রুত বাদবাকি আলাপ সেরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিল।

গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল বোম্যান। "আমরা খুঁজে বের করব ওই মহিলাকে। টেনশন কর না।"

"আরেকবার তোমার সাথে বসতে পারলে ভালো হত," বলল ওয়ালান্ডার। "নিরিবিলি কোন স্থানে। সাথে হুইস্কি।"

মাথা দোলাল বোম্যান। "চলে এসো সময় করে।"

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে এখন অবধি। বরফের আকারে নেমে আসছে জমাটবদ্ধ তুষার। ওয়ালান্ডারের মনে হলো, জুতো ভেদ করে ঢুকে যাচ্ছে বরফশীতল জল। পূর্বের মতোই পেছনের সিটে উঠে বসল সে। আর ঘুমিয়ে পড়ল শীঘ্রই।

ঘুম ভাঙল নাসলুন্ড যখন ইস্তা পুলিশ স্টেশনের প্রাঙ্গনে এসে গাড়ি থামালো। গায়ে জ্বর জ্বর ভাব। এবার থেকে কয়েকটা অ্যাসপিরিন চেয়ে নিল সে। জানে, বাসায় গিয়ে একটা ঘুম দেয়া দরকার। কিন্তু তদন্ত কত দূর এগোলো জানার তর সইছে না। তাছাড়া শরণার্থীদের নিরাপত্তা নিয়ে রিডবার্গ কী ভেবেছে, তাও জানা দরকার।

ডেস্কে এক গাদা ফোন মেসেজ পড়ে থাকতে দেখল ওয়ালান্ডার। প্রেরকদের মধ্যে ওর বাবা আর অ্যানেট ব্রোলিনের নাম থাকলেও লিন্ডার নাম নেই। কিংবা স্টেনের। মেসেজ গুলোয় একবার চোখ বুলালো সে। তারপর ওর বাবা আর অ্যানেট ব্রোলিনেরটা বাদে সরিয়ে রাখল বাকিগুলো। এরপর ফোন দিল মার্টিনসনকে।

"মনে হয় পেয়ে গেছি গাড়িটা," বলল মার্টিনসন। "যেরকম বর্ণনা দিয়েছিলাম, গত সপ্তাহে অ্যাভিস রেন্ট-আ-কার এর ইয়োতেবরিয়া অফিস থেকে ওরকম একটা গাড়ি ভাড়া নেয়া হয়েছিল। পরে আর ফেরত দেয়া হয়নি। তবে একটা বিষয় মিলছে না।"

"কী?"

"গাড়িটা ভাড়া নিয়েছিল এক মহিলা।"

"এতে না মেলার কী আছে?"

"একজন মহিলা দুজন বুড়োবুড়ির খুনের সাথে জড়িত, এটা আমি মানতে পারছি না।"

"তোমার মানা বা না মানাতে কিছু যায়-আসে না। গাড়িটা আর এর চালককে খুঁজে বের করতে হবে আমাদের। হোক সে পুরুষ বা মহিলা, তদন্তে সবাই সমান। আর গাড়িটার রেজিস্ট্রেশন নম্বর লরি চালককে দেখাবে। হয়ত চিনতে পারবে সে।"

ফোন রেখে রিডবার্গের অফিসে চলে এল ওয়ালান্ডার।

"কেমন চলছে?"

ব্যাজার মুখে তাকাল রিডবার্গ। তবে যেমনটা ওয়ালান্ডার ভেবেছিল, কাজে অবহেলা করেনি সে। প্রত্যেকটা শিবিরের অবস্থান নির্ণয়সহ সেগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনাও লিখে রেখেছে। আর নিরাপত্তার খাতিরে, তার মতে, নিয়ম করে শিবির গুলোতে রাতের বেলা পাহারা বসানো উচিত।

"ঠিক আছে," রাজি হলো ওয়ালান্ডার। "তবে যারা পাহারা দিতে যাবে, বলে দিবে কাজে যেন গাফিলতি না করে।"

এরপর রিডবার্গকে কৃষানইস্তার পরিস্থিতি জানালো সে।

"আমি বাসায় যাচ্ছি," উঠে দাঁড়ালো বলা শেষে।

"তোমাকে অসুস্থ দেখাচ্ছে।"

"ঠান্ডা লেগেছে মনে হয়। তবে এখন এসব নিয়ে ভাববার সময় নেই।"

বাসায় ফিরে চা বানালো ওয়ালান্ডার। তারপর সোজা খাটে। ঘুম থেকে উঠে দেখে, চা ভর্তি কাপ পড়ে আছে খাটের পাশে। ভুলে গিয়েছিল খেতে।

চমৎকার ঘুম হওয়াতে আগের চেয়ে কিছুটা ভালো বোধ করছে এখন। উঠে ঠান্ডা চা ফেলে দিল সে। তারপর কফি বানিয়ে ফোন দিল ওর বাবাকে।

"তোমার না তাস খেলতে আসার কথা?" কড়া সুরে বলল ওর বাবা।

"আমি অসুস্থ," বলল ওয়ালান্ডার।

"অসুস্থ? তোমার তো কখনও অসুখ হতে দেখিনি।"

"ঠান্ডা লেগেছে।"

"ঠান্ডা লাগাটা অসুখ?"

"সবাই আপনার মতো সবল না।"

"কী বলতে চাচ্ছ তুমি?"

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ওয়ালান্ডার। এখনই কথা না ঘুরাতে পারলে পরিণতি হবে ভয়াবহ।

"আগামীকাল আপনার ওখানে যাব। আটটার দিকে। ঘুম থেকে উঠেন কয়টায়?"

"চারটার পর আমি আর ঘুমাই না।"

"কিন্তু আমি ঘুমাই।"

বিদায় জানিয়ে ফোন রেখে দিল ওয়ালান্ডার। আর আফসোস করল বাবাকে দেয়া কথাটার জন্য। দিনের শুরুটা যদি হয় ওর বাবার ঘ্যানঘ্যানানি শুনে, বাকি দিনটা কেমন যাবে কে জানে।

নিজের কামরায় চোখ বুলালো সে। ধুলোর পুরু স্তর জমেছে সর্বত্র। যদিও মাঝে মাঝেই বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করে দেয়, তবুও কেমন স্যাঁতসেঁতে গন্ধ বিরাজ করছে।

স্বপ্নে দেখা কৃষ্ণাঙ্গ নারীর কথা মনে পড়ল ওর। কে এই রমণী? আগে কি কোথাও দেখেছে তাকে বাস্তবে? পত্রিকার পাতায় বা টিভিতে?

স্বপ্নে কেন এতটা কামুক হয়ে পড়ে ভেবে পেল না সে। মোনার সাথে তো এমন হত না। চিন্তার সূত্র ধরে হাজির হলো অ্যানেট ব্রোলিন। তার কথা ভাবতেই উত্তেজিত হয়ে পড়ল ওয়ালান্ডার। ফোন দিতে ইচ্ছে হলো ব্রোলিনকে, কিন্তু নিজেকে নিরস্ত করল সে। রাগ হতে লাগল অকারণেই। টিভি ছেড়ে ধপ করে বসে পড়ল সোফায়। একটা ড্যানিশ চ্যানেলে তখন সবে খবর শুরু হবে।

শিরোনামগুলো পড়ে যেতে লাগল উপস্থাপিকা। আরেকটা দুর্ভিক্ষ। রোমানিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছে বিশৃঙ্খলা। ওডেন্সে চোরাই ড্রাগস আটক। টিভি বন্ধ করে দিল ওয়ালান্ডার। খারাপ সংবাদ শুনতে শুনতে পচে গেছে কান।

মোনার কথা ভাবার চেষ্টা করল সে। অবাক হয়ে আবিষ্কার করল, আগের মতো মোনার অভাব অনুভব করছে না আর। হয়ত একসময় ভুলেই যাবে। স্বাভাবিক হয়ে যাবে সব। কিন্তু তার নিশ্চয়তা কী? কোন নিশ্চয়তা নেই। নিজের সাথে প্রতারণা করছে সে।

অস্থির মন নিয়ে রান্নাঘরে চলে এল ওয়ালান্ডার। একটা গ্লাস জুস নিয়ে গিলে ফেলল ঢকঢক করে। তারপর টেবিলে বসে তদন্তের বর্তমান অবস্থা নিয়ে রিপোর্ট লিখতে লাগল। লেখা শেষ করে যত নোট আছে সব ছড়িয়ে দিল টেবিলের ওপর। একেকটা নোট যেন পাজেলের বিভিন্ন টুকরা। কেন যেন মনে হচ্ছে ওর, সমাধানের দ্বারপ্রান্তে চলে এসেছে।

নির্দিষ্ট কাউকে অভিযুক্ত করা অবশ্য সম্ভব হচ্ছে না এখনও। অভিযুক্ত করা তো দূরের কথা, সন্দেহও করা যাচ্ছে না কাউকে। ভাবনাটা অস্বস্তিতে ফেলে দিল ওকে। এ পর্যন্ত অনেক জটিল কেসের মুখোমুখি হয়েছে সে। প্রথমদিকে সুরাহার আশা জাগলেও শেষ পর্যন্ত কানাগলিতে গিয়ে থেমে যেতে হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। অসমাপ্তের তালিকায় নাম লিখিয়েছে ওই কেসগুলো।

ধৈর্য ধরতে হবে, নিজেকে মনে করিয়ে দিল ওয়ালান্ডার।

অ্যানেট ব্রোলিনকে ফোন দেওয়ার কথা ভাবল আরেকবার। কিন্তু কী বলবে কল দিয়ে? তার স্বামী যদি ফোন ধরে?

আবারও টিভি ছাড়ল সে। হতভম্ব হয়ে নিজেকে দেখতে পেল পর্দায়। উপস্থাপিকার কণ্ঠ কানে এল ওর। তীর্যক সুরে যা বলল তার সারমর্ম এই যে, শরণার্থীদের নিরাপত্তা নিয়ে ওয়ালান্ডার ও তার পুলিশ বাহিনী একেবারেই উদাসীন।

ওয়ালান্ডারের ছবি উধাও হয়ে গেল। পর্দায় দেখা গেল এক নারীকে। নিচে ছোট্ট করে ফুটে উঠা নাম দেখে মহিলাকে চিনতে পারল ওয়ালান্ডার। আজই ফোনে কথা হয়েছে তার সাথে। ইমিগ্রেশন সার্ভিসের প্রধান।

"পুলিশের অমন উদাসীনতা বর্ণবাদী আচরণের দিকে নির্দেশ করে," সাংবাদিকদের বলল মহিলা।

তিক্ততায় ভরে গেল ওয়ালান্ডারের মন। শালী, গালি দিল সে। এভাবে মিথ্যা বলে কিভাবে এরা? আর মরার সাংবাদিকগুলোই বা কেন আমার সাথে যোগাযোগ করেনি? শরণার্থীদের নিরাপত্তার জন্য রিডবার্গের প্ল্যানের কথা বলতে পারতাম ওদের। আমাদের বলে কিনা বর্ণবাদী?

রাগে ফুঁসতে লাগল সে। এমন সময় বেজে উঠল ফোন। প্রথমে ধরবে না ভেবেও, পরমুহূর্তে হলে গিয়ে তুলে নিল রিসিভার।

সেই একই কণ্ঠে। তবে এবার কিছুটা রুক্ষ, আড়ষ্ট। মাউথপিসে কাপড় ধরে রেখেছে বলে ধারণা করল ওয়ালান্ডার।

"আমরা অপেক্ষা করছি ফলাফলের জন্য," বলল পুরুষ কণ্ঠটা।

"গোল্লায় যাও!" গর্জে উঠল ওয়ালান্ডার।

"শনিবার পর্যন্ত সময় দেয়া হলো।"

"তোরাই কি গতকাল রাতে আগুন দিয়েছিলি, শুয়োরের বাচ্চা?" চিৎকার করে বলল ওয়ালান্ডার।

"শনিবার। মনে থাকে যেন," ভাবলেশহীন গলায় বলল লোকটা।

তারপর কেটে গেল কল।

পেটের ভেতর পাক দিয়ে উঠল ওয়ালান্ডারের। কু ডাকছে ওর মনে। অশনি সংকেত। কিছুতেই তাড়াতে পারছে না মন থেকে। ছড়িয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে পুরো শরীরে।

এবার ভয় পেয়েছ তুমি, ভাবল সে। এবার ভয় পেয়েছে কার্ট ওয়ালান্ডার।

রান্নাঘরে গিয়ে জানালার পাশে দাঁড়াল সে। তাকাল বাইরের রাস্তায়। বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে। মূর্তির ন্যায় স্থির স্ট্রিটলাইট।

কিছু একটা ঘটবে, সে নিশ্চিত। কিন্তু কী? কোথায়?

আট

সকালবেলা সবচেয়ে ভালো স্যুটটা বের করে আনল ওয়ালান্ডার। কিন্তু ল্যাপেলে একটা দাগ দেখতে পেয়ে অসহায় বোধ করল।

সাথে সাথেই মনে পড়ল এবার কথা। একমাত্রই এবাই পারবে আমাকে উদ্ধার করতে, মনে হলো ওর। যখন শুনবে যে মোনার সাথে দেখা করতে যাব, ও সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে দাগটা দুর করতে। এবা মনে করে, অপরাধ বৃদ্ধির চেয়ে পারিবারিক বিচ্ছেদ সমাজের জন্য বড় হুমকিস্বরুপ।

বেরিয়ে এল ওয়ালান্ডার। আকাশে পুরু মেঘের চাদর দেখে আশঙ্কা করল তুষারপাতের। স্যুটটা গাড়ির পেছনের সিটে রেখে দিল সে। তারপর রওনা হলো স্টেশনের উদ্দেশ্যে। ধীর গতিতে গাড়ি চালালো পুবদিকে। সান্দস্কুগেনের মধ্য দিয়ে, পরিত্যক্ত গলফ কোর্স পাশ কাটিয়ে মোড় নিল খুসবেরিয়ার দিকে।

অনেক দিন পর আজ মনের শান্তি মিটিয়ে ঘুমিয়েছে সে। টানা নয় ঘন্টা। কপালের ফুলে যাওয়া কমতে শুরু করেছে এরিমধ্যে। হাতের ক্ষতস্থানেও আগের মতো জ্বালাপোড়া করে না।

মনে মনে গতকাল রাতে লিখে রাখা সারমর্ম একবার ঝালিয়ে নিল ওয়ালান্ডার। লভগ্রেনের রক্ষিতাকে খুঁজে বের করাটাই এখন মুখ্য। আর তাদের সন্তান। এদের খুঁজে পেলেই পাওয়া যাবে খুনিদের। ওই সাতাশ হাজার ক্রোনারের সাথে খুনের যোগসাজশ আছে। হয়ত লভগ্রেনের অন্য সম্পত্তির সাথেও আছে। খুন যারা করেছে, তারা জানতো লভগ্রেনের অঢেল সম্পত্তির কথা। জানতো যে প্রতি রাতে ঘোড়াটাকে খড় দিতেন লভগ্রেন। ইয়োহানেস লভগ্রেনের রুটিন জানা ছিল তাদের।

কিন্তু খাপে মিলছে না ইয়োতেবোরিয়া থেকে ভাড়া নেয়া গাড়িটা। হয়ত এই কেসের সাথে ওটার কোন সম্পর্কই নেই। ঘড়ি দেখল ওয়ালান্ডার। সাতটা বেজে চল্লিশ। বৃহস্পতিবার, ১১ই জানুয়ারি।

সরাসরি বাবার বাড়িতে না গিয়ে কয়েক কিলোমিটার সামনে এগিয়ে গেল সে। চাকার নিচে নুড়ি বিছানো পথ বালির ডিবির বুক চিরে চলে গেছে বাকোকরার ডগ হামারখোন্দ ফার্মের দিকে। পার্কিং এরিয়ায় গাড়ি রেখে পাহাড় বেয়ে উঠে এল সে। সামনে যতদুর চোখ যায় বিস্তৃত সমুদ্র। পাথর দিয়ে বানানো একটা বৃত্ত আছে এখানে। বসানো হয়েছে কয়েক বছর আগে।

একাকীত্ব আর মনের শান্তির খোঁজে এখানে আসে মানুষ। একটা পাথরে বসে সাগরের দিকে মুখ করল ওয়ালান্ডার।

দর্শন বা মেডিটেশন কখনোই টানেনি ওকে। সত্যি বলতে কি, প্রয়োজন পড়েনি। জীবন ওর কাছে কিছু বাস্তবিক প্রশ্নের সামিল, যেগুলোর উত্তর খোঁজা হলো জীবনের উদ্দেশ্য। এরপর কী হবে তা অবশাম্ভী। দিনরাত ভেবে একাকার করে ফেললেও পাল্টানো যাবে না।

একাকীত্ব উপভোগ করার সাথে এসবের কোন সম্পর্ক নেই। মাথা থেকে সব চিন্তা ঝেঁটিয়ে বিদায় করা, কান পেতে শোনা, চোখ মেলে দেখা, চুপচাপ বসে থাকা-ক্ষণকালের জন্য একাকীত্ব শান্তির পরশ বুলিয়ে দেয় মনে।

দূরে ভেসে চলছে পালতোলা নৌকা। বাতাসে ডানা মেলে দিয়েছে বিশাল সামুদ্রিক পাখি। সুনসান নীরবতা চারদিকে। দশ মিনিট পর গাড়িতে ফিরে চলল ওয়ালান্ডার।

সে যখন প্রবেশ করল, ওর বাবা তখন স্টুডিওতে। ছবি আঁকছে একমনে। এই ছবিটাতে থাকবে গ্রাউস পাখি। ওয়ালান্ডারের ওপর চোখ বুলালেন ওর বাবা। দুর্গন্ধ বের হচ্ছে তার গা থেকে। সারা গায়ে ময়লা।

"কেন এসেছ?" জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

"আসার কথা ছিল তাই।"

"আটটা তো বেজে গেছে অনেক আগে।"

"মাত্র এগারো মিনিট দেরি করেছি।"

"সময়জ্ঞান যদি না থাকে, পুলিশ অফিসার হয়েছো কী করতে?"

উত্তর দিল না ওয়ালান্ডার। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলো, আজই ওর বোন ক্রিস্টিনাকে ফোন দিবে। জানাবে ওদের পিতার দুরাবস্থার কথা। সে জানতো যে বুড়ো বয়সে বুদ্ধি লোপ পেতে থাকে। তবে তা যে এত দ্রুত গতিতে, ধারণা করতে পারেনি।

তুলি দিয়ে প্যালেটে রঙ খুঁজছেন ওর বাবা। ভীমরতি ধরলেও তার হাতজোড়া এখন অবধি স্থির। লাল রঙে তুলি চোবালেন তিনি। তারপর আঁকতে লাগলেন গ্রাউস পাখির ঝুঁটি।

পুরনো টোবাগ্যানে বসে দেখতে লাগল ওয়ালান্ডার। ওর বাবার শরীর থেকে আসা দুর্গন্ধ মনে করিয়ে দিল পুরনো এক স্মৃতি। মোনাকে নিয়ে প্যারিসে হানিমুনে যাওয়ার স্মৃতি। প্যারিস মেট্রোর বেঞ্চে শুয়ে থাকা এক লোকের গা থেকে এমন বাজে গন্ধ আসছিল।

আমার কিছু বলা উচিত, ভাবল সে। যদিও আমার বাবা এখন একজন শিশুর মতোই অসহায়, তবুও তাকে কিছুই বুঝতে দেয়া চলবে না।

তখনও এঁকে চলেছেন ওর বাবা। কতবার একেঁছেন এই একই ছবি? ভেবে কূল পেল না ওয়ালান্ডার। কোন কারণ ছাড়াই ৭০০০ সংখ্যাটা ভেসে উঠল ওর মাথায়। ৭০০০ সূর্যাস্তের ছবি এঁকেছেন ওর বাবা।

উঠে কেরসিন স্টোভে চড়ানো কেটলি থেকে কফি ঢেলে নিল ওয়ালান্ডার।

"আপনার শরীর এখন কেমন?" জিজ্ঞেস করল পিতাকে।

"এই বয়সে এসে যেমন থাকার কথা," রুক্ষ সুরে জবাব দিলেন ওর বাবা।

"রিটায়ারমেন্ট হোমে যাওয়ার কথা ভেবেছেন কিছু?"

হাতের তুলিটা অস্ত্রের ভঙ্গিতে তাক করে শাসালেন বুড়ো। "তুমি কি আমাকে মেরে ফেলতে চাইছো?"

"তা কেন হবে! আপনার ভালোর জন্যই বলছি।"

"রিটায়ারমেন্ট হোমে গিয়ে একগাদা বুড়ো-বুড়ির সাথে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব না। তাছাড়া সেখানে ওরা আমাকে ছবি আঁকতে দিবে না।"

"নিজের জন্য আলাদা ফ্ল্যাট নেবেন তাহলে।"

"কানা হয়ে গেলে নাকি? আমার নিজের যে বাড়ি আছে, দেখছ না? নাকি এতটাই অসুস্থ পড়েছ?"

"সামান্য ঠান্ডা লেগেছে শুধু।"

ওই মুহূর্তে ওয়ালান্ডারের মনে হলো, অসুস্থ হবে না সে। আগেও এমন হয়েছে। কাজে ডুবে থাকলে অসুস্থ হওয়ারও সময় পায় না। তারপর তদন্ত যখন শেষ হয়, নড়তে পারে না বিছানা থেকে।

"মোনার সাথে দেখা করতে যাচ্ছি আজ রাতে," বলল সে।

বৃদ্ধাশ্রম নিয়ে আপাতত কথা বলে লাভ হবে না। আগে ক্রিস্টিনার সাথে কথা বলতে হবে।

"সে যেহেতু তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে, তার পিছনে আর ঘুরঘুর কর না। ভুলে যাও।"

"মোনাকে ভুলে যাওয়া সম্ভব না।"

এখনও এঁকেই চলছেন ওর বাবা। আবির রঙে রাঙিয়ে দিচ্ছেন মেঘ।

"আপনার কিছু লাগবে?" জিজ্ঞেস করল ওয়ালান্ডার।

"চলে যাচ্ছ নাকি?" না তাকিয়েই জিজ্ঞেস করলেন ওর বাবা। কণ্ঠে ভৎসর্না।

অপরাধবোধ জাগলো ওয়ালান্ডারের মনে। তবে চাপা দেয়ার চেষ্টা করল না সে। জানে লাভ হবে না।

"অনেক কাজ জমে আছে," বলল সাফাই গাওয়ার সুরে। "আমি এখন ভারপ্রাপ্ত চিফ। জোড়াখুনের একটা কেস ঝুলে আছে মাথার ওপর।"

ঘোঁৎঘোঁৎ করল ওর বাবা। "পুলিশের চিফ। এটা কি আমাকে শোনানোর জন্য বললে?"

উঠে দাঁড়াল ওয়ালান্ডার। "পরে আবার আসব, বাবা। ডাস্টবিনের মতো করে রেখেছেন বাসাটা। একসাথে পরিষ্কার করব।"

হাতের তুলি মেঝেতে ফেলে দিয়ে মুষ্টি পাকিয়ে এগিয়ে এলেন ওর বাবা। তার আকস্মিক এমন আচরণে হতভম্ব হয়ে গেল ওয়ালান্ডার।

"কী ভেবেছ তুমি, অ্যাঁ?" গর্জে উঠলেন ওর বাবা। "আমার বাসায় এসে আমার বাসাকে ডাস্টবিন বলছ? শুনে রাখো, ছেলে, আমার বাসা পরিষ্কার করার জন্য একজন বুয়া আর একজন হাউসকিপার আছে। তাছাড়া শীতের ছুটিতে আমি রিমিনি যাচ্ছি। সেখানে আমার প্রদর্শনী চলবে। প্রতি ক্যানভাসের জন্য পঁচিশ হাজার ক্রোনার পাব আমি। আর কোথাকার তুমি এসেছ আমাকে বৃদ্ধাশ্রমের কথা শোনাতে। এত সহজে আমাকে মারতে পারবে না, এই আমি বলে দিলাম।"

স্টুডিও ছেড়ে বেরিয়ে ঠাস করে দরজাটা লাগিয়ে দিলেন পিছনে।

বুড়োর মাথাটা একেবারেই গেছে, ভাবল ওয়ালান্ডার। এসবের একটা বিহিত করা দরকার। সত্যি সত্যি কি ভাবেন নাকি যে তার বাসায় একজন কাজের বুয়া আর একজন হাউসকিপার আছে? যে ইতালিতে তার প্রদর্শনী হতে যাচ্ছে?

রান্নাঘর থেকে ঝনঝনানি কানে এল ওর। মেঝেতে প্লেট-পাতিল ছুড়ে ফেলার শব্দ।

গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল সে। বোন ক্রিস্টিনাকে ফোন করা ছাড়া উপায় নেই। একসাথে হয়ত পিতার কোন একটা গতি করতে পারবে ওরা।

নয়টার দিকে স্টেশনে প্রবেশ করল ওয়ালান্ডার। স্যুটটা দেখালে এবা জানালো, বিকালের মধ্যেই দাগটা পরিষ্কার করে দিবে।

দশটার দিকে মিটিং ডাকলো ওয়ালান্ডার। গতকাল রাতের খবরটা নিয়ে চলল তুমুল সমালোচনা। সবাই একমত হলো যে ওয়ালান্ডারের উচিত মিডিয়া ডেকে কড়া ভাষায় জবাব দেয়া।

"চীফ অফ ন্যাশনাল পুলিস কেন কিছু বলছেন না?" বিস্ময় প্রকাশ করল মার্টিনসন।

তার প্রশ্নের উত্তরে হাসলো বাকিরা।

"ওই ব্যাটা নিজের স্বার্থ ছাড়া মুখ খুলে না," বলল রিডবার্গ। "প্রদেশের পুলিশ কী করছে, কেমন করছে তা নিয়ে তার মাথাব্যথা নাই।"

নতুন করে কিছু ঘটেনি যা তদন্তে গতি এনে দিতে পারে। পুরনো তথ্যগুলো তাই বারবার যাচাই করে দেখছে সবাই। একটা বিষয়ে ওরা একমত যে কৃষানইস্তার ওই রহস্যময়ী নারী আর তার সন্তানকে খুঁজে পাওয়াটাই হলো বর্তমানে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এবং একমাত্র সূত্র। এই জোড়াখুনের পেছনে যে অর্থসম্পত্তি জড়িয়ে আছে তাতে সন্দেহ নেই কারও। শরণার্থী শিবিরগুলো সম্পর্কে জানতে চাইল ওয়ালান্ডার।

"রাতের রিপোর্ট চেক করে দেখেছি আমি," জানালো রিডবার্গ। "কিছু ঘটেনি।"

"আগামীকাল শুক্রবার," বলল ওয়ালান্ডার। "গতকাল আবারও হুমকি দিয়ে ফোন এসেছিল। একই লোক। শনিবার পর্যন্ত ডেডলাইন দিয়েছে।"

ন্যাশনাল পুলিশের সাথে যোগাযোগের মত দিল রিডবার্গ। তারাই সিদ্ধান্ত নিক অতিরিক্ত জনবলের প্রয়োজন আছে কিনা।

"তাই করতে হবে দেখছি," সায় দিল ওয়ালান্ডার। "সাবধানের মার নেই। আর আমাদের নিজেদের জেলার শরণার্থী শিবিরে বাড়তি আরেকটা নাইট পেট্রলের ব্যবস্থা করতে হবে।"

"ওভারটাইম করতে হবে সেক্ষেত্রে," বলল হ্যানসন।

"জানি," বলল ওয়ালান্ডার। "এই বিশেষ নাইট পেট্রলে থাকবে পিটারস আর নরেন। আর কেউ একজন সবগুলো শিবিরের পরিচালকদের ফোন দিয়ে বলে দাও চোখকান খোলা রাখতে।"

মিটিং শেষ হলো এক ঘন্টা পর। অফিস খালি হয়ে গেলে সুইডিশ টেলিভিশনে প্রচারিত সংবাদের প্রতিবাদ বিজ্ঞপ্তি লিখতে বসল ওয়ালান্ডার।

এমন সময় বাজলো টেলিফোন। গোরান বোম্যান কল করেছে।

"গতকাল রাতে টিভিতে দেখলাম তোমাকে," বলল হাসতে হাসতে।

"মেজাজটা কেমন খারাপ হয় বল দেখি।"

"ঠিকই বলেছ। প্রতিবাদ করা উচিত তোমার।"

"এইমাত্র বিজ্ঞপ্তি লিখতে বসেছিলাম।"

"এই সাংবাদিকেরা যে কী চায় কে জানে।"

"চটকদার সংবাদ ছাড়া এরা আর কিছু বুঝে নাকি?"

"ভালো খবর আছে তোমার জন্য।"

মুহূর্তেই চাপা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল ওয়ালান্ডারের মনে। "খুঁজে পেয়েছ ওই মহিলাকে?"

"মনে হয়। কিছু কাগজ পাঠাচ্ছি ফ্যাক্স করে। সম্ভাব্য নয়জনকে খুঁজে পেয়েছি আমরা। তুমি একবার দেখ। তারপর ফোন করে জানাও কাকে দিয়ে শুরু করব।"

"অসাধারণ কাজ দেখালে, গোরান," বলল উচ্ছ্বসিত ওয়ালান্ডার। "আমি ফোন দিব তোমাকে।"

ফ্যাক্স মেশিন রিসিপশনে বসানো। ফ্যাক্স মেশিনের ট্রে থেকে কিছু কাগজ বের করে নিচ্ছিল এক তরুণী। একে আগে দেখেনি ওয়ালান্ডার।

"কার্ট ওয়ালান্ডার কে?" জিজ্ঞেস করল তরুণী।

"আমি," বলল ওয়ালান্ডার। "এবা কোথায়?"

"ড্রাই ক্লিনার্সে গেছে," জবাব দিল তরুণী।

এবাকে দিয়ে ব্যক্তিগত কাজ করিয়ে নেয়ায় লজ্জিত বোধ করল ওয়ালান্ডার।

মোট চারটা পৃষ্ঠা পাঠিয়েছে বোম্যান। নিজের অফিসে ফিরে গিয়ে ডেস্কের ওপর কাগজগুলো বিছিয়ে রাখল ওয়ালান্ডার। দেখে যেতে লাগল একের পর এক মহিলার ছবি, তাদের জন্ম তারিখ, তাদের পিতৃ পরিচয়হীন সন্তান জন্ম দেয়ার তারিখ। চারজনকে বাদ দিয়ে দিল এক নজরেই। বাকি থাকলো পাঁচজন, যাদের ছেলেরা জন্ম নিয়েছে ১৯৫০ সালে।

এই পাঁচজনের দুজন থাকে কৃষানইস্তায়, একজন গ্লেসাক্সে। বাকি দুজনের একজন থাকে স্ট্র্যামেসুন্দে, আরেকজন পাড়ি জমিয়েছে অস্ট্রেলিয়ায়। তদন্তের খাতিরে কাউকে বিশ্বের অন্যপ্রান্তে পাঠাতে হতে পারে ভেবে হাসলো ওয়ালান্ডার। একটু পরেই ফোন দিল গোরান বোম্যানকে।

"দেখে তো মনে হচ্ছে কাজ হবে," বলল সে। "যদি ভুল হয়ে না থাকে, তাহলে নয়জন থেকে চারজনকে বাদ দেয়া যায়।"

"বাকি পাঁচজনকে কি আমি স্টেশনে ডেকে পাঠাব?"

"না, আমি দেখছি বিষয়টা। তবে আমরা একসাথে কাজ করলে ভালো হত। যদি তোমার সময় হয় আরকি।"

"আজই নেমে পড়বে?"

ঘড়ি দেখল ওয়ালান্ডার। "আগামীকাল থেকে শুরু করলে কেমন হয়? আজ রাতে যদি কোন ঝামেলা না হয়, সকাল নয়টার মধ্যে পৌছে যাওয়ার চেষ্টা করব।"

কয়েক কথায় বোম্যানকে জানালো ফোনে আসা হুমকির কথা।

"শিবিরে যে আগুন দিয়েছে, তার সন্ধান পাওয়া গেছে?"

"এখনও না।"

"আমি তাহলে প্রস্তুত থাকব সকালে। আর সন্দেহভাজনদের জানিয়ে দিচ্ছি তারা কেউ যেন শহর ছেড়ে না যায়।"

"তোমার সাথে গ্লেসাক্সে দেখা করলে কেমন হয়?" বলল ওয়ালান্ডার।

"সকাল নয়টায় দেখা হচ্ছে তাহলে সিমরিশামের হোটেল সিভিয়াতে," বলল বোম্যান। "এক কাপ কফি দিয়ে দিন শুরু করব, কী বল?"

"ঠিক আছে। দেখা হবে তাহলে। আর ধন্যবাদ, বন্ধু। আমার জন্য কষ্ট করতে হলো তোমাকে।"

এবার তোদের পালা, শুয়োরের বাচ্চা, রিসিভার নামিয়ে মনে মনে বলল ওয়ালান্ডার। খচখচ করে লিখে ফেলল সুইডিশ টেলিভিশনের উদ্দেশ্যে চিঠিটা। ভদ্রতার ধার ধারলো না একরত্তি। আর সিদ্ধান্ত নিল, ইমিগ্রেশন সার্ভিস, অভিবাসন মন্ত্রণালয়, কাউন্টি চিফ অফ পুলিস আর চিফ অফ ন্যাশনাল পুলিসকেও পাঠাবে এক কপি করে।

করিডোরে দাঁড়িয়ে চিঠিটা পড়ে দেখলো রিডবার্গ।

"ভালো লিখেছ," বলল সে। "তবে এটাকে ওরা পাত্তা দিবে, এ আশা কর না। এই দেশের সাংবাদিকেরা, বিশেষ করে টিভির লোকেরা কখনও ভুল স্বীকার করবে না। ওরা কখনও ভুল করে না।"

টাইপ করার জন্য চিঠিটা দিয়ে ক্যান্টিনে চলে এল ওয়ালান্ডার। গলা ভেজানো দরকার। যদিও একটা বেজে গেছে, দুপুরে কী খাবে তা নিয়ে কিছু ভাবেনি। আগে ফোন মেসেজগুলো দেখা দরকার। তারপর নাহয় লাঞ্চের কথা ভাবা যাবে।

গতকাল রাতে যখন ফোনটা এসেছিল, ভয় পেয়েছিল সে। কিন্তু এখন তা বেমালুম উবে গেছে। যদি কিছু ঘটে, প্রস্তুত আছে পুলিশ।

স্টেন ওয়াইডেনের নম্বরে ফোন দিল সে। রিঙ হবার আগেই নামিয়ে রাখলো রিসিভার। এক আঁটি খড় খেতে একটা ঘোড়ার কত সময় লাগে, তা পরে জানলেও চলবে। তার বদলে কল দিল পাবলিক প্রোসিকিউটরের অফিসে। সুইচবোর্ডের মহিলা জানালো অফিসেই আছে অ্যানেট ব্রোলিন। কল কেটে দিয়ে বিল্ডিং অন্য পাশে চলে এল ওয়ালান্ডার। টোকা দিবার আগেই খুলে গেল দরজা।

"আমি লাঞ্চে যাচ্ছিলাম," ওয়ালান্ডারকে দেখতে পেয়ে বলল ব্রোলিন।

"আমি সাথে গেলে সমস্যা হবে?"

কয়েক মুহূর্ত সময় নিয়ে ভেবে দেখল ব্রোলিন। তারপর হেসে বলল, "সমস্যার কী আছে?"

ওয়ালান্ডারের কথা অনুযায়ি কন্টিনেন্টালে এল ওরা। সিট নিল জানালার পাশে। দুজনেই সল্টেড স্যামন অর্ডার দিল।

"গতকাল টিভিতে দেখলাম আপনাকে," বলল ব্রোলিন। "এরকম মিথ্যাচার করে কিভাবে এরা?"

শুনে ভালো লাগল ওয়ালান্ডারের। "ওদের আবার ন্যায়নীতি বোধ আছে নাকি? পুলিশ ভালো করলেও সমালোচনা ওরা করবেই। তদন্তের স্বার্থে যে মাঝে মাঝে তথ্য গোপন রাখতে হয়, এটুকু বোঝার মতো ঘিলু মাথায় নেই।"

ব্রোলিনকে তথ্য ফাঁসের কথাটা জানালো সে। মন দিয়ে শুনল ব্রোলিন। এই প্রথম প্রোসিকিউটরের ভাবগাম্ভীর্য আর পরিপাটি পোশাকের আড়ালের মানুষটাকে দেখতে পেল যেন ওয়ালান্ডার।

খাওয়া শেষে কফি অর্ডার করল ওরা।

"আপনার পরিবারও এখানে?" জিজ্ঞেস করল ওয়ালান্ডার।

"আমার স্বামী স্টকহোমে," জানালো ব্রোলিন। "আর বাচ্চারা এক বছরের আগে স্কুল পাল্টাবে না।"

হতাশা ফুটে উঠল ওয়ালান্ডারের চেহারায়। আশা করছিল যে হাতের আঙটি হয়ত বিয়ের আঙটি না।

ওয়েটার বিল নিয়ে এলে মিটিয়ে দিতে চাইল সে। বাঁধা দিল ব্রোলিন।

"আমারটা আমিই দিব।"

আবারও কফি অর্ডার করল ওরা।

"শহরটা সম্পর্কে বলুন," বলল ব্রোলিন। "বিগত কয়েক বছরের কিছু কেস ফাইলে চোখ বুলাচ্ছিলাম। স্টকহোমের তুলনায় এখানকার অবস্থা বেশ ভিন্ন।"

"আগের মতো নেই এখন," বলল ওয়ালান্ডার। "নগরায়ণ ক্রমেই গ্রাস করে নিচ্ছে সুইডেনের গ্রামীণ এলাকাগুলো। বিশ বছর আগেও এখানে মাদকদ্রব্যের অস্তিত্ব ছিল না। দশ বছর আগে ইস্তা আর সিমরিশামের মতো এলাকায় ড্রাগস প্রবেশ করলেও পুলিশের নিয়ন্ত্রণে ছিল তা। কিন্তু এখন তো ড্রাগসে বাজার সয়লাব। আজকাল কোন স্কেনিয়ান খামারের পাশ দিয়ে যাবার সন্দেহ জাগে যে ভেতরে লুকানো অ্যামফেটামিনের গুদাম আছে কিনা।"

"মারাত্মক অপরাধ তেমন হয় না এখানে," বলল ব্রোলিন। "অন্তত অতটা নির্মম হয় না।"

"হতে দেরি নেই," বলল ওয়ালান্ডার। "তিক্ত হলেও বলতে বাধ্য হচ্ছি। বড় শহর আর গ্রামীণ এলাকাগুলোর মাঝে সীমারেখা বলতে গেলে মুছেই গেছে। সংঘবদ্ধ অপরাধ বেড়ে চলছে মালমোতে। উন্মুক্ত সীমান্ত আর নিত্য ভিড় করা ফেরিগুলো আন্ডারওয়ার্ল্ডের জন্য নতুন দুয়ার খুলে দিয়েছে।"

"তাও, এখানকার নিস্তরঙ্গ পরিবেশের এক ধরণের শান্তি আছে যা স্টকহোমে কল্পনাও করা যায় না।"

কন্টিনেন্টাল ছেড়ে বেরিয়ে এল ওরা। স্টিকগতার কাছে গাড়ি পার্ক করেছিল ওয়ালান্ডার।

"এখানে পার্ক করার কি অনুমতি আছে?" জিজ্ঞেস করল ব্রোলিন।

"না," জবাব দিল ওয়ালান্ডার। "তবে টিকেট পেলে আমি জরিমানা দিয়ে দিই। অবশ্য না দিয়ে কোর্টে যাওয়ার অভিজ্ঞতা মন্দ হবে না।"

পুলিশ স্টেশনের দিকে রওনা হলো ওরা।

"ভাবছি কোন এক সন্ধ্যায় একসাথে ডিনার করলে কেমন হয়?" বলল ওয়ালান্ডার। "চারপাশটা ঘুরে দেখাতে পারি আপনাকে।"

"মন্দ হয় না," বলল ব্রোলিন।

"বাড়ি যান না?"

"প্রতি সপ্তাহে।"

"আর আপনার স্বামী-সন্তানেরা?"

"স্বামী সময় পেলেই চলে আসে। সন্তানেরা যখন ইচ্ছা হয়।"

ভালোবেসে ফেলেছি তোমাকে, মনে মনে বলল ওয়ালান্ডার। আজ রাতে যখন মোনার সাথে দেখা হবে জানাব তোমার কথা।

রিসিপশনে বিদায় নিল ওরা।

"সোমবার কেসটার অগ্রগতি সম্পর্কে জানাবো আপনাকে," বলল ওয়ালান্ডার। "হাতে কিছু সূত্র এসেছে।"

"অ্যারেস্ট করবার মতো কাউকে পেয়েছেন?"

"এখনও না। তবে ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট অনুসন্ধানে আপনার সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ।"

মাথা দোলাল ব্রোলিন। "সোমবার চেষ্টা করবেন দশটার আগে আসতে। এরপর আমি থাকব না। ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে ডিটেনশন হিয়ারিং আছে।"

শেষতক ঠিক হলো নয়টার দিকে যাবে ওয়ালান্ডার। ব্রোলিনকে করিডোরে হারিয়ে যেতে দেখল সে। তারপর অফিসে ফিরে এল প্রফুল্ল মনে।

অ্যানেট ব্রোলিন, বলল মনে মনে। লোকে বলে, কিছুই অসম্ভব নয়। সুতরাং যে কোন কিছুই ঘটতে পারে।

বাকি দিনটা কাটলো বিভিন্ন ইন্টারভিউগুলোর অনুলিপি পড়ে। পূর্ণাঙ্গ ময়নাতদন্তের রিপোর্টও চলে এসেছে। বয়স্ক দম্পতির ওপর যে নির্মম অত্যাচার চালানো হয়েছে, তার বর্ণনা পড়ে আরও একবার শিউরে উঠল সে। পড়ল লভগ্রেনের মেয়েদের আর লুনাপের মানুষজনের ইন্টারভিউ রিপোর্ট।

সব তথ্য একই। চিরায়ত ইয়োহানেস লভগ্রেনের দ্বৈত জীবন সম্পর্কে কারই ধারণা ছিল না। ১৯৪৩ এর শরতে একবার মারামারির অভিযোগে আদালতে যেতে হয়েছিল তাকে। পরে অবশ্য অব্যাহতি দেয়া হয়েছিল ওই অভিযোগ থেকে। অভিযোগপত্রের একটা কপি এখন ওয়ালান্ডারের হাতে। পুরোটা মনযোগ দিয়ে পড়ে দেখল সে। তুচ্ছ এক ঝগড়া সামান্য হাতাহাতিতে গড়িয়েছিল এরিক্সলুন্ডের এক কমিউনিটি সেন্টারে। এর প্রতিশোধ নিতেই কি খুন করা হয়েছে লভগ্রেনদের? নাহ, ধোপে টিকছে না মোটিভ।

স্যুট নিয়ে এল এবা।

"অনেক ধন্যবাদ, এবা," কৃতজ্ঞতার সুর ওয়ালান্ডারের কণ্ঠে।

"আশা করি চমৎকার একটা সময় কাটবে মোনার সাথে," হাসিমুখে বলল এবা।

শুনে ঢোক গিলল ওয়ালান্ডার। মন থেকেই কথাটা বলেছে এবা।

ফুটবল লটারি ফর্ম পূরণ, গাড়ি সার্ভিসিং করানোর অ্যাপয়েন্টমেন্ট ও পরের দিনের গুরুত্বপূর্ণ ইন্টারভিউর প্রস্তুতি নিতে নিতে বেজে গেল পাঁচটা। এছাড়া বিয়র্ককে দেয়ার জন্য একটা মেমো লেখার কথা যাতে ভুলে না যায়, একারণে রিমাইন্ডার লিখে নিল ওয়ালান্ডার।

পাঁচটার একটু পরে দরজায় হাজির হলো নাসলুন্ড। "এখনও যাননি? আমি আরও ভাবলাম বাসায় চলে গেছেন।"

"কেন? এমনটা ভাববার কারণ কী?"

"এবা বলল।"

এবা অনেক খেয়াল রাখে আমার, মুচকি হাসি ফুটল ওয়ালান্ডারের ঠোঁটে। আগামীকাল সিমরিশামে যাওয়ার আগে ওকে কিছু ফুল উপহার দিতে হবে।

কামরায় ঢুকে পড়ল নাসলুন্ড। "সময় হবে আপনার? কথা ছিল।"

"কী ব্যাপারে?"

"ক্লাস ম্যানসনের ব্যাপারে। বেশিক্ষণ লাগবে না।"

নামটা পরিচিত ঠেকলেও মনে করতে সময় লাগল ওয়ালান্ডারের।

"ওই ডাকাতটার কথা বলছ? দোকানে ডাকাতি করেছিল যে?"

"হ্যাঁ। যদিও ডাকাতির সময় তার মাথা ঢাকা ছিল, কিন্তু কব্জির ট্যাটু দেখে একজন সনাক্ত করতে পেরেছে তাকে। সন্দেহ নেই ডাকাতিটা ওরই কাজ। কিন্তু নতুন প্রোসিকিউটর তা মানতে নারাজ।"

কুঁচকে গেল ওয়ালান্ডারের ভুরু। "মানে?"

"উনি বলছেন সঠিকভাবে তদন্ত করা হয়নি।"

"করা হয়েছে কী?"

বিস্মিত দেখাল নাসলুন্ডকে।

"অন্য তদন্তগুলোকে যতটা গুরুত্ব দেয়া হয়, এটাকেও তাই দেয়া হয়েছে। কোন রকম অবহেলা করা হয়নি।"

"প্রসিকিউটর কী বলেছে?"

"বলেছেন উপর্যুক্ত প্রমাণ দেখাতে না পারলে উনি ডিটেনশন অর্ডার বাতিলের আবেদন করবেন। কোথাকার স্টকহোমের এক শালী এসে সবার ওপর ছড়ি ঘুরানোর চেষ্টা করছে।"

ভেতরে ভেতরে রেগে গেলেও প্রকাশ করল না ওয়ালান্ডার।

"পার থাকলে এমন সমস্যায় পড়তে হত না," বলল নাসলুন্ড। "এই শুয়োরের বাচ্চাটাই যে ডাকাতি করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।"

"রিপোর্ট কোথায়?" জিজ্ঞেস করল ওয়ালান্ডার।

"সুইয়েডবারকে দিয়েছি পড়ে দেখতে।"

"আমার এখানে রেখে দিবে। আগামীকাল সকালে দেখছি ব্যাপারটা।"

উঠে দাঁড়াল নাসলুন্ড। "ওই শালীর একটা বিহিত করা উচিত।"

"ঠিকই বলেছ," সায় জানালো ওয়ালান্ডার। "স্টকহোম থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসবে, আর যা বলবে তা আমরা মেনে নিব, তা হতে দেয়া যায় না।"

"জানতাম এমনটাই বলবেন আপনি," বলে চলে গেল নাসলুন্ড।

ডিনারে নিমন্ত্রণ জানানোর জন্য চমৎকার একটা অজুহাত, ভাবতে ভাবতে জ্যাকেট পরে নিল ওয়ালান্ডার। তারপর স্যুটটা হাতে নিয়ে লাইট নিভিয়ে দিল।

দ্রুত গোসল সেরে সাতটার আগেই মালমো পৌছে গেল সে। স্কুটরিয়াতের কাছে গাড়ি পার্ক করে সিঁড়ি বেয়ে তড়তড়িয়ে নেমে গেল নকস ট্যাভার্নের দিকে। ভাবছে, মোনা পৌছানোর আগেই গিলে নেবে কয়েক ঢোক।

দাম বেশি হওয়া সত্ত্বেও একটা বড় হুইস্কির বোতল অর্ডার করল সে। কিন্তু প্রথম চুমুকই বসাতে পারল না ঠিকমতো। অসাবধানতায় ছলকে গিয়ে স্যুটে পড়ল হুইস্কি। এখন আবার দাগ পড়ে যাবে। আগে যেখানে দাগ ছিল, এবারও ঠিক একই জায়গায়। বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত আমার, মনে মনে নিজেকে ভৎসর্না করল ওয়ালান্ডার। সামান্য একটা গ্লাসও ধরতে পারছি না ঠিক মতো। তবে এটাও বুঝতে পারছে যে নার্ভাস হয়ে পড়েছে সে। মোনাকে প্রোপোজ করার পর এবারের দেখা করাটাই বোধ হয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ওর জীবনে। তবে এবার যাচ্ছে বিচ্ছেদ ঠেকাতে।

কিন্তু আসলে কী চায় সে? হাতে আছে দশ মিনিটের মতো। সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে এর মধ্যে। কী বলবে মোনাকে? আর মোনার প্রতিক্রিয়াই বা কেমন হবে?

পেপার ন্যাপকিন দিয়ে ল্যাপেল মুছে, গ্লাস খালি করে আরেকটা অর্ডার দিল ওয়ালান্ডার। ড্রিঙ্ক এলে গিলে ফেলল ঢকঢক করে। গলা দিয়ে নেমে যাওয়ার সময় পেটের ভেতর জ্বালিয়ে দিয়ে গেল তরল পানীয়। ঘামাতে শুরু করল সে। আশা করল, ওর মনের কথাগুলোই বলবে মোনা।

মোনাই বিচ্ছেদ চেয়েছিল। তাই ওরই এগিয়ে আসা উচিত এই বিচ্ছেদ ঠেকাতে।

বিল মিটিয়ে বেরিয়ে এল ওয়ালান্ডার। হাঁটতে লাগল ধীর পায়ে যাতে বেশি আগে পৌঁছে না যায়।

ভ্যালগতার কোণায় দাঁড়িয়ে সবুজ সিগন্যালের জন্য অপেক্ষা করতে করতে দুটো সিদ্ধান্ত নিল সে। লিন্ডার ব্যাপারে সিরিয়াস কিছু কথা বলবে মোনার সাথে। আর ওর বাবার অবস্থা জানিয়ে মতামত চাইবে। যদিও তাদের খুব একটা বনতো না, তবে শ্বশুরকে মোনা ভালো করেই জানে।

ক্রিস্টিনাকে ফোন করা উচিত ছিল, ভাবল ওয়ালান্ডার। হয়ত ইচ্ছা করেই ভুলে গিয়েছি আমি। ব্রিজের ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগল সে। তীব্র গতিতে পাশ কাটালো অল্প বয়স্ক ছেলেমেয়ে ভর্তি একটা গাড়ি। মাতাল একটা ছেলে জানালা দিয়ে বের করে চেঁচিয়ে কী যেন বলছে।

বিশ বছর আগেরকার কথা মনে পড়ল ওয়ালান্ডারের। এই এলাকাটা আগের মতোই আছে। কতবার হেঁটে গেছে এই ব্রিজের ওপর দিয়ে। তখন সে একজন তরুণ অফিসার। সাথে থাকতো একজন বয়স্ক সঙ্গী। দুজনে মিলে ঢু মেরে যেত রেল স্টেশনে। মাঝে মাঝে দুয়েকজন মদ্যপ বা টিকেটবিহীন যাত্রীকে নিয়ে গোলযোগ হত ঠিকই, তবে কখনোই গুরুতর অপরাধের মুখোমুখি হতে হয়নি।

ওই দিন আর নেই, ভাবল সে। ফিরে আসবে না কখনোই। সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে কখন স্টেশনে চলে এসেছে খেয়ালই করেনি। অনেক কিছুই পাল্টে গেছে, বদলায়নি শুধু পাথুরে মেঝে, বগির ঝকঝকানি আর ইঞ্জিনের ব্রেকের শব্দ।

এমন সময় নিজের মেয়েকে দেখতে পেল ওয়ালান্ডার। প্রথমে ভেবেছিল চোখের ভুল। স্টেন ওয়াইডেনের খামারে দেখা মেয়েটাও তো দেখতে প্রায় লিন্ডার মতোই। কিন্তু দ্বিধা কেটে গেল একটু পরেই। নাহ, লিন্ডাই। কুচকুচে কালো একটা লোকের পাশে দাঁড়িয়ে চেষ্টা করছে অটোম্যাটিক মেশিন থেকে

টিকেট বের করতে। লিন্ডার থেকে প্রায় দেড় ফিট লম্বা লোকটা। মাথাভর্তি কোঁকড়ানো চুল। গায়ে বেগুনি রঙের ওভারঅল।

আস্তে করে একটা পিলারের আড়ালে চলে গেল ওয়ালান্ডার। নজর রাখতে লাগল মেয়ের ওপর। কৃষ্ণাঙ্গ লোকটার বলা কথা শুনে হাসছে লিন্ডা। অনেক দিন পর মেয়েকে এভাবে হাসতে দেখল ওয়ালান্ডার।

এবং মন খারাপ হয়ে গেল মুহূর্তেই। এত কাছে থেকেও তবু কতটা দূরে সে এখন নিজের মেয়ে থেকে।

কী হাল আমার পরিবারের, ভাবল সে। রেল স্টেশনে দাঁড়িয়ে লুকিয়ে দেখছি নিজের মেয়েকে। আর স্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি একটা রেস্টুরেন্টে যাতে ডিভোর্স ঠেকাতে পারি।

ঝাপসা হয়ে এল ওর চোখ। বহু দিন পর পানি জমলো চোখের কোণায়।

কৃষ্ণাঙ্গ লোকটার সাথে প্লাটফর্মের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে লিন্ডা। হাত ধরে রেখেছে একে অপরের, হাসছে দুজনে। আড়ালে থেকে ওদের পিছু নিল ওয়ালান্ডার। দৌড়ে গিয়ে মেয়েকে আটকাতে ইচ্ছে হলো ওর। কিন্তু অনেক কষ্টে দমন করল নিজেকে। একটু পর নীল দরজার পেছনে হারিয়ে যেতে দেখল লিন্ডাকে। হিসহিস শব্দ তুলে প্লাটফর্ম ছেড়ে গেল ট্রেন।

মেয়ের হাসিমাখা মুখ কল্পনা করে সান্ত্বনা পেতে চাইল সে। অন্তত সুখে আছে মেয়েটা। তার বদলে নিজের দৈন্যদশা ক্ষতবিক্ষত করল ওকে। বেচারা ইন্সপেক্টর ওয়ালান্ডার আর তার করুণ দাম্পত্যজীবন।

দেরি হয়ে যাচ্ছে। মোনা হয়ত এতক্ষণে এসে ফিরেও গেছে। ভীষণ সময়ানুবর্তী সে। অপেক্ষায় রাখাটা একদমই পছন্দ করে না।

প্রায় দৌড়ে চলল ওয়ালান্ডার। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে হোঁচট খেলো রেস্টরেন্টের প্রবেশমুখে। টাকমাথার ডোরম্যান সন্দেহজনক দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে।

"কোথায় যাচ্ছেন?" জিজ্ঞেস করল সে।

জমে গেল ওয়ালান্ডার প্রশ্নটা শুনে। নিশ্চয় তাকে মাতাল ভাবছে ডোরম্যান। আর সেক্ষেত্রে কিছুতেই ঢুকতে দিবে না ভেতরে।

"আমার স্ত্রীর সাথে ডিনারে এসেছি," জবাব দিল সে।

"না, আমার তা মনে হয় না," বলল ডোরম্যান। "আপনার বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত।"

রক্ত মাথায় চড়ে গেল ওয়ালান্ডারের।

"আমি একজন পুলিশ অফিসার!" বলল চিৎকার করে। "আর যদি ভেবে থাকো তাহলে বলি, আমি মাতাল নই। এখন সরো। আমি রেগে যাওয়ার আগেই ভেতরে ঢুকতে দাও।"

"ভাগো এখান থেকে," বলল ডোরম্যান। "নইলে পুলিশ ডাকব।"

লোকটার মুখে একটা ঘুষি বসাতে ইচ্ছে হলো ওয়ালান্ডারের। দাঁতে দাঁত চেপে শান্ত করল নিজেকে। পকেট থেকে বের করে আনল তার আইডেন্টিটি কার্ড।

"আমি সত্যিই একজন পুলিশ অফিসার," বলল কার্ডটা বাড়িয়ে দিয়ে। "আর আমি মাতাল নই। হোঁচট খেয়েছিলাম সিঁড়িতে। আমার স্ত্রী অপেক্ষা করছে ভেতরে আমার জন্যে।"

কার্ডে চোখ বুলালো ডোরম্যান। তারপর একশো পাওয়ারের বাল্বের মতো জ্বলে উঠল তার মুখ।

"আরে, আপনাকে তো গতকাল রাতেই টিভিতে দেখেছি।"

অবশেষে একটা কাজে এল টিভি চ্যানেলগুলো, মনে মনে বলল ওয়ালান্ডার।

"আপনার সাথে আমি পুরোপুরি একমত," বলল ডোরম্যান।

"কোন বিষয়ে?"

"ওই নিগারদের বিষয়ে আরকি। আমিও মনে করি, ওগুলোকে ঢুকতে দেয়া উচিত না। কতগুলো খুনিকে কীভাবে দেশে ঢুকতে দিচ্ছে? সবগুলোকে লাথি মেরে বের করে দেয়া উচিত।"

এখন এই বিষয়ে কথা বলার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই ওয়ালান্ডারের। সুতরাং, হাসলো সে।

"ধন্যবাদ। তবে আমার এখন ভেতরে যাওয়া উচিত। আমার স্ত্রী অপেক্ষা করছে।"

দরজা মেলে ধরল ডোরম্যান। "আশা করি কিছু মনে করবেন না। বুঝতেই পারছেন সাবধান থাকতে হয় আমাদের।"

"কোনও সমস্যা নেই," জবাব দিয়ে হনহনিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল ওয়ালান্ডার।

কোট ঝুলিয়ে রেখে চারপাশে তাকাল সে। মোনাকে দেখতে পেল জানালার পাশের একটা টেবিলে বসে থাকতে। চুলে হাত বুলিয়ে, যতটা সম্ভব ফিটফাট হয়ে এগিয়ে গেল সে।

লাভ হলো না তবুও। মোনার চোখ এড়াল না ওয়ালান্ডারের ল্যাপেলের দাগ। একেবারে গোড়াতেই গলদ যাকে বলে। ক্ষেপে গেল ওয়ালান্ডার। চেষ্টা

করল ক্ষোভটুকু ঢেকে রাখতে। তবে নিশ্চিত হতে পারল না কতটুকু সফল হতে পেরেছে।

"হ্যালো," চেয়ারে বসতে গিয়ে বলল সে।

"বরাবরের মতোই দেরি করে এসেছ," বলল মোনা। "আর মোটা হয়ে গিয়েছ দেখছি।"

কথাটা আরও ক্ষেপিয়ে দিল ওয়ালান্ডারকে। ভালোমন্দ কিছু জিজ্ঞেস না করে অপমান দিয়েই যেন শুরু করতে হলো মোনার।

"কিন্তু তুমি বদলাওনি একটুও," গলার স্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল ওয়ালান্ডার। ট্যান করাতে আরও সুন্দর লাগছে।

"মাদেইরাতে কাটিয়ে এসেছি আমরা এক সপ্তাহ।"

মাদেইরা। হানিমুনের কথা মনে পড়ে গেল ওয়ালান্ডারের। প্রথমে প্যারিস, তারপর মাদেইরা। শৈলচূড়ায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা হোটেল, সৈকতের পাড়ে ছোট মাছের রেস্তোরাঁ। সেইসব স্মৃতি উপেক্ষা করে আবারও সেখানে গেছে মোনা। এবার অন্য কারও সাথে।

"ভালো," বলল ওয়ালান্ডার। "আমি ভেবেছিলাম মাদেইরা শুধু আমাদের।"

"বোকার মতো কথা বল না!"

"সত্যি বলছি।"

"তাহলে বলব সত্যিই বোকার স্বর্গে বাস করছ।"

"এতে বোকামির কী আছে?"

তিক্ততার দিকে গড়াচ্ছিল আলাপচারিতা। এক তরুণী ওয়েটার এসে উদ্ধার করল ওদের। অর্ডার নিয়ে চলে গেল তরুণী। একটু পরেই ফিরে এল ওয়াইন নিয়ে। পেটে তরল পড়তেই কিছুটা স্বাভাবিক হলো পরিবেশ। অপর পাশে বসে প্রাক্তন স্ত্রীর দিকে তাকাল ওয়ালান্ডার। মোনার অপরূপ সৌন্দর্য ঈর্ষা হয়ে কাঁটার মতো বিঁধলো ওর হৃদয়ে।

চেহারায় যতটা সম্ভব শান্তভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করল সে।*স্কল* বলে ওয়াইনের গ্লাস তুলে ধরল দুজনে।

"ফিরে এসো আমার কাছে," অনুনয় করল ওয়ালান্ডার। "চল, আবার নতুন করে শুরু করি।"

"তা আর সম্ভব না," বলল মোনা। "আমাদের মাঝে যে সম্পর্ক ছিল, তা মরে গেছে।"

"এখানে আসার আগে স্টেশনে গিয়েছিলাম। সেখানে লিন্ডাকে দেখেছি।"

"লিন্ডাকে?"

"অবাক হওয়ার কী আছে?"

"আমি তো জানতাম ও স্টকহোমে।"

"স্টকহোমে কেন যাবে?"

"বলেছিল ওর মনের মতো কোন কলেজ পায় কিনা দেখবে।"

"কিন্তু আমি নিশ্চিত, ওকেই দেখেছি।"

"কথা হয়েছে?"

মাথা নাড়াল ওয়ালান্ডার। "ট্রেনে করে কোথাও যাচ্ছিল ও। তাছাড়া আমার হাতে সময় ছিল না।"

"কোথাকার ট্রেন?"

"লুন্দ বা লান্সকিরুনার। সাথে এক আফ্রিকান ছিল।"

"তাহলে ঠিক আছে।"

"মানে?"

"মানে হারমান সাথে আছে যেহেতু, দুশ্চিন্তার কিছু নেই।"

"হারমান?"

"হারমান আহম্বোয়া। কেনিয়ান।"

"বেগুনি রঙের ওভারঅল পরে ছিল সে।"

"মাঝেমাঝেই অমন হাস্যকর পোশাক পরার খেয়াল চাপে ওর।"

"সুইডেনে কী করছে সে?"

"মেডিক্যাল স্কুলে পড়তে এসেছে। শীঘ্রই ডাক্তারি পাশ করে বেরুবে। ছেলেটা বেশ ভালো। আর রসিক। ওর সাথে থাকলে না হেসে পারা যায় না।"

"ওরা কি লিভ টুগেদার করছে?"

"লুন্দে একটা স্টুডেন্ট ফ্ল্যাট আছে হারমানের।"

"আমি জানতে চেয়েছি ওরা লিভ টুগেদার করছে কিনা!"

"আমার মনে হয় অবশেষে সিদ্ধান্তে পৌছাতে পেরেছে লিন্ডা।"

"কিসের সিদ্ধান্ত?"

"হারমানের সাথে একসাথে থাকার।"

"তাহলে স্টকহোমে কলেজে ভর্তি হবে কী করে?"

"কলেজে ভর্তি হওয়ার আইডিয়াটা আসলে হারমানের।"

পুনরায় গ্লাস ভরে দিয়ে গেল ওয়েট্রেস। ওয়ালান্ডারের মনে হচ্ছে, মাতাল হয়ে পড়ছে সে।

"আমাকে একদিন ফোন দিয়েছিল লিন্ডা," বলল সে। "তখন সে ইস্তায়। কিন্তু আমার সাথে দেখা করেনি। ওর সাথে দেখা হলে বল, আমি ওকে মিস করি।"

"নিজ মর্জিতে চলে ও।"

"আমি শুধু ওকে কথাটা জানাতে বললাম!"

"আচ্ছা, জানাব! চেঁচানোর কিছু নেই।"

"আমি চেঁচাচ্ছি না!"

এমন সময় চলে এল রোস্ট বিফ। নিঃশব্দে খেতে লাগল দুজনে। খাবার বিস্বাদ ঠেকল ওয়ালান্ডারের কাছে। আরেক বোতল ওয়াইন অর্ডার করল সে।

"তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে ভালোই আছ," বলল সে।

একটু বেশি জোরেই যেন মাথা দোলাল মোনা। "তুমি?"

"বাজে সময় যাচ্ছে। এমনিতে আছি কোন রকম।"

"কী নিয়ে কথা বলার জন্য ডেকেছ?"

দেখানোর মতো কোন অজুহাত ঠিক করে আসেনি ওয়ালান্ডার। ভুলেই গিয়েছিল যে কারণ দর্শাতে হতে পারে। মিথ্যা বলার চেয়ে সত্যটাই স্বীকার করে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিল সে।

"আসলে সব বানিয়ে বলেছি। তোমাকে দেখতে ইচ্ছা করছিল।"

হাসলো মোনা। "আমিও খুশি হয়েছি আমাদের দেখা হওয়ায়।"

সহসাই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল ওয়ালান্ডার। "তোমাকে খুব মিস করি আমি," বলল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

হাত বাড়িয়ে ওর হাত চেপে ধরলো মোনা। তবে কিছু বলল না। ঠিক ওই মুহূর্তে ওয়ালান্ডার বুঝে গেল যে সব শেষ। আলাদা হয়ে গেছে ওদের পথ। মোনার নীরবতা তাই বলছে চিৎকার করে।

অ্যানেট ব্রোলিনের কথা মনে পড়ল ওর। মাথায় উঁকি দিয়ে গেল স্বপ্নে দেখা সেই কৃষ্ণাঙ্গ নারী। একাকীত্বের জন্য প্রস্তুত ছিল না ওয়ালান্ডার। কিন্তু এখন তা মেনে নিতেই হবে। হাঁটতে হবে নতুন জীবনের পথে।

"একটা কথা বল শুধু," বলল সে। "কেন ছেড়ে গেলে আমাকে?"

"যদি না যেতাম, তাহলে হয়ত আমি মারাই যেতাম," বলল মোনা। "এতে তোমার কোন দোষ নেই আসলে। আমিই বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল যে আমার পক্ষে আর সম্ভব নয় তোমার সাথে থাকা। আশা করি কোন একদিন বুঝতে পারবে কী বলতে চাইছি।"

"আমি এখন বুঝতে চাই।"

রেস্টুরেন্ট ছেড়ে বেরিয়ে যাবার সময় নিজের বিলটুকু দিয়ে দিতে চাইল মোনা। কিন্তু হার মানতে বাধ্য হলো ওয়ালান্ডারের চাপাচাপির কাছে।

"বাড়ি ফিরবে কিভাবে?" জিজ্ঞেস করল মোনা।

"বাসে করে। তুমি?"

"হেঁটে।"

"তোমাকে কিছুদূর এগিয়ে দিই?"

মাথা দোলাল মোনা।

"আর যাওয়া লাগবে না," বলল কিছুক্ষণ হাঁটার পর। "ধন্যবাদ। ফোন করো মাঝে মাঝে। যোগাযোগ রেখ।"

আলতো করে ওয়ালান্ডারের গালে চুমু বসালো সে। তারপর হাঁটতে লাগল উল্টো ঘুরে। ওকে ব্রিজ পার হয়ে যেতে দেখল ওয়ালান্ডার। যখন স্যাভয় আর টুরিস্ট ব্যুরোর মাঝে অদৃশ্য গেল মোনা, পিছু নিল সে। একই দিনে মেয়ে আর স্ত্রীর ওপর নজরদারি করল গোপনে।

স্কুটরিয়াতের কোণায় একটা টেলিভিশনের সামনে অপেক্ষা করছিল একটা গাড়ি। সামনের সিটে উঠে বসল মোনা। গাড়িটা পাশ কাটানোর সময় দ্রুত কিছু সিঁড়ির আড়ালে চলে গেল ওয়ালান্ডার। এক নজরের জন্য দেখতে পেয়েছে চালকের আসনে বসা লোকটাকে।

নিজের গাড়ির উদ্দেশ্যে হাঁটতে লাগল ওয়ালান্ডার। মিথ্যা বলেছে মোনাকে। রাতের বেলা এমন কোন বাস নেই যা ইস্তার দিকে যাবে। একটা ফোন বক্সের সামনে থামল সে। ফোন দিল অ্যানেট ব্রোলিনের বাসায়। ব্রোলিন ফোন ধরতেই কেটে দিল কল। তারপর টলোমলো পায়ে ফিরে এল নিজের গাড়িতে। মারিয়া ক্যালাসের ক্যাসেট ছেড়ে দিয়ে চোখ বুজলো।

প্রচন্ড ঠান্ডায় ঘুম ভেঙ্গে গেল ওর। মাঝে পেরিয়ে গেছে প্রায় দুই ঘন্টা। যদিও সে মাতাল, তবুও গাড়ি চালিয়েই বাসায় ফেরার সিদ্ধান্ত নিল। ঠিক করল, সেদালা আর সুইনহোম দিয়ে যাবে। তাহলে পুলিশ প্রহরার যামনে পড়তে হবে না।

কিন্তু কথায় বলে, যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে সন্ধ্যা হয়। ওয়ালান্ডার ভুলেই গিয়েছিল যে শরণার্থী শিবির পাহারা দিবার জন্য বাড়তি পুলিশ পেট্রল নিয়োগ করা হয়েছে। এবং আদেশটা তারই দেয়া।

সুইনহোম আর স্লিমিঞ্জের মাঝামাঝি জায়গায় ওর গাড়িটাকে থামালো পিটারস আর নরেন। এমনিতে ওয়ালান্ডারের গাড়ি ওদের চেনা। কিন্তু কল্পনাও করতে পারেনি এত রাতে ওয়ালান্ডার বাইরে থাকবে। তাছাড়া গাড়ির লাইসেন্স প্লেট কাদা দিয়ে এমনভাবে ঢেকে আছে যে বোঝা যাচ্ছিল না।

নরেন উইন্ডস্ক্রিনে টোকা দিলে জানালার কাঁচ নামালো ওয়ালান্ডার। ভারপ্রাপ্ত প্রধানকে দেখে অবাক হলো পিটারস আর নরেন। মুখে বলল না কিছু। ওয়ালান্ডারের রক্তলাল চোখে টর্চের আলো ফেলল নরেন।

"সব ঠিক আছে?" অবশেষে মুখ খুলল ওয়ালান্ডার।

চোখাচোখি হলো পিটারস আর নরেনের।

"জি," জবাব দিল পিটারস। "কোনও ঝামেলা হয়নি।"

"আচ্ছা," বলে জানালার কাঁচ তুলতে গেল ওয়ালান্ডার।

বাঁধা দিল নরেন। "এক্ষুনি গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসুন।"

চোখে জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকাল ওয়ালান্ডার। কিন্তু টর্চের তীব্র আলোয় চেনা মুখটাকে কেমন অপরিচিত ঠেকল। কথা না বাড়িয়ে বেরিয়ে এল সে। শীতল বাতাস এসে হাড় কাঁপিয়ে দিল ওর।

অবশেষে সমাপ্তি ঘটতে চলেছে।

নয়

সকাল সাতটায় সিভিয়া হোটেলে প্রবেশ করল ওয়ালান্ডার। তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। সেই সাথে তুষারপাত। গাড়ি থেকে হোটেল পর্যন্ত আসতে আসতে চুইয়ে পানি ঢুকে গেছে ওর জুতোর ভেতর। মাথাটাও ব্যথা করছে প্রচন্ড। কয়েকটা অ্যাসপিরিন চাইল সে ওয়েট্রেসের কাছে। সাদা পাউডার গুলানো এক গ্লাস পানি নিয়ে ফিরে এল ওয়েট্রেস। কফি পান করতে গিয়ে ওয়ালান্ডার খেয়াল করল, কাঁপছে ওর হাত। কয়েক ঘন্টা আগে নরেন যখন আদেশ করেছিল গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে, ভেবেছিল সব শেষ হয়ে গেছে। সমাপ্তি টানতে হবে তার পুলিশ জীবনের। মাতাল অবস্থায় গাড়ি চালানো মানে তাৎক্ষণিক বরখাস্ত। তারপর জেলের ঘানি টেনে যদিওবা কোনদিন ফিরে আসতে পারে বাহিনীতে, সহকর্মীদের মুখ দেখানোর উপায় থাকবে না।

একই সঙ্গে ভাবতে শুরু করেছিল তার ভবিষ্যৎ নিয়ে। হয়তকোন কোম্পানির সিকিউরিটি হেড হিসেবে চাকুরি পাবে, কিংবা কোন অখ্যাত গার্ড সার্ভিসে। কিন্তু ওর বিশ বছরের পুলিশ জীবনের এখানেই ইতি। হয়ত ওর জীবনেরও, কেননা মনেপ্রাণে সে তো একজন পুলিশ।

পিটারস আর নরেনকে ঘুষ দেয়ার কোন চেষ্টাই করেনি ওয়ালান্ডার। জানতো, লাভ হবে না। একটা রাস্তাই খোলা ছিল তার সামনে-অনুরোধ করা।

কিন্তু তা করতে হয়নি।

"পিটারসের সাথে যান," বলল নরেন। "আমি আপনার গাড়ি নিয়ে আসছি।"

ধড়ে প্রাণ ফিরে পেয়েছিল ওয়ালান্ডার কথাটা শুনে। কিন্তু সেই সাথে নরেনের কণ্ঠে মিশে থাকা ধিক্কার ওর কান এড়ায়নি। চুপচাপ গিয়ে বসেছিল পেট্রল কারের পেছনের সিটে। ইস্তায় ফেরার পুরো পথে একটা কথাও বলেনি পিটারস।

পেছন পেছন আসছিল নরেন। ওয়ালন্ডারের বাসায় পৌছে গাড়ি পার্ক করে চাবিটা বাড়িয়ে দেয় সে।

"আর কেউ দেখেছে আপনাকে?" জানতে চেয়েছিল ওয়ালান্ডারের কাছে।

"তোমরা ছাড়া আর কেউ না।"

"ভাগ্য ভালো আপনার।"

মাথা দুলিয়ে সায় জানিয়েছিল পিটারস। ওয়ালান্ডার বুঝতে পেরেছিল যে এ যাত্রায় পার পেয়ে যাবে সে। তার জন্যে নরেন আর পিটারস কর্তব্যে গাফিলতি করেছে। যদিও না করলেও পারতো।

"ধন্যবাদ," বলেছিল ওয়ালান্ডার।

"ব্যাপার না," জবাব দিয়েছিল নরেন। তারপর চলে যায় পিটারসকে নিয়ে।

ফ্ল্যাটে ফিরে একটা হুইস্কির বোতলে জমা ধুলো পরিষ্কার করেছিল ওয়ালান্ডার। তারপর ঘুমিয়ে পড়েছিল কয়েক ঘন্টার জন্য। ঘুম থেকে উঠে কোনমতে শেভ করে আবারও বেরিয়ে পড়ে। তখন সকাল ছয়টা বেজে পনেরো মিনিট। মদের প্রভাব সম্পূর্ণ কাটেনি। কিন্তু জানতো যে পিটারস আর নরেনের মুখোমুখি হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না তখন। ছয়টা বাজে ওদের ডিউটি শেষ।

হোটেলের ডাইনিং রুমে ওয়ালান্ডার ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নেই। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সে। ধূসর রুপ ধারণ করেছে সমুদ্র। বৃষ্টির কারণে ভালো করে দেখবার উপায় নেই। একটা মাছ ধরার নৌকা দেখা যাচ্ছে আবছা ভাবে। মাস্তুলে কালো কালিতে লেখা নম্বর পড়ার চেষ্টা করল সে।

আমার এখন দরকার চমৎকার এক বোতল বিয়ার, সহসাই মাথায় এল চিন্তাটা। ক্রমেই দখল করে নিতে চাইল তার মস্তিষ্ক। এমনকি ফিরে যাওয়ার পথে মদের দোকানে থামার কথাও উঁকি দিয়ে গেল মনে, যাতে সন্ধ্যায় গেলার জন্য কয়েক বোতল কিনতে পারে। স্বাভাবিক হওয়ার জন্য এখনও প্রস্তুত না সে।

জঘন্য পুলিশ অফিসার আমি, ভাবল ওয়ালান্ডার। আগাগোড়া বিগড়ে গিয়েছি।

কফির কাপ পুনরায় ভর্তি করে দিয়ে গেল ওয়েট্রেস। মেয়েটার সাথে একটা হোটেলের রুমে যাওয়ার কথা ভাবল ওয়ালান্ডার। সেখানে মেতে উঠবে স্বর্গসুখে। ভুলে যাবে নিজের অস্তিত্ব, আশেপাশের সবকিছু। ডুবে যাবে বাস্তবতা বিবর্জিত অন্য এক দুনিয়ায়।

কফিতে চুমুক দিয়ে সাথে আনা ব্রিফকেসটা খুলল সে। এখনও তদন্তের রিপোর্টগুলো পড়ে দেখার সময় আছে। তারপর কী মনে পড়তেই তড়িঘড়ি করে রিসিপশনে গিয়ে কল দিল ইস্তা পুলিশ স্টেশনে। ফোন ধরল এবা।

"কেমন কাটলো গতকালের সন্ধ্যা?" জিজ্ঞেস করল সে।

"অসাধারণ," জবাব দিল ওয়ালান্ডার। "এতটা ভালো আশা করিনি। আর অসংখ্য ধন্যবাদ তোমার সাহায্যের জন্য।"

"কোনও ব্যাপারই না।"

"আচ্ছা, শোনো, আমি সিমরিশামের হোটেল সিভিয়াতে আছি। দরকার পড়লে এখানে ফোন করবে। পরে কৃষানইস্তার পুলিশ অফিসার বোম্যানের সাথে তদন্তের কাজের বের হব। তখন আমি নিজেই ফোন করে জেনে নিব পরিস্থিতি।"

"দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। শরণার্থী শিবিরে সব ভালোই চলছে।"

কথা শেষে ম্যানস রুমে গেল ওয়ালান্ডার। মুখ ধোয়ার সময় ইচ্ছা করেই তাকাল না আয়নায়। কপালের ফোলা জায়গায় আঙ্গুল ঠেকল ওর। ব্যথা যায়নি এখনও। আড়মোড়া ভাঙতে গিয়ে সুঁচ বিঁধলো যেন উরুতে।

ডাইনিং রুমে ফিরে ব্রেকফাস্ট অর্ডার করল সে। খেতে খেতে চোখ বুলাতে লাগল রিপোর্টে।

কাঁটায় কাঁটায় নটায় এসে পৌছাল বোম্যান। "কী বাজে আবহাওয়া রে বাবা!"

"তাও ভালো তুষারঝড় হচ্ছে না," বলল ওয়ালান্ডার।

কফি চলে এল বোম্যানের জন্য। চুমুক দিতে দিতে দিনের কর্মপন্থা ঠিক করে নিতে লাগল সে ওয়ালান্ডারের সাথে।

"আমাদের ভাগ্য ভালো," বলল বোম্যান। "গ্লেসাক্স আর কৃষানইস্তায় যে তিনজন মহিলা থাকছেন, তাদের খুঁজে পেতে তেমন ঝামেলা হবে না।"

গ্লেসাক্সের মহিলাকে দিয়ে শুরু করল ওরা।

"উনার নাম অ্যানিটা হেসলার," বলল বোম্যান। "বয়স আটান্ন। বিয়ে করেছেন কয়েক বছর আগে। তার স্বামী একজন এস্টেট এজেন্ট।

"হেসলার কি উনার স্বামীর নামের শেষাংশ?" জিজ্ঞেস করল ওয়ালান্ডার।

"না, পারিবারিক নাম। তার স্বামীর নাম ক্লাস জোহানসন। সেই সূত্রে মহিলার নাম এখন অ্যানিটা জোহানসন। শহর থেকে বেশি দূরে না তাদের বাড়ি। হালকা খোঁজখবর নিয়েছি আমরা। যদ্দুর জানা গেছে, মহিলা গৃহিণী।"

সঙ্গে করে নিয়ে আসা কাগজে চোখ বুলালো বোম্যান। "১৯৫১ সালের মার্চের নয় তারিখে সকাল চারটা তেরো মিনিটে কৃষানইস্তার ম্যাটারনিটি ওয়ার্ডে এক পুত্রসন্তানের জন্ম দিই তিনি। যতদুর জানা গেছে, বর্তমান বিয়ের পূর্বে এটাই তার একমাত্র সন্তান। তবে ক্লাস জোহানসনের আগের ঘরের চার সন্তান রয়েছে। এবং ক্লাস তার স্ত্রী থেকে ছয় বছরের ছোট।"

"তার মানে অ্যানিটা জোহানসনের সেই ছেলের বয়স এখন উনচল্লিশ," হিসাব করে বলল ওয়ালান্ডার।

"তার নাম স্টেফান," জানালো বোম্যান। "আহুসে থাকে। কৃষানইস্তায় চাকুরি করে কর মূল্যায়ন তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে। তার আর্থিক অবস্থা খতিয়ে

দেখেছি আমরা। কোন গোলমাল নেই। একটা বাড়ি আছে তার। সংসারে এক স্ত্রী আর দুই সন্তান।"

"কর তত্ত্বাবধায়কেরা কি খুন-টুন করে নাকি?" জিজ্ঞেস করল ওয়ালান্ডার।

"সবসময় না," জবাব দিল বোম্যান।

গ্লেসাক্সে চলে এল ওরা। তুষারপাত বন্ধ হয়ে এখন অঝোরে ঝড়ছে বৃষ্টি। শহরে ঢুকবার আগ মুহূর্তে বামে মোড় নিল বোম্যান।

কিছুদূর যাওয়ার পর চোখে পড়ল জনবসতি। এখানকার দোতলা বাড়িগুলো শহরের নিচু সাদা দালানগুলোর চেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ। আরও কিছুদূর এগিয়ে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌছালো ওরা।

বাড়িটা চত্বরের শেষ মাথায় অবস্থিত। পাশেই সিমেন্টের মেঝের ওপর বসানো একটা বিশাল স্যাটেলাইট ডিশ। গ্যারেজের সামনে একটা সাদা নিসান পার্ক করা। গাড়িতে বসে লাল ইটের দালানটার ওপর নজর রাখল ওরা।

"মহিলার স্বামী বোধ হয় বাড়িতে নেই," বলল বোম্যান। "তার অফিস সিমরিশামে। খুব সম্ভবত ধনী জার্মানদের কাছে জমি বিক্রি করে সে।"

"কিন্তু এটা তো বেআইনি!" ওয়ালান্ডারের কণ্ঠে বিস্ময়।

শ্রাগ করল বোম্যান। "এসব ক্ষেত্রে জমির আসল মালিকদের পরিচয় লুকিয়ে সুইডিশ কারও নাম ব্যবহার করা হয়। জার্মানরা ভালোই টাকা ঢালে এর পেছনে। স্কেওনাতে এমন অনেক লোক আছে যারা নিজেদের নাম ভাঙ্গিয়ে বসবাসযোগ্য জমির বেআইনি মালিকানা লাভ করে।"

এমন সময় পর্দার আড়ালে ক্ষীণ নড়াচড়া দেখতে পেল ওরা। মুহূর্তেই মিলিয়ে গেল তা। নজর না রাখলে চোখেই পড়ত না ওদের।

"বাড়ির ভেতর কেউ আছে," বলল ওয়ালান্ডার। "চল, যাওয়া যাক।"

দরজা খুলল অসম্ভব সুন্দরী এক মহিলা। পরনের ঢোলা ট্র্যাকস্যুটেও মানিয়ে গেছে বেশ। অবশ্য তার চেহারা দেখে সুইডিশ মনে হলো না ওয়ালান্ডারের। তবে প্রাথমিক পরিচয়পর্বের গুরুত্ব জানা আছে তার। যখন মহিলা জানবে যে ওরা পুলিশের লোক, কেমন হবে তার প্রতিক্রিয়া?

কিন্তু হতাশ হতে হলো ওয়ালান্ডারকে। কোন ভাবান্তর হলো না মহিলার। শুধু এক চোখের ভুরু কিছুটা ওপরে উঠল। তারপর হেসে ওদেরকে স্বাগত জানালো মহিলা। বোম্যানের কথার সত্যতা নিয়ে সন্দেহ জাগলো ওয়ালান্ডারের মনে। সত্যিই কি মহিলার বয়স আটান্ন? দেখে তো পঁয়তাল্লিশের বেশি মনে হয় না।

"ভেতরে আসুন," বলল মহিলা।

তার পিছু নিয়ে সুসজ্জিত লিভিং রুমে এল ওরা। বই ভর্তি তাক দিয়ে সাজানো দেয়াল। কোণায় একটা টিভি। অ্যাকুরিয়ামে সোনালি ডোরাকাটা মাছ। ইয়োহানেস লভগ্রেনের কামরার সাথে এই কক্ষের কোন মিল খুঁজে পেল না ওয়ালান্ডার।

"চা বা কফি?" বলল মহিলা।

না করে দিয়ে বসে পড়ল ওয়ালান্ডার আর বোম্যান।

"আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে এসেছি আমরা," বলল ওয়ালান্ডার। "আমি কার্ট ওয়ালান্ডার। আর ও কৃষানইস্তার পুলিশ অফিসার গোরান বোম্যান।"

"সত্যি বলতে কী, মজাই লাগছে আমার," হেসে বলল মহিলা। "গ্লেসাক্সে সাধারণত তেমন কিছু ঘটে না যাতে পুলিশের প্রয়োজন পড়তে পারে।"

"আমরা জানতে এসেছি যে আপনি ইয়োহানেস লভগ্রেন নামের কাউকে চেনেন কিনা," বলল ওয়ালান্ডার।

বিস্মিত দেখাল মহিলাকে। "ইয়োহানেস লভগ্রেন? না তো। কে তিনি?"

"সত্যি বলছেন?"

"মিথ্যা বলার কোন কারণ নেই।"

"কয়েক দিন সস্ত্রীক খুন হয়েছেন তিনি লুনাপ নামের একটা গ্রামে। পত্রিকায় পড়ে থাকবেন হয়ত।"

মহিলার বিস্মিত ভাব নকল মনে হলো না ওয়ালান্ডারের।

"এরকম একটা খবর পত্রিকায় দেখেছিলাম," বলল মহিলা। "কিন্তু এর সাথে আমার কী সম্পর্ক?"

কোনও সম্পর্ক নেই, মনে মনে বলল ওয়ালান্ডার। বোম্যানের তাকিয়ে বুঝতে পারল, তারও একই মত। ইয়োহানেস লভগ্রেনের সাথে এই মহিলার কী সম্পর্ক থাকতে পারে?

"১৯৫১ সালে কৃষানইস্তায় আপনার এক পুত্রসন্তান হয়," বলল বোম্যান। "কাগজপত্রে আপনি সন্তানটির পিতৃপরিচয় উল্লেখ করেননি। এমনকি হতে পারে যে ইয়োহানেস লভগ্রেনই ওই সন্তানের জনক?"

উত্তর দেওয়ার আগে পুলিশ অফিসারদ্বয়ের দুজনের দিকে টানা কতক্ষণ তাকিয়ে থাকল মহিলা।

"জানি না কেন এই প্রশ্ন করছেন। আর এর সাথে ওই খুন হওয়া কৃষকের কী সম্পর্ক তাও আমার বোধগম্য হচ্ছে না। তারপরও, জানতে যেহেতু চেয়েছেন, স্টেফানের পিতার নাম রুন স্টিয়েরনা। তখন সে আরেকজনের

সাথে বিবাহিত ছিল। এবং স্টেফানের পিতৃত্ব দাবি না করায় আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ। বারো বছর আগে মারা গেছে সে।"

"প্রশ্নগুলো শুনে হয়ত আপনার কাছে অবান্তর মনে হতে পারে," বলল ওয়ালান্ডার। "তবে কাজের খাতিরে মাঝে মাঝে আমাদের এমন অদ্ভুত প্রশ্ন করতে হয়।"

আরও কয়েকটা প্রশ্ন করল ওরা। কয়েকটা ক্ষেত্রে নোট লিখে নিল। তারপর চলে যেতে উদ্যত হলো।

"আশা করি কিছু মনে করবেন না বিরক্ত করার জন্য," উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল ওয়ালান্ডার।

"বিশ্বাস হয়েছে আমার কথা?" জানতে চাইল মহিলা।

"জি হয়েছে," বলল ওয়ালান্ডার। "তবে মিথ্যা বললেও আমরা সত্যটা খুঁজে বের করব।"

হাসতে লাগল মহিলা। "সত্যই বলেছি সব। আমি আবার খুব একটা মিথ্যা বলতে পারি না। তবে দরকার পড়লে অবশ্যই আসবেন।"

বাড়িটা থেকে গাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল বোম্যান আর ওয়ালান্ডার।

"আমরা যাকে খুঁজছি এই মহিলা তিনি না," বলল ওয়ালান্ডার।

"তার ছেলের সাথে কথা বলবে?"

"আপাতত দরকার নেই।"

ওয়ালান্ডারের গাড়িতে করে কৃষানইস্তায় ফিরে এল ওরা। বৃষ্টি থেমে গেছে এরইমাঝে। ওরা ব্রোসার্পের পাহাড়গুলোর কাছাকাছি পৌছাতে পৌছাতে পরিষ্কার হয়ে এল আকাশ। কৃষানইস্তা পুলিশ স্টেশনের বাইরে থেমে একটা পুলিশের গাড়িতে চড়ে বসল ওরা। তারপর আবারও পথচলা।

"মার্গারিটা ভেলান্দার," বলল বোম্যান। "বয়স ঊনপঞ্চাশ। ক্রুকার্সগতায় অবস্থিত দ্য ওয়েভ নামের একটা বিউটি শপের মালিক। তিন সন্তানের জননী। প্রথম সংসার ভেঙ্গে যাবার পর আবার বিয়ে করেন। আবারও বিচ্ছেদ। থাকেন ব্লেকিইনার একটা টেরেসড হাউসে। ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বরে একটা ছেলে সন্তানের জন্ম দিই তিনি। ছেলের নাম নিলস। পেশায় একজন উদ্যোক্তা। মার্কেট ঘুরে ঘুরে আমদানিকৃত শৌখিন জিনিসপাতি বিক্রি করত। মহিলাদের নভেল্টি আন্ডারওয়্যার বানায় এমন একটা কোম্পানির মালিকানাও আছে তার নামে। থাকে সোলভেসবোরিয়া। এরকম একটা শহর থেকে কারা মেইল অর্ডার কোম্পানির মাধ্যমে নভেল্টি আন্ডারওয়্যার কেনে?"

"অনেকেই কিনতে পারে," বলল ওয়ালান্ডার।

"হানাহানির অভিযোগ আছে একটা তার নামে," বলল বোম্যান। "রিপোর্টটা আমি দেখেনি। তবে এক বছরের শাস্তি হয়েছিল তার। নিশ্চয় মারাত্মক কিছু ঘটেছিল।"

"আমি ওই রিপোর্টটা দেখতে চাই," বলল ওয়ালান্ডার। "কোথায় ঘটেছিল এই কাহিনী?"

"কালমার জেলা কোর্টে শাস্তি হয়েছিল তার। এ সংক্রান্ত দলিলাদি খোঁজা হচ্ছে।"

"কখন ঘটেছিল?"

"১৯৮১ তে মনে হয়।"

"তারমানে ছেলেটা যখন জন্মায়, মহিলার বয়স ছিল মাত্র সতেরো বছর। আর লভগ্রেনকে যদি ছেলেটার পিতা হিসেবে ধরে নেই, বয়সের বিরাট একটা ফারাক হয়ে যায়।"

"আমারও মনে হয়েছিল তা। কিন্তু নিশ্চিত না হয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক হবে না।"

কৃষানইস্তার প্রান্ত ঘেঁষে একসারি ফ্ল্যাটের বেজমেন্টে অবস্থিত বিউটি সেলুনটা।

"চুল কাটার জন্য এখানে আসা যায়, কী বল?" বলল বোম্যান। "তোমার চুল কোথায় কাটাও?"

মোনা জানে, বলতে বসেছিল ওয়ালান্ডার।

"একেক সময় একেক জায়গায়," বলল নিজেকে সামলে নিয়ে।

সেলুনে তিনটা চেয়ার। খালি নেই একটাও। দুজন মহিলা বসে আছে হেয়ার ড্রায়ারের নিচে। আরেকজন চুল ধোয়াচ্ছে। চুল ধুয়ে দিচ্ছিল এক মহিলা। ওয়ালান্ডারদের দেখে বিস্ময় ফুটলো তার চেহারায়।

"আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া কাজ করি না," বলল সে। "আর আজকের শিডিউল খালি নেই। এমনকি কালকেও সম্ভব হবে না।"

"মার্গারিটা ভেলান্দার?" জিজ্ঞেস করল গোরান বোম্যান। তারপর আইডেন্টিটি কার্ড বের করে দেখাল।

"আপনার সাথে কথা ছিল।"

মহিলার চোখে ভয় ফুটতে দেখল ওয়ালান্ডার।

"আমি এখন যেতে পারব না," বলল মহিলা।

"আমাদের অপেক্ষা করতে আপত্তি নেই," বলল বোম্যান।

"পেছনের কামরায় বসুন তাহলে," বলল মার্গারিটা ভেলান্দার। "বেশিক্ষণ লাগবে না আমার।"

রুমটা একেবারেই ছোট। অয়েলক্লথে ঢাকা টেবিল আর কয়েকটা চেয়ার দখল করে রেখেছে সমস্ত জায়গা। তাকে রাখা কফি কাপ আর একটা কফি মেকারের মাঝে পড়ে আছে এক গাদা ট্যাবলয়েড। দেয়ালে ঝুলানো একটা সাদা-কালো ছবির ওপর নজর পড়ল ওয়ালান্ডারের। ঝাপসা হয়ে এসেছে নাবিকের পোশাক পরা ছবির তরুণের মুখখানা। ক্যাপের বেন্ডে লেখা হল্যান্ড শব্দটা পড়তে পারল সে।

"হল্যান্ড," বলল বোম্যানের উদ্দেশ্যে। "ওটা ক্রুজার নাকি ডেস্ট্রয়ার ছিল?"

"ডেস্ট্রয়ার। অনেক আগেই বাতিল হয়ে গেছে।"

তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে মার্গারিটা ভেলান্দার এসে ঢুকল এমন সময়।

"কয়েক মিনিট সময় আছে এখন," বলল সে। "বলুন কী বলবেন।"

"আমরা জানতে এসেছি আপনি ইয়োহানেস লভগ্রেন নামের কাউকে চেনেন কিনা," বলল ওয়ালান্ডার।

"তাই?" বলল মার্গারিটা। "কফি নেবেন?"

না করে দিল অফিসার দুজন। ওয়ালান্ডার বিরক্ত হলো প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে।

"ইয়োহানেস লভগ্রেন," আবারও বলল সে। "পেশায় কৃষক। ইস্তার বাইরে এক গ্রামে থাকতেন। চেনেন তাকে?"

"খুন হয়েছে যে লোকটা?" সরাসরি ওয়ালান্ডারের চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল মার্গারিটা।

"জি, তার কথাই বলছি।"

"না," কফি ঢেলে নিতে নিতে বলল মার্গারিটা। "আমি কিভাবে চিনব তাকে?"

দৃষ্টি বিনিময় হলো অফিসার দুজনের। মহিলার কণ্ঠ শুনে মনে হচ্ছে কোন কারণে অস্বস্তিতে ভুগছে সে।

"১৯৫৮ সালে আপনার এক ছেলে সন্তান হয়, যার নাম রাখা হয় নিলস," বলল ওয়ালান্ডার। "আপনি ছেলেটার পিতার নাম উল্লেখ করেননি কোথাও।"

ছেলের নাম শোনার সাথে সাথেই কাঁদতে শুরু করল মার্গারিটা। হাত থেকে খসে পড়ল কফি কাপ।

"কী করেছে ও?" জিজ্ঞেস করল সে। "এবার কী করেছে?"

মহিলা শান্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ওয়ালান্ডার। "আমরা আপনাকে কোন খারাপ সংবাদ দিতে আসিনি। জানতে এসেছি, ইয়োহানেস লভগ্রেন নিলসের পিতা কিনা।"

"না।"

"সেক্ষেত্রে আমরা আপনার সন্তানের পিতার নাম জানতে ইচ্ছুক।"

"কেন? কেন জানতে চাইছেন?"

"তদন্তের স্বার্থে।"

"আমি তো বলেছি যে ইয়োহানেস লভগ্রেন নামের কাউকে চিনি না।"

"নিলসের পিতার নাম কী?"

"বলতে পারব না আমি।"

"আপনার কথা এই কামরার বাইরে যাবে না।"

অনেকক্ষণ পর মুখ খুলল মার্গারিটা। "আমি জানি না নিলসের বাবা কে।"

"কথাটা বিশ্বাসযোগ্য না।"

"ওই সময়টাতে অনেক পুরুষের সাথে শুয়েছি আমি। একারণে নিলসের বাবা কে হতে পারে, সে সম্পর্কে কোন ধারণা নেই।"

দ্রুত উঠে দাঁড়াল মার্গারিটা। "কাজে ফিরে যেতে হবে আমাকে। নাহয় ড্রায়ারের নিচে থেকে পুড়ে মরবে ওই বুড়িরা।"

"আমরা অপেক্ষা করছি।"

"কিন্তু আমার আর কিছু বলার নেই!"

"আমাদের আরও কিছু প্রশ্ন আছে।"

দশ মিনিট পর ফিরে এল মার্গারিটা। হাতে কিছু ক্রোনারের নোট। একটা চেয়ারে ঝুলানো পার্সে নোটগুলো রেখে দিল সে। আগের চেয়ে শান্ত দেখাচ্ছে তাকে এখন।

"লভগ্রেন নামের কাউকে চিনি না আমি," বলল সে।

"আর ১৯৫৮ সালে জন্মানো আপনার সন্তানের পিতা কে, তাও জানেন না বলছেন?"

"হ্যাঁ।"

"আদালতেও বলতে পারবেন তো এই কথা?"

"আমি সত্য কথাই বলছি।"

"নিলসকে কোথায় পাওয়া যেতে পারে?"

"জানি না। ওর ভবঘুরে স্বভাব।"

"আমাদের রেকর্ড বলছে, সোলভেসবোরিয়াতে থাকেন তিনি।"

"তাহলে সেখানে গিয়েই দেখুন না!"

"তা তো যাবই।"

"আমার আর কিছু বলার নেই।"

এক মুহূর্তের জন্য ইতস্তত করল ওয়ালান্ডার। তারপর ইঙ্গিত করল দেয়ালে ঝুলানো ছবিটার দিকে।

"উনিই কি নিলসের বাবা?"

সবে একটা সিগারেট ধরিয়েছে মার্গারিটা। অনেকটা হিসহিসানির মতো শোনাল তার ধোঁয়া ছাড়ার শব্দ।

"আমি কোন লভগ্রেনকে চিনি না। এর বেশি কিছু বলার নেই আমার।"

"ঠিক আছে তাহলে," বলল বোম্যান। "আমরা এখন চলে যাচ্ছি। তবে শীঘ্রই আপনার সাথে যোগাযোগ করা হবে।"

"বললাম তো আমার আর কিছু বলার নেই। আমার পিছনে লেগেছেন কেন?"

"তদন্তের ধরণই এমন," বলল বোম্যান। "পুলিশ যখন তদন্তে নামে, তখন বাদ যায় না কেউই।"

বোম্যানরা যখন বেরিয়ে এল, বাইরে তখন ঝলমলে রোদ। গাড়ির পাশে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ওরা।

"কী মনে হলো তোমার?" জিজ্ঞেস করল বোম্যান।

"বুঝতে পারছি না। তবে কোন একটা সমস্যা তো আছেই।"

"তৃতীয় মহিলার কাছে যাওয়ার আগে কি ছেলেটাকে খুঁজে দেখবে?"

"সেটাই ভালো হবে।"

সোলভেসবোরিয়াতে চলে এল ওরা। অনেক কষ্ট হলো ঠিকানাটা খুঁজে পেতে। একটা বিধ্বস্ত কাঠের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। গাড়ির ভাঙা যন্ত্রাংশ আর বিভিন্ন যন্ত্রপাতি দিয়ে গিজগিজ করছে চারপাশ। তারস্বরে চেঁচাচ্ছে লোহার শেকলে বাঁধা একটা জার্মান শেফার্ড। মানুষজনের চিহ্ন নেই কোথাও। সামনে ঝুঁকে দরজায় ঝুলানো সাইনটা পড়ল বোম্যান।

"নিলস ভেলান্দার। ঠিক জায়গাতেই এসেছি আমরা।"

কয়েকবার টোকা দিল সে দরজায়। কিন্তু সাড়া দিল না কেউ। বাড়ির চারপাশটা ঘুরে দেখল ওরা। তারপর যখন আগের জায়গায় ফিরে এল, দরজার হাতল ঘুরানোর চেষ্টা করল ওয়ালান্ডার। অবাক করে দিয়ে ঘুরে গেল হাতল। লক করা নেই দরজাটা। বোম্যানের দিকে তাকাল ওয়ালান্ডার।

শ্রাগ করল বোম্যান। "খোলাই যেহেতু, চল ভেতরটা দেখে যাই।"

স্যাঁতসেঁতে হলওয়েতে পা রেখে কান পাতলো ওরা। কোন সাড়াশব্দ পেল না। এমন সময় ওদের আত্মা কাঁপিয়ে অন্ধকার কোণা থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল একটা বেড়াল। তারপর হিসহিস করতে করতে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল এক তলায়। এতক্ষণে চারপাশে নজর বুলানোর সুযোগ পেল ওয়ালান্ডার

আর বোম্যান। দুটো পুরনো ফাইলিং ক্যাবিনেট, একটা ডেস্ক, তার ওপরে একটা ফোন আর একটা আনসারিং মেশিন নজরে এল ওদের। দেখে মনে হচ্ছে অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হয় কামরাটা। ডেস্কের ওপর পড়ে থাকা একটা বাক্সের ঢাকনা তুলে ধরল ওয়ালান্ডার। ভেতরে দেখতে পেল চামড়ার একটা কালো আন্ডারওয়্যার আর কুরিয়ার করার জন্য একটা ঠিকানা।

"ড্রাগনগতার ফ্রেডরিক অ্যাবার্গ নামের একজন অর্ডার করেছে এটা," মুখে ব্যঙ্গাত্মক ভাব ফুটিয়ে বলল সে।

পরের রুমে চলে এল ওরা। জগাখিচুড়ি অবস্থা এখানে। কামরাটাকে নভেল্টি আন্ডারওয়্যারের স্টোররুম হিসেবে ব্যবহার করে নিলস ভেলান্দার। কিছু চাবুক আর ডগ কলারও আছে। তালগোল পাকিয়ে আছে সবকিছু।

পরের কামরাটা রান্নাঘর। ঢুকতেই বেড়ালের প্রস্রাবের গন্ধ এসে ধাক্কা মারল ওদের নাকে। একগাদা এঁটো থালাবাসন জমে আছে সিঙ্কে। মেঝেতে পড়ে আছে অর্ধেক খাওয়া মুরগীর রান। ভাঁড়ারের দরজা খুলে ফেলল ওয়ালান্ডার। ভেতরে শুধু একটা হোম ডিস্টিলারি আর দুটো বড় জালা। মুচকি হেসে মাথা দোলালো বোম্যান।

ওপর তলায় এসে শোবার ঘরে ঢুকল ওরা। জানালার পর্দা নামানো। বিছানার চাদর কতদিন পাল্টানো হয় না কে জানে। ময়লা কাপড় পড়ে আছে একপাশে স্তূপাকারে। মোট সাতটা বেড়ালকে ঘুরে বেড়াতে দেখল ওরা।

"কী লোক রে বাবা," বলল বোম্যান। "এরকম অবস্থায় মানুষ থাকতে পারে?"

বাড়িটার অবস্থা দেখে ওয়ালান্ডারের মনে হলো, তড়িঘড়ি করে বেরিয়ে গেছে এর মালিক।

"আমাদের এবার কেটে পড়া উচিত," বলল ওয়ালান্ডার। "পরে সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে ফিরে আসা যাবে।"

নিচে নেমে এল ওরা। অফিস রুমে ফিরে আনসারিং মেশিনের বাটন চেপে দিল বোম্যান। একটা পুরুষ কণ্ঠ, যা নিলস ভেলান্দারের হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, বলল যে এই মুহূর্তে র‍্যাফ-সেটস অফিসে কেউ নেই, তবে চাইলে আনসারিং মেশিনে মেসেজ রেখে যেতে পারে কলার।

ওরা প্রাঙ্গনে বেরিয়ে এলে তেড়ে আসতে চাইল জার্মান শেফার্ডটা। পারলো না শুধু শেকলে টান পড়ার কারণে। বাড়িটার বাম কোণায় একটা দরজা দেখতে পেল ওয়ালান্ডার। একটা পুরনো ম্যাঙ্গল মেশিনের আড়ালে থাকায় প্রায় দেখাই যায় না।

তালা দেয়া নেই দরজাটায়। কপাট খুলে অন্ধকার বেজমেন্টে পা রাখল সে। এগিয়ে গেল একটা ফিউজ বক্সের দিকে। কোনায় দাঁড়িয়ে আছে একটা পুরনো তেলের ফার্নেস। এছাড়া পুরো বেজমেন্ট শূন্য পাখির খাঁচায় ভর্তি। বোম্যানকে ডাক দিলে সে-ও এসে যোগ দিল।

"চামড়ার আন্ডারওয়্যার আর খালি পাখির খাঁচা," বলল ওয়ালান্ডার। "এই লোক করে কী?"

"সেটাই আমাদের খুঁজে বের করতে হবে," বলল বোম্যান।

বেরিয়ে যাবার আগ মুহূর্তে ফার্নেসের পিছনে একটা ছোট স্টিলের ক্যাবিনেট দেখতে পেল ওয়ালান্ডার। এটাতেও তালা দেয়া নেই। নিচু হয়ে হাতলে চাপ দিল সে। তারপর হাতড়াতে লাগল ভেতরে। একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ বের করে আনল সে।

"দেখ," বলল বোম্যানের উদ্দেশ্যে।

ব্যাগের ভেতর এক বান্ডিল এক হাজার ক্রোনারের নোট। ওয়ালান্ডার গুণে দেখল, তেইশটা নোট আছে বান্ডিলে।

"মনে হচ্ছে আমাদের লোককে পাওয়া গেছে অবশেষে," বলল বোম্যান।

ব্যাগটা রেখে দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। এখনও তারস্বরে চেঁচিয়ে যাচ্ছে জার্মান কুকুরটা।

"সোলভেসবোরিয়ার পুলিশদের কাছে সাহায্য চাইতে পারি আমরা নিলসের ব্যাপারে," বলল বোম্যান।

সোলভেসবোরিয়া পুলিশ স্টেশনে একজন অফিসারের খোঁজ পাওয়া গেল যে কিনা নিলস ভেলান্দার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।

"কত ধরণের অপরাধের সাথে যে জড়িয়ে আছে লোকটা কে জানে," বলল ওই পুলিশ অফিসার। "তবে পুলিশের খাতায় তার নাম উঠেছে বেআইনি ভাবে থাইল্যান্ড থেকে পাখি আমদানি ও একটা ডিস্টিলারি পরিচালনার সন্দেহে।"

"মারামারির অভিযোগে সম্ভবত একবার শাস্তি হয়েছিল তার," বলল বোম্যান।

"এমনটা আমার জানা নেই," বলল অফিসার। "তবে আমি খোঁজ নিয়ে দেখব। আপনাদের ধারণা, চোরাচালানি ছেড়ে এবার খুনোখুনিতে হাত পাকাচ্ছে সে?"

"এখনই বলবার উপায় নেই," বলল ওয়ালান্ডার। "তবে তাকে খুঁজে বের করতে হবে।"

কৃষানইস্তায় ফিরে চলল ওয়ালান্ডার আর বোম্যান। বৃষ্টি শুরু হয়েছে আবারও। সোলভেসবোরিয়ার পুলিশ অফিসারটাকে ভালোই মনে হয়েছে ওদের। আশা করছে, ভেলান্দারকে খুঁজে বের করতে পারবে সে। তবে সন্দেহ হচ্ছে ওয়ালান্ডারের।

"আমাদের হাতে কোন প্রমাণ নেই," বলল সে। "প্লাস্টিকের ব্যাগে রাখা কিছু এক হাজার ক্রোনরের নোট কিছুই প্রমাণ করে না।"

"ঠিক, তবে নিলস ভেলান্দার যে তুলসী পাতায় ধোয়া সাধু না তা নিশ্চিত," বলল বোম্যান।

একমত হলো ওয়ালান্ডার। কোন একটা ঘাপলা আছে ওই বিউটি সে-লুনের মালিক আর তার ছেলের।

একটা রেস্তোরাঁয় থামল ওরা লাঞ্চের জন্য। ইস্তা পুলিশ স্টেশনে ফোন দিবে ভেবেছিল ওয়ালান্ডার। কিন্তু এখানকার পে ফোন নষ্ট।

ওরা কৃষানইস্তায় ফিরতে ফিরতে দেড়টা বেজে গেল। লিস্টের তৃতীয় মহিলাকে খুঁজতে যাওয়ার আগে নিজের অফিসে একবার ঢুঁ মারতে চাইল বোম্যান। রিসিপশনের তরুণী থামাল ওদের।

"ইস্তা থেকে ফোন এসেছিল," বলল সে। "ইন্সপেক্টর ওয়ালান্ডারকে ফোন করতে বলেছে।"

"আমার অফিসে চল," বলল বোম্যান। "ওখান থেকে করতে পারবে।"

ওয়ালান্ডারকে ফোন ধরিয়ে দিয়ে কফি আনতে চলে গেল বোম্যান। দুরুদুরু বুকে ডায়াল করল ওয়ালান্ডার। কোন কথা না বলে সরাসরি রিডবার্গের লাইনে কলটা ট্রান্সফার করে দিল এবা।

"দ্রুত ফিরে এসো," বলল রিডবার্গ। "হ্যাজহোমে গুলিবিদ্ধ হয়েছে এক সোমালি শরণার্থী।"

"কী বলছ!"

"হ্যাঁ। হাঁটতে বেরিয়েছিল ওই সোমালি। তখন শটগান দিয়ে গুলি করা হয়। অনেকক্ষণ যাবত তোমাকে খুঁজছি। কোথায় গিয়েছ?"

"লাকটা কি মারা গেছে?"

"উড়ে গেছে খুলি।"

মোচড় দিল ওয়ালান্ডারের পেটের ভেতর। "আমি আসছি।"

ফোন রাখতেই প্রবেশ করল বোম্যান। হাতে দুই মগ কফি। কী ঘটেছে তাকে জানালো ওয়ালান্ডার।

"তোমার জন্য ইমার্জেন্সি ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করছি," বলল বোম্যান। "পরে কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দিব তোমার গাড়ি।"

সব দ্রুত ঘটতে লাগল এরপর। কয়েক মিনিটের মধ্যে সাইরেন বাজিয়ে ওয়ালান্ডারকে নিয়ে ইস্তার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল একটা গাড়ি। স্টেশনে রিডবার্গের সাথে দেখা করল ওয়ালান্ডার। তারপর দুজনে মিলে চলল হ্যাজহোমে।

"কোনও সূত্র পাওয়া গেছে?"

"না। তবে ঘটনাটার খানিক পরে একটা ফোন এসেছিল সিয়িডসভেন্সকানের নিউজ রুমে। একটা পুরুষ কণ্ঠ বলেছে, এই খুনটা নাকি ইগোহানেস লভগ্রেনের হত্যার জবাব। এরপর মারিয়া লভগ্রেনের হত্যার প্রতিশোধ নেয়া হবে একজন মহিলাকে দিয়ে।"

"এদের মাথা ঠিক আছে?" বলল ওয়ালান্ডার। "আমরা তো এখন আর নির্দিষ্টভাবে বিদেশিদের সন্দেহ করছি না।"

"সোমালি লোকটাকে যে বা যারা হত্যা করেছে, তারা হয়ত ভাবছে আমরা শরণার্থীদের রক্ষা করতে মিথ্যা বলছি।"

"কিন্তু আমি তো প্রেসের সামনে তা অস্বীকার করেছি।"

"তোমার অস্বীকারে কিছু যায়-আসে না। বিদেশিদের হত্যা করার একটা মওকা পেয়েছে এরা, তাই সেটা কাজে লাগাচ্ছে।"

"সিয়িডসভেন্সকানে যে কলটা এসেছিল, তা রেকর্ড করা হয়েছিল?"

"হ্যাঁ।"

"আমি তা শুনতে চাই। আমাকে হুমকি দিয়েছে যে লোক, তার কণ্ঠের সাথে মিলে কিনা দেখা দরকার।"

স্কেওনার রাস্তা ধরে ছুটে চলছে গাড়ি। দিশেহারা বোধ করল ওয়ালান্ডার।

"এখন আমরা কী করব?"

"লুনাপের খুনিদের ধরতে হবে," বলল রিডবার্গ। "যত দ্রুত সম্ভব।"

নরক নেমে এসেছে যেন হ্যাজহোমে। ডাইনিং হলে জড়ো হয়েছে ভীত শরণার্থীরা, কান্নায় ভারী বাতাস। সামনে যাকে পাচ্ছে, ধরে ইন্টারভিউ নিচ্ছে সাংবাদিকেরা। তারস্বরে বেজে চলছে একাধিক ফোন।

আবাসিক দালানগুলো থেকে কয়েকশো মিটার দূরে এসে থামল পুলিশের গাড়ি। কর্দমাক্ত রাস্তায় নেমে এল ওয়ালান্ডার। বাতাসের বেগ বেড়েছে আবারও। জ্যাকেটের কলার তুলে দিল সে। রাস্তার কাছে একটা জায়গা ঘিরে দেয়া হয়েছে বেষ্টনী দিয়ে। কাদায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে একটা লাশ।

সাবধানে লাশের ওপর থেকে কাপড় সরালো ওয়ালান্ডার।

বাড়িয়ে বলেনি রিডবার্গ। মাথা বলতে কিছুই নেই লাশটার।

"কাছ থেকে গুলি করা হয়েছে," বলল কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা হ্যানসন। "সম্ভবত কাছে কোথাও লুকিয়ে ছিল খুনি। ভিক্টিম নিকটে এলে বেরিয়ে এসেই গুলি চালায় কয়েক মিটার দূর থেকে। ক্যাম্পের পরিচালক বলেছে, পরপর দুবার গুলির শব্দ শুনতে পেয়েছে।"

চারপাশে নজর বুলালো ওয়ালান্ডার। "এই রাস্তা কতদূর গেছে?"

"দুই কিলোমিটার গিয়ে ই৬৫ এর সাথে মিলেছে।"

"কেউ দেখেছে কিছু?"

"এখনও জানা যায়নি। প্রায় পনেরোটার মতো ভাষায় কথা বলে এখানকার মানুষজন। আমরা চেষ্টা করছি।"

"মৃতের পরিচয় জানা গেছে?"

"এক স্ত্রী আর নয় সন্তান রেখে গেছেন।"

চোখে অবিশ্বাস নিয়ে হ্যানসনের দিকে তাকাল ওয়ালান্ডার। "নয় সন্তান?"

"চিন্তা কর তাহলে আগামীকালের শিররোনাম কী হতে যাচ্ছে," বলল হ্যানসন। "নিরপরাধ শরণার্থী খুন: পিতা হারালো নয় সন্তান।"

একটা পুলিশের গাড়ি থেকে দৌড়ে এল সুইয়েডবার।

"পুলিস চীফ ফোন করেছেন," জানালো সে।

বিস্মিত দেখাল ওয়ালান্ডারকে। "উনার না আগামীকাল স্পেন থেকে আসার কথা?"

"বিয়র্ক না। চীফ অফ ন্যাশনাল পুলিস।"

গাড়িতে ঢুকে ফোন তুলে নিল ওয়ালান্ডার। এবং মেজাজ খারাপ হলো তার পুলিশ প্রধানের কথা শুনে।

"অবস্থা ভালো ঠেকছে না," বলল পুলিস চীফ। "বর্ণবাদী এসব খুনিদের যেভাবেই হোক বন্দি করতে হবে।"

"জি," বলল ওয়ালান্ডার।

"এই খুনের তদন্তকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।"

"জি। কিন্তু লুনাপের জোড়াখুনের ঘটনাটা নিয়ে আমরা এখন ব্যস্ত আছি।"

"ওই ঘটনার তদন্তের অবস্থা কী? কোন উন্নতি হয়েছে?"

"জি, আমরা সর্বোচ্চ করছি। তবে সময় লাগবে।"

"তুমি নিজে আমার কাছে রিপোর্ট করবে। আজ রাতে একটা টিভি আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশ নিব আমি। সব ধরণের তথ্য চাই আমার।"

"আমি দেখছি বিষয়টা।"

কেটে গেল কল।

গাড়িতে ঠাঁই বসে রইল ওয়ালান্ডার। এদিকটা নাসলুন্ডকে সামলাতে হবে, ঠিক করল মনে মনে। যাবতীয় কাগজপত্র স্টকহোমে পাঠানোর দায়িত্ব দিতে হবে ওকে। হতাশ বোধ করল সে। মদের প্রভাব কেটে গেছে এরইমধ্যে। মনে পড়ে গেল গতরাতে ঘটনা। ঠিক তখনই পিটারসকে বেরিয়ে আসতে দেখল একটা পুলিশের গাড়ি থেকে।

মোনার কথা মনে পড়ল ওর। সেই সাথে গাড়িতে বসা লোকটার কথা। কৃষ্ণাঙ্গ ছেলেটার পাশে দাঁড়িয়ে হাসছে লিন্ডা। একমনে ছবি এঁকে যাচ্ছে ওর বাবা। নিজের কথাও ভাবল সে।

একবারই জীবন, একবারই মরণ।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল ওয়ালান্ডার।

আরও খারাপ হচ্ছে পরিস্থিতি, ভাবল সে। নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে সব।

তখনও বাইরে বৃষ্টি পড়ছে ঝিরিঝিরি।

দশ

বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে ওয়ালান্ডার। কনকনে শীত কাঁপিয়ে দিচ্ছে শরীরের প্রতিটা হাড়। বিকেল পড়ে এসেছে। খুনের ঘটনাস্থলের চারপাশে ফ্লাডলাইট বসিয়েছে পুলিশ। কাদা মাড়িয়ে একটা স্ট্রেচার নিয়ে চলে যাচ্ছে দুজন অ্যাম্বুলেন্স অ্যাটেনডেন্ট। নিয়ে যাচ্ছে মৃত সোমালির লাশ। খুনি যদিওবা কোন সূত্র ফেলে যায় বৃষ্টির কারণে তার কতটুকু অবশিষ্ট আছে, সন্দেহ জাগলো ওয়ালান্ডারের মনে। রিডবার্গের মতো দুঁদে গোয়েন্দারও কষ্ট হবে এই অবস্থায়।

তবুও কিছুটা স্বস্তি পাচ্ছে সে। দশ মিনিট আগেও এক মহিলা আর নয় বাচ্চার কান্নাতে ভারী হয়ে ছিল বাতাস। কাদামাটিতে মাথা ঠেকিয়ে বুক চাপড়াচ্ছিল মহিলা। তার কান্নার আওয়াজ সহ্য করতে না পেরে জায়গা ছেড়ে সরে গেছে কয়েকজন পুলিশ সদস্য। ওয়ালান্ডার অবাক হয়ে দেখেছিল, দু:খিনী মহিলা আর তার বিহ্বল সন্তানদের সামাল দিতে পারছিল একমাত্র মার্টিনসন। ইস্তা পুলিশ বাহিনীর সর্ব কনিষ্ঠ সদস্য, যাকে কিনা তার চাকুরি জীবনে এখন পর্যন্ত কোন পরিবারকে মৃত্যুর সংবাদ পৌছে দিতে হয়নি। হাঁটু গেড়ে বসে মহিলাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল সে, এবং অবাক করার মতো ব্যাপার হলো, ভাষার পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও যেন একে অপরকে বুঝতে পারছিল তারা। যদিও একজন পাদ্রি ডাকা হয়েছিল, কিন্তু কিছুই করার ছিল না তার। শেষ পর্যন্ত মার্টিনসনই ওই মহিলা আর তার সন্তানদের মূল ভবনে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। সেখানে এক ডাক্তার অপেক্ষা করছিল তাদের দেখাশোনার জন্য।

কাদা মাড়িয়ে এগিয়ে এল রিডবার্গ। তার প্যান্ট হাঁটু পর্যন্ত গোটানো।

"কী বাজে অবস্থা," বলল সে। "তবে হ্যানসন আর সুইয়েডবার অসাধারণ কাজ দেখিয়েছে। এক দোভাষীর সাহায্যে তিনজন শরণার্থীকে খুঁজে বের করেছে, যারা সম্ভবত কিছু দেখেছে।"

"কী দেখেছে?"

"আমি কিভাবে জানবো? আমি আরবিও জানি না, সোহিলিও না। প্রত্যক্ষদর্শীদের ইস্তায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ইমিগ্রেশন সার্ভিস বলেছে দোভাষীর ব্যবস্থা করবে।। তবে আমার মনে হয়, ইন্টার্ভিউ তুমি নিলেই ভালো হবে।"

মাথা দুলিয়ে রাজি হয়ে গেল ওয়ালান্ডার। "আর কিছু জানা গেছে?"

নোটবুক বের করল রিডবার্গ। "দুপুর একটার দিকে খুন করা হয় লোকটাকে। রেডিও শুনছিলেন, এমন সময় গুলির শব্দ শুনতে পান পরিচালক। দুবার গুলি করা হয়। মাটিতে পড়ার আগেই মৃত্যু হয় সোমালি লোকটার। সাধারণ বাকশটই ব্যবহার করা হয়েছে সম্ভবত কার্তুজে। গিটর্প ব্রান্ডের, আমার ধারণা। নাইট্রক্স ৩৬, হবে হয়ত।"

"বলতে গেলে কিছুই জানা যায়নি তাহলে।"

"হ্যাঁ। আশা করি প্রত্যক্ষদর্শীরা কিছু জানাতে পারবে।"

"আমি ওভারটাইমের অনুমোদন দিয়ে দিয়েছি সবার জন্য," বলল ওয়ালান্ডার। "এখন দরকার হলে দিন-রাত কলুর বলদের ন্যায় খাটতে হবে।"

স্টেশনে ফিরে এল সে। এবং প্রথম ইন্টার্ভিউতেই হতাশ হতে হলো। প্রথম প্রত্যক্ষদর্শী এসেছে মালাউই থেকে। দোভাষী হিসেবে যাকে পাঠানো হয়েছে সে সোহিলি জানলেও দেখা গেল, তরুণ মালাউইয়ানের একটা কথাও বুঝতে পারছে না। প্রায় বিশ মিনিট নষ্ট করার পর জানা গেল, কিভাবে যেন ছেলেটা লুভেল ভাষায় কথা বলতে পারে। বিষয়টা অদ্ভুত এই কারণে যে, জাইর ও জাম্বিয়ার হাতেগোণা কিছু মানুষ এই ভাষা ব্যবহার করে। ইমিগ্রেশন সার্ভিসের একজন জানালো, সে একজন মিশনারিকে চেনে যে লুভেলে কথা বলতে পারে। তার বয়স নব্বইয়ের কাছাকাছি। থাকে থ্রেলেবোরির আশ্রয়কেন্দ্রে। যোগাযোগ করা হলো মিশনারির সাথে। ইস্তা পুলিশ তার আসা-যাওয়ার ভার নেবে কথা দেওয়ার পর, তবেই আসতে রাজি হলেন তিনি। ওয়ালান্ডারের মনে সন্দেহ ছিল, নব্বই বছরের বয়স্ক মানুষ কতটুকুই বা আর সাহায্য করতে পারবে। কিন্তু তাকে ভুল প্রমাণ করে দিল দরজায় উপস্থিত হওয়া সাদা চুলোর মহিলা। শরীরে বয়সের ছাপ পড়লেও চোখগুলো এখনও প্রাণবন্ত। এসেই কমবয়সী ছেলেটার সাথে কথা বলতে শুরু করে দিলেন তিনি।

কিন্তু বৃথা গেল সব চেষ্টা। জানা গেল, ছেলেটা আসলে কিছুই জানে না।

"তাহলে জিজ্ঞেস করুন, কেন সে প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে এখানে আসতে চাইল," রেগে গিয়ে বলল ওয়ালান্ডার।

লম্বা সময় ধরে কথাবার্তা চলল বৃদ্ধা আর ছেলেটার মাঝে।

"ও ভেবেছিল প্রত্যক্ষদর্শী হওয়াটা রোমাঞ্চকর কিছু," অবশেষে বললেন বৃদ্ধা। "অস্বাভাবিক না এটা।"

"কেন? এটা স্বাভাবিক কেন মনে হচ্ছে আপনার?" বিরক্ত না হয়ে পারল না ওয়ালান্ডার।

"আপনি নিজেও এক সময় তরুণ ছিলেন আশা করি," বললেন বৃদ্ধা।

মালাউইয়ান তরুণটিকে হ্যাজহোমে আর বৃদ্ধাকে থ্রেলেবোরিতে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হলো। তবে হতাশ করল না পরবর্তী প্রত্যক্ষদর্শী। সে একজন ইরানিয়ান, এবং চমৎকার সুইডিশ বলতে পারে। মৃত সোমালি লোকটার মতোই সে-ও তখন হ্যাজহোমের কাছে হাঁটাহাঁটি করছিল যখন গুলির শব্দ শুনতে পায়।

হ্যাজহোমের একটা মানচিত্র নিয়ে এল ওয়ালান্ডার। খুনের ঘটনাস্থলে একটা ক্রস দাগ আঁকলো সে। ইরানিয়ান লোকটা সাথে সাথেই দেখিয়ে দিল গুলি শোনার সময় সে কোথায় ছিল। হিসাব কষে দেখল ওয়ালান্ডার। দুটো জায়গার মাঝে প্রায় ৩০০ মিটারের মতো দূরত্ব।

"গুলির পর গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ শুনতে পাই," বলল লোকটা।

"দেখতে পেয়েছিলেন গাড়িটা?"

"না। আমি তখন জঙ্গলের মধ্যে চলে গিয়েছি হাঁটতে হাঁটতে। ওখান থেকে রাস্তা দেখা যাচ্ছিল না।"

মানচিত্রের দক্ষিণ দিকে ইঙ্গিত করল ইরানিয়ান লোকটা। তারপর এমন একটা কথা বলল, যা চমকে দিল ওয়ালান্ডারকে।

"ওটা সিটোয়েন ব্রান্ডের ছিল।"

"সিটোয়েন ব্রান্ডের?"

"জি, সুইডেনে আপনারা টার্টল বলে ডাকেন যে গাড়িগুলোকে।"

"আপনি না দেখেও কিভাবে বুঝলেন?"

"তেহরানে বড় হয়েছি আমি। যখন ছোট ছিলাম, বন্ধুরা মিলে একটা খেলা খেলতাম-ইঞ্জিনের শব্দ শুনে গাড়ি চেনা। সিটোয়েন ব্রান্ডের, বিশেষ করে টার্টলের ইঞ্জিনের শব্দ চেনা একবারেই পান্তাভাত।"

বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো ওয়ালান্ডারের। "পার্কিং এরিয়ায় আসুন আমার সাথে। বাইরে গিয়ে উল্টো ঘুরে চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকবেন আপনি।"

নিজের পুজো গাড়িটা চালু করল ওয়ালান্ডার। কার পার্কের চারপাশ দিয়ে ঘুরে এল একবার। পুরো সময় সতর্ক দৃষ্টি রাখল ইরানিয়ান লোকটার ওপর।

"এবার বলুন, ফিরে এসে জিজ্ঞেস করল সে। "এটা কোন গাড়ি ছিল?"

"পুজো," দ্বিধা না করে জবাব দিল ইরানিয়ান।

"চমৎকার," বলল ওয়ালান্ডার। "সত্যিই অসাধারণ।"

লোকটাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিল সে। আর আদেশ দিল একটা সিটোয়েনের খোঁজে এপিবি জারি করতে। গণমাধ্যমকেও জানিয়ে দেয়া হলো যে খুনের সাথে জড়িত থাকার সন্দেহে পুলিশ একটা সিটোয়েন খুঁজছে।

তৃতীয় প্রত্যক্ষদর্শী একজন রোমানিয়ান নারী। সাথে করে সন্তানকে নিয়ে এসেছে সে। তার সাথে যে দোভাষী এসেছে, অত ভালো সুইডিশ বলতে পারে না। তবে ওয়ালান্ডার অনুমান করে নিল মহিলার বক্তব্য।

সোমালি লোকটা যে পথে হাঁটছিল, মহিলাও সেই পথে হাঁটছিলেন। এমনকি ক্যাম্পে ফেরার পথে পাশ কাটানোর সময় লোকটাকে দেখেছেও।

"লোকটাকে পাশ কাটানোর কতক্ষণ পর গুলির শব্দ শুনতে পান?" জিজ্ঞেস করল ওয়ালান্ডার।

"আনুমানিক তিন মিনিট।"

"অন্য কাউকে দেখেছিলেন?"

হা বাচক ভঙ্গিতে মাথা দোলাল মহিলা।

আগ্রহের আতিশয্যে সামনে ঝুঁকে গেল ওয়ালান্ডার। "কোথায়? মানচিত্রে দেখাতে পারবেন?"

দোভাষীর কোলে বাচ্চাটাকে দিয়ে মানচিত্রে খুঁজতে লাগল মহিলা। "এখানে," বলল একটা জায়গা দেখিয়ে।

ওয়ালান্ডার দেখল, জায়গাটা খুনের ঘটনাস্থলের কাছেই। "আপনার যা যা মনে আছে, সব বলুন। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। সময় নিন, ভেবেচিন্তে বলুন।"

কিছুক্ষণ ভাবল মহিলা। তারপর বলল, "নীল রঙের ওভারঅল পরা একটা লোককে দেখেছি। মাঠে দাঁড়িয়ে ছিল।"

"দেখতে কেমন?"

"খুব বেশি চুল ছিল না মাথায়।"

"লম্বায়?"

"অত লম্বা না। সাধারণত যেমন হয়।"

"আমার উচ্চতা কি সাধারণত যেমন হয় তেমন?" দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল ওয়ালান্ডার।

"আপনার চেয়েও লম্বা।"

"বয়স?"

"কমও না, আবার বেশিও না। আনুমানিক পঁয়তাল্লিশ।"

"আপনাকে দেখতে পেয়েছিল?"

"মনে হয় না।"

"মাঠে কী করছিল সে?"

"খাচ্ছিল।"

"খাচ্ছিল? কী?"

"একটা আপেল।"

এক মুহূর্ত সময় নিল ওয়ালান্ডার। "নীল ওভারঅল পরা একটা লোক দাঁড়িয়ে ছিল রাস্তার পাশে মাঠে। একটা আপেল খাচ্ছিল সে। এই তো?"

"জি।"

"আর কেউ ছিল তার সাথে?"

"দ্বিতীয় কাউকে দেখিনি। তবে আমার মনে হয় সাথে আরও কেউ ছিল।"

"এমনটা কেন মনে হচ্ছে আপনার?"

"লোকটাকে দেখে মনে হয়েছিল যেন কারও জন্য অপেক্ষা করছে।"

"তার সাথে কোন অস্ত্র দেখতে পেয়েছেন?"

ভেবে দেখল মহিলা। "তার পায়ের কাছে সম্ভবত একটা বাদামি রঙের প্যাকেট ছিল। অবশ্য কাদাও হতে পারে। আমার ঠিক মনে পড়ছে না।"

"আপনি লোকটাকে দেখলেন। তারপর কী হলো?"

"যত দ্রুত পারি ক্যাম্পে ফিরে আসি।"

"কেন? তাড়াহুড়ো করলেন কেন?"

"অচেনা এক আগন্তুকের আশেপাশে থাকতে মন সায় দিচ্ছিল না।"

মাথা দোলালো ওয়ালান্ডার। "কোনও গাড়ি দেখতে পেয়েছিলেন?"

"না।"

"লোকটার আর কোন বর্ণনা দিতে পারবেন?"

এবার বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল মহিলার জবাব দিতে। "তাকে বেশ শক্তিশালী মনে হয়েছিল আমার। হাতগুলো ছিল বিশাল।"

"চুলের রঙ মনে আছে?"

"সুইডিশদের যেমন হয় আরকি।"

"সোনালি?"

"জি। আর অনেকটা এরকম টাক ছিল।" বলে হাত দিয়ে অর্ধচন্দ্রাকৃতি ইঙ্গিত করল মহিলা।

এরপর তাকে ক্যাম্পে ফেরত পাঠিয়ে দিল ওয়ালান্ডার। নিজে গেল কফির খোঁজে। সুইয়েডবার পিৎজা লাগবে কিনা জিজ্ঞেস করলে মাথা দুলিয়ে আনতে বলল সে।

রাত নয়টায় ক্যান্টিনে মিলিত হলো টিমের সবাই। আশ্চর্যজনকভাবে নাসলুন্ড বাদে সবাইকে কমবেশি সতর্ক মনে হলো ওয়ালান্ডারের। নাসলুন্ডের সর্দি লেগেছে, সাথে জ্বর। তবুও গোয়ার্তমি করে থেকে গেছে।

পিৎজা আর স্যান্ডউইচ ভাগাভাগি করে নিতে নিতে এখন পর্যন্ত যত অগ্রগতি হয়েছে, তা সংক্ষেপে বর্ণনা করতে লাগল ওয়ালান্ডার। কামরার এক

কোণায় ঝুলছে খুনের ঘটনাস্থলের একটা মানচিত্র। ক্রস মার্ক দিয়ে দাগানো হয়েছে ঘটনাস্থল। এছাড়া প্রত্যক্ষদর্শীদের অবস্থানও দাগানো আছে।

"শরণার্থী খুনের কেসটায় চমৎকার অগ্রগতি হয়েছে," বলল সে। "দুইজন প্রত্যক্ষদর্শী রয়েছে এই ঘটনার। খুন হওয়ার কিছুক্ষণ আগে রাস্তার ধারের মাঠে নীল ওভারঅল পরিহিত এক পুরুষকে দেখতে পান আমাদের নারী প্রত্যক্ষদর্শী। তার কিছুক্ষণ পর ওই স্থানে হাজির হয় আমাদের ভিক্টিম। সময় ও দূরত্বের বিচারে তা মহিলার বর্ণনার সাথে একদম মিলে যায়। এটাও জানা গেছে যে খুনি একটা সিটোয়েনে করে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে পালিয়ে যায়।"

এমন সময় রিডবার্গ ক্যান্টিনে প্রবেশ করলে সহসাই হাসতে শুরু করে টিমের বাকিরা। পা থেকে গলা পর্যন্ত কাদাতে ঢেকে আছে রিডবার্গ। লাথি ছুড়ে পা থেকে নোংরা, ভেজা জুতো জোড়া খুলে ফেলল সে। তারপর কামড় বসালো একজনের এগিয়ে দেয়া স্যান্ডউইচে। তার জন্য আবার প্রথম থেকে শুরু করল ওয়ালান্ডার।

"তুমি কিছু পেয়েছ?" বলা শেষে জানতে চাইল সে।

"এতক্ষণ যাবত চষে বেড়িয়েছি পুরো মাঠ," জবাব দিল রিডবার্গ। "রোমানিয়ান মহিলা অনেক সাহায্য করেছে। দেখিয়ে দিয়েছে লোকটা কোথায় দাঁড়িয়েছিল। রাবার বুটের ছাপ পাওয়া গেছে ওখানে। মহিলাও বলল, লোকটা নাকি রাবার বুট পরেছিল। সাধারণ সবুজ রঙের রাবার বুট। আর একটা আপেলের অবশিষ্টাংশও পেয়েছি।"

পকেট থেকে একটা প্লাস্টিকের প্যাকেট বের করে আনল সে।

"ভাগ্য ভালো হলে এটা থেকে প্রিন্ট পাওয়া যেতে পারে।"

"আপেল থেকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট বের করা সম্ভব?" জানতে চাইল ওয়ালান্ডার।

"যেকোন কিছু থেকেই প্রিন্ট বের করা সম্ভব," বলল রিডবার্গ। "হোক সেটা মুখের লালা, চুল বা চামড়া।"

তারপর এমনভাবে ব্যাগটা টেবিলে নামিয়ে রাখলো যেন ভেঙ্গে পড়বে একটু এদিকওদিক হলেই।

"এরপর আমি পায়ের ছাপ অনুসরণ করতে থাকি," বলতে থাকল সে। "আর ওই আপেল খাওয়া লোকটাই যদি খুনি হয়ে থাকে, তাহলে আমার ধারণা ঘটনাটা এভাবে ঘটেছে।"

বলতে বলতে নোটবুক থেকে কলম বের নিয়ে এগিয়ে গেল দেয়ালে আটকানো মানচিত্রের দিকে।

"রাস্তা ধরে সোমালি লোকটাকে এগিয়ে আসতে দেখে খুনি। আপেলের অবশিষ্টাংশ ফেলে দিয়ে রাস্তা ধরে সোজা হেঁটে যায় ভিক্টিমের সামনে। রাস্তায়

তার পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে। আনুমানিক চার মিটার দূর থেকে দুবার গুলি ছুড়ে সে। তারপর উল্টো ঘুরে দৌড় দেয়। রাস্তা ধরে ঘটনাস্থল থেকে সরে আসে প্রায় পঞ্চাশ মিটারের মতো। এই অংশে রাস্তা কিছুটা চওড়া হয়ে গেছে। ফলে সহজেই একটা গাড়ির পক্ষে উল্টো ঘোরা সম্ভব। রাস্তায় টায়ারের দাগ খুঁজে পাওয়া গেছে। আর সেই সাথে দুটো সিগারেটের অবশিষ্টাংশ।"

পকেট থেকে আরেকটা প্লাস্টিকের প্যাকেট বের করল সে।

"লোকটা উঠে বসলে গাড়িটা দক্ষিণ দিকে চলে যায়। আমার ধারণা, এভাবেই ঘটেছে ঘটনাটা। আর হ্যাঁ, ধোপার বিল আমি পুলিশ ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়ে দিব।"

"সাইন করে দিব আমি," আশ্বস্ত করল ওয়ালান্ডার। "কিন্তু এখনও অনেক কাজ বাকি।"

স্কুল ছাত্রের মতো হাত তুলল রিডবার্গ।

"আমারও কয়েকটা কথা বলা বাকি আছে এখনও। প্রথমত, আমি নিশ্চিত যে খুনি একা ছিল না। তার সাথে দ্বিতীয় কেউ ছিল। একজন ড্রাইভার, অন্যজন শুটার।"

"এমনটা মনে হওয়ার কারণ?" জিজ্ঞেস করল ওয়ালান্ডার।

"খুন করবার পূর্ব মুহূর্তে যে আপেল খেতে পারে, সে আর যাই হোক ধূমপায়ী না। আমার ধারণা, যে সিগারেট খায়, সে গাড়িতে অপেক্ষা করছিল। আর খুন আপেল খাওয়া লোকটার কাজ।"

যুক্তি আছে কথায়।

"দ্বিতীয়ত, আমার বিশ্বাস পুরো ঘটনাটাই পূর্বপরিকল্পিত। হ্যাজহোমের শরণার্থীরা যে ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে, তা দু-একদিন নজর রাখলেই বোঝা সম্ভব। বেশিরভাগ সময় তারা দলবেঁধেই বের হয়। তবে মাঝে মাঝে দুয়েক জন একা বের হওয়াটা অসম্ভব না। কৃষক সেজে যে কেউ নজর রাখতে পারবে। সন্দেহ জাগবে না কারও মনে। আর জায়গাটার অবস্থানও একদম নিখুঁত। পালানোর জন্য গাড়িটা কাছাকাছি এমনভাবে রাখা সম্ভব যাতে কারও চোখে পড়বে না। এসব কারণে আমার মনে হচ্ছে ঠান্ডা মাথায় করা হয়েছে খুনটা। খুনিরা অবশ্য জানতো না যে কে তাদের শিকার হবে। কিন্তু তাতে কিছু যায়-আসে না তাদের। একজন শরণার্থী হলেই হলো।"

নীরবতা নামল ক্যান্টিনে। রিডবার্গের বিশ্লেষণ এতটাই নিখুঁত যে বিপক্ষে বলার মতো কিছু পেল না কেউ।

সুইয়েডবার কথা বলল অবশেষে। "সিয়িডসভেন্সকান থেকে একটা ক্যাসেট টেপ এসেছে।"

একটা টেপ রেকর্ডার নিয়ে এল একজন। কণ্ঠটা চিনতে দেরি হলো না ওয়ালান্ডারের। এই লোকই দুবার ফোন করে হুমকি দিয়েছে ওকে।

"ক্যাসেটটা স্টকহোমে পাঠাতে হবে," বলল সে। "ওরা হয়ত বিশ্লেষণ করে কিছু খুঁজে পেতে পারে।"

"খুনি কী ধরণের আপেল খাচ্ছিল তাও জানা দরকার," বলল রিডবার্গ। "ভাগ্য ভালো হলে ফলটা কোথা থেকে কিনেছে খুঁজে বের করা যাবে হয়ত।"

এবার খুনের মোটিভ নিয়ে আলোচনা শুরু করল ওরা।

"জাতিগত বিদ্বেষ," বলল ওয়ালান্ডার। "অনেক কারণই থাকতে পারে এর পেছনে। তবে আমার মনে হয়, সুইডিশ নিও-নাৎসি দলগুলো জড়িত কিনা খতিয়ে দেখা দরকার। শুধু স্লোগান এঁকেই ক্ষান্ত হচ্ছে না এরা এখন। ফায়ার বোম মারা, খুনখারাপিতেও জড়িয়ে পড়ছে। তবে আমার মনে হয় না শরণার্থী শিবিরে যারা আগুন লাগিয়েছে, এটাও তাদের কাজ। আগুন লাগানো আর খুনের মাঝে আকাশপাতাল তফাৎ। খুনের ঘটনাটা হয় বিচ্ছিন্ন কারও কাজ, কিংবা কোনভাবে ওই দলগুলোর আন্দোলনের সাথে জড়িত। এদের এবার একটু শিক্ষা দিতে হবে। এছাড়াও সাধারণ মানুষ কেউ কিছু দেখেছে কিনা জানতে হবে। ভাবছি এই নিও-নাৎসীদের ব্যাপারে স্টকহোমের সাহায্য চাইব। এই খুনের ঘটনাটা জাতীয় পর্যায়ে আলোড়ন তুলেছে। একারণে প্রয়োজন অনুযায়ি সব ধরণের সাহায্য আমরা পাব। আর কেউ একজন নিশ্চয় দেখেছে সিটোয়েন গাড়িটা।"

"সিটোয়েন মালিকদের একটা ক্লাব আছে, নাক টেনে জানালো নাসলুন্ড। "তাদের লিস্টের সাথে রেজিস্টার্ড গাড়িগুলোর তালিকা মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। ক্লাবের লোকেরা নিশ্চয় এখানকার সব সিটোয়েন মালিকদের চেনে।"

অ্যাসাইনমেন্ট ভাগ করে দেয়া হলো সবার মাঝে। সাড়ে দশটা বেজে গেল মিটিং শেষ হতে হতে। বাড়ি ফেরার কথা কারও মাথাতেই ছিল না।

পুলিশ স্টেশনের রিসিপশনে একটা প্রেস কনফারেন্সের আয়োজন করল ওয়ালান্ডার। আবেদন করল ই৬৫ রুটে কেউ একটা সিটোয়েন দেখে থাকলে পুলিশকে জানানোর জন্য। এছাড়া খুনির প্রাথমিক বর্ণনা জানালো সাংবাদিকদের। তার বলা শেষ হলে বুলেটের গতিতে ধেয়ে আসতে লাগল একের পর এক প্রশ্ন।

"আজ এ পর্যন্তই," বলে বিদায় নিল সে।

অফিসে ফিরে যাওয়ার পথে হ্যানসন আটকালো ওকে। জানতে চাইল, চীফ অফ ন্যাশনাল পুলিসের টিভি সাক্ষাৎকারের একটা ভিডিও টেপ দেখতে ইচ্ছুক কিনা।

"ইচ্ছা নেই," জবাব দিল ওয়ালান্ডার। "অন্তত এখন না।"

নিজের রুমে ফিরে ডেস্ক পরিষ্কার করল সে। বোনকে ফোন করার কথা যাতে না ভুলে যায়, এজন্য একটা নোট আটকিয়ে দিল টেলিফোন রিসিভারে। তারপর ফোন দিল গোরান বোম্যানের বাসায়।

"কেমন চলছে?" জিজ্ঞেস করল বোম্যান।

"খবর ভালো," বলল ওয়ালান্ডার। "সোমালিয়ান খুনের কেসটায় বেশ কিছু সূত্র পাওয়া গেছে। তবে কাজের চাপ বেড়ে গেল আরকি।"

"আমার কাছেও ভালো সংবাদ আছে।"

"আমিও তেমনটা আশা করছিলাম।"

"সোলভেসবোরিয়ায় আমাদের সহকর্মী নিলস ভেলান্দারকে খুঁজে পেয়েছে। সম্ভবত শিপইয়ার্ডে একটা নৌকা আছে ভেলান্দারের। মাঝে মাঝে ওখানে গিয়ে কাজ করে। ইন্টার্ভিউয়ের অনুলিখন আগামীকাল এসে পৌছাবে আমার হাতে। তবে ক্রোনারের ব্যাপারটা ফোনেই জেনেছি। ভেলান্দারের মতে, প্লাস্টিকের ব্যাগের ওই ক্রোনার তার আন্ডারওয়্যার ব্যবসা থেকে অর্জন করেছে। আঙ্গুলের ছাপের জন্য নতুন নোটের বদলে তার নোটগুলো চেয়েছি। রাজি হয়েছে সে দিতে।"

"আগামীকাল ইস্তার ইউনিয়ন ব্যাংকে যাব," বলল ওয়ালান্ডার। " লভগ্রেনের উঠানো ক্রোনারের সিরিয়াল নম্বর পাওয়া যায় কিনা দেখতে হবে। ভেলান্দারের নোটগুলোর নম্বরের সাথেও মিলিয়ে দেখতে হবে।"

"আগামীকাল এসে পৌছাবে নোটগুলো। তবে আমার মনে হয় না ভেলান্দার জড়িত এই কেসের সাথে।"

"কেন?"

"জানি না।"

"কী ভালো সংবাদের কথা বলছিলে যেন?"

"ও হ্যাঁ। লিস্টের তৃতীয় মহিলার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম আমি। তোমাকে না জানিয়ে যাওয়ায় আশা করি কিছু মনে করবে না।"

"অবশ্যই না।"

"যা বলছিলাম, তুমি তো জানোই, মহিলার নাম অ্যালেন ম্যাগনোসন। বয়স ষাটের কোঠায়। পেশায় কেমিস্ট, কৃষানইস্তায় কাজ করে। তার সাথে আগেও দেখা হয়েছে। কয়েক বছর আগে তার গাড়ির নিচে চাপা পড়ে মারা গিয়েছিল এক শ্রমিক। ঘটনাটা ঘটে এভারডে, বিমানবন্দরের বাইরে। মহিলা দাবি করেছিলেন, সূর্যের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ায় দেখতে পাননি। এতে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। ১৯৫৫ সালে এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিই তিনি।

এবং পিতৃপরিচয় অজ্ঞাত বলে উল্লেখ করেন। তার ছেলের নাম এরিক, মালমোতে থাকে। কাউন্টি কাউন্সিলে সিভিল সার্ভেন্ট হিসেবে কর্মরত আছে। মহিলার বাড়ি গিয়ে হয়েছিলাম আমি। পুলিশ হিসেবে পরিচয় দেয়ার সময় ভয় ফুটে উঠতে দেখি তার চেহারায়। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল, যেন পুলিশের অপেক্ষাতেই ছিলেন। ইয়োহানেস লভগ্রেনকে তার সন্তানের পিতা হিসেবে অস্বীকার করেন মহিলা। কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছিল আমার, মিথ্যা বলেছেন তিনি। যদি আমার ওপর ভরসা থাকে, তাহলে বলব এই মহিলার ওপরই আমাদের গুরুত্ব দেয়া উচিত। তাই বলে ওই খাঁচা পাচারকারী আর তার মাকে ছেড়ে দিব, তা বলছি না।"

"আগামী চব্বিশ ঘন্টায় মনে হয় না হাতের কাজটা ছেড়ে ওদিকটায় নজর দিতে পারব," বলল ওয়ালান্ডার। "তুমি যা করেছ, তার জন্য কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব।"

"কাগজপত্র পাঠিয়ে দিব আমি," বলল বোম্যান। "সাথে ক্রোনারের নোটগুলোও। ক্রোনার বুঝে নিয়ে একটা রিসিপ্ট দিয়ে দিয়ো।"

"এসব ঝামেলা থেকে মুক্তি পেলে একসাথে বসে একদিন হুইস্কি খাওয়া যাবে," বলল ওয়ালান্ডার।

"পূর্ব ইউরোপে মাদক চোরাচালানের নতুন রুট নিয়ে মার্চে একটা কনফারেন্স হবে স্লোগহোম ক্যাসেলে," বলল বোম্যান। "হুইস্কি সেখানে খেলে কেমন হয়?"

"লা-জবাব," বলল ওয়ালান্ডার।

ফোন রেখে মার্টিনসনের কামরায় গেল সে। জানতে চাইল সিটোয়েন নিয়ে নতুন কিছু জানা গেছে কিনা। মাথা নাড়ালো মার্টিনসন। নতুন কিছু জানা যায়নি।

রাত বাজে সাড়ে এগারোটা। অফিসে ফিরে ডেস্কে পা তুলে বসল ওয়ালান্ডার। ভাবতে লাগল চোখ বুজে। ধীরে ধীরে রুপ নিতে লাগল জট পাকানো সব চিন্তা। প্রথমেই শরণার্থী শিবিরের বাইরে ঘটে যাওয়া খুন। কিছু কি ভুলে গেছে সে? বাদ পড়েছে কি কিছু রিডবার্গের বর্ণনায়?

শেষতক সিদ্ধান্তে পৌছালো, চমৎকারভাবেই এগুচ্ছে তদন্ত। এখন বিভিন্ন টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস আর সিটোয়েন গাড়িটা খুঁজে পাবার অপেক্ষা। চেয়ারে একটু কাত হয়ে বসে, টাই ঢিলে করে বোম্যানের বলা কথা গুলো ভাবতে লাগল সে। বোম্যানের ওপর নির্ভর করা যায়। সে যদি ভেবে থাকে যে মহিলা মিথ্যা বলেছে, তাহলে সেটাই ধরে নিতে হবে। কিন্তু নিলস ভেলান্দারকে তেমন পাত্তা দিচ্ছে না কেন সে?

ডেস্ক থেকে পা নামিয়ে একটা সাদা কাগজ বের করল ওয়ালান্ডার। চটপট লিখে নিতে লাগল আগামী কয়েকদিনের করণীয়। যদিও আগামীকাল শনিবার, তবুও চেষ্টা করবে কতৃপক্ষকে বলে ইউনিয়ন ব্যাংক খোলানোর জন্য।

লিস্ট বানানো শেষে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল সে। মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। বাইরে করিডোর থেকে হ্যানসন আর মার্টিনসনের গলা ভেসে আসছে। তবে কথা বোঝা যাচ্ছে না।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ওয়ালান্ডার। বাতাসে দোল খাচ্ছে স্ট্রিটলাইট। সারাদিন বেশ ধকল গেছে। গোসল করার সময়টুকুও পায়নি সে। নিচতলায় চেঞ্জিং রুমে গিয়ে গোসল সেরে আসবার কথা ভাবল একবার। তারপর জানালা খুলে দিয়ে বুক ভরে নিল শীতল বাতাসে।

শান্তি উবে গেছে ওর মন থেকে। আবারও কেউ খুন হওয়ার আগে কিভাবে থামাবে ওই উন্মাদকে?

এরপর খুন হবে এক মহিলা। মারিয়া লভগ্রেনের মৃত্যুর প্রতিশোধ।

চেয়ারে বসে একটা ফোল্ডার টেনে বের করল ওয়ালান্ডার। স্কেওনার শরণার্থী শিবিরগুলোর যাবতীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করা আছে তাতে।

খুনির হ্যাজহোমে ফিরে আসার সম্ভাবনা ক্ষীণ। কিন্তু তাতে কিছু যায়-আসে না। বরং হ্যাজহোমের ঘটনাটার মতো যদি বিচ্ছিন্নভাবে যেকোন একজনকে খুন করার সিদ্ধান্ত নেয়, তাতে ঝামেলা অনেক কমবে তার। শরণার্থীরা তো আর হাতপা গুটিয়ে ক্যাম্পে বসে থাকতে পারবে না।

ফোল্ডারটা একপাশে রেখে টাইপরাইটারে একটা কাগজ ঢুকাল ওয়ালান্ডার। বিয়র্কের কাছে জমা দেয়ার জন্য মেমো লিখবে ভাবছে, এমন সময় এল সুইয়েডবার।

"কিছু হয়েছে?" জিজ্ঞেস করল ওয়ালান্ডার।

"বুঝতে পারছি না কিভাবে বলব। লুদেরুপ থেকে এক কৃষক ফোন দিয়েছে।"

"কেউ দেখেছে সিটোয়েন গাড়িটা?"

"না। লোকটা বলল, আপনার বাবা নাকি পায়জামা পরে হাতে স্যুটকেস নিয়ে মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।"

বাজ পড়ল যেন ওয়ালান্ডারের মাথায়। "কী বলছ তুমি?"

"শুনে মনে হয়নি বানিয়ে বলেছে লোকটা। আসলে আপনার সাথে কথা বলতে চাইছিল সে। কিন্তু সুইচবোর্ড ভুলে আমার কাছে পাঠিয়ে দেয় কলটা।"

শূন্য মুখে কিছুক্ষণ বসে রইল ওয়ালান্ডার। তারপর উঠে দাঁড়াল। "কোথায় জায়গাটা?"

"লোকটার কথায় যতটুকু বুঝলাম, মূল মহাসড়ক ধরে হেঁটে যাচ্ছিলেন আপনার বাবা।"

"আমি দেখছি বিষয়টা। যত দ্রুত সম্ভব ফিরে আসার চেষ্টা করব। কিছু ঘটলে ফোন করে জানাবে আমাকে।"

"আমি সাথে আসব?"

মাথা নাড়িয়ে না করে দিল ওয়ালান্ডার। "বয়স হয়েছে বাবার। মাথায় সমস্যা দেখা দিচ্ছে। কোন বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।"

সদর দরজা ছেড়ে বাইরে এসে ছায়ার মধ্যে একজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল সে। বৈকালীন এক পত্রিকার সাংবাদিকটাকে চিনতে ভুল হলো না ওর।

"আমার পিছু নিতে যেন না পারে লোকটা," সুইয়েডবারকে বলল সে।

মাথা দোলাল সুইয়েডবার। "তার গাড়িটা আটকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।"

অপেক্ষা করতে লাগল ওয়ালান্ডার। টের পেয়ে তাড়াহুড়ো করে নিজের গাড়িতে গিয়ে বসল সাংবাদিক। কয়েক সেকেন্ড পর সুইয়েডবারের গাড়ি গিয়ে পথরোধ করল সাংবাদিকের। চলে গেল ওয়ালান্ডার।

দ্রুত গাড়ি ছুটাল সে। গতিসীমার পরোয়া করলো না। ভয় পেয়ে ভেজা রাস্তা ছেড়ে পালাল খরগোশের দল।

ওর বাবা যে গ্রামে থাকে, অবশেষে সেখানে পৌছাল সে। কষ্ট করে খুঁজতেও হলো না বুড়ো মানুষটাকে। হেডলাইটের আলোয় স্পষ্ট দেখা গেল তাকে। পরনে নীল রঙের পায়জামা, মাথায় হ্যাট আর হাতে বড় একটা স্যুটকেস। খালি পায়ে ঘুরছেন মাঠে। চোখে হেডলাইটের আলো পড়লে হাত দিয়ে চোখ আড়াল করলেন তিনি। তারপর হাঁটতে লাগলেন আবারও। এবার আরও জোর কদমে, যেন দেরি হয়ে যাচ্ছে তার।

হেডলাইট জ্বালিয়ে রেখে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল ওয়ালান্ডার। তারপর হাঁটতে লাগল মাঠের দিকে।

"বাবা!" চেঁচালো সে। "কী করছেন আপনি?"

উত্তর দিলেন না ওর বাবা। হাঁটাও থামালেন না। পিছু নিল ওয়ালান্ডার। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। কাদাপানি লেগে ভিজে গেল কোমর পর্যন্ত।

"বাবা!" চেঁচালো আবারও। "দাঁড়ান! কোথায় যাচ্ছেন?"

এবারওকোন উত্তর এল না। বরং ওর বাবার হাঁটার গতি যেন বেড়ে গেল। আরেকটু এগোলেই মহাসড়ক। দৌড়ে গিয়ে পিতার হাত ধরল ওয়ালান্ডার।

ঝাঁকি দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিলেন ওর বাবা। তারপর আবারও হাঁটতে লাগলেন।

এবার রেগে গেল ওয়ালান্ডার। "পুলিশ," বলল চেঁচিয়ে। "থামুন। নইলে গুলি ছুড়তে বাধ্য হব।"

থমকে গিয়ে উল্টো ঘুরলেন ওর বাবা। হেডলাইটের আলোয় তাকে চোখ পিটপিট করতে দেখল ওয়ালান্ডার।

"বলেছিলাম না?" চেঁচিয়ে বললেন বৃদ্ধ। "আমাকে মেরে ফেলতে চাও তুমি!"

তারপর হাতের স্যুটকেসটা ছুড়ে মারলেন ছেলের দিকে। ঢাকনা খুলে গিয়ে মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল ভেতরে থাকা নোংরা আন্ডারওয়্যার, রঙের টিউব আর তুলি। মন ভারী হয়ে এল ওয়ালান্ডারের। এই রাতবিরাতে ইতালির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছে ওর বাবা।

"শান্ত হোন," বাবা, বলল সে। "আমি আপনাকে রেল স্টেশনে পৌঁছে দিতে এসেছি যাতে আপনার হেঁটে যেতে না হয়।"

সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালেন ওর বাবা। "আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না।"

"আপনি বেড়াতে যাচ্ছেন। আর আমি আমার বাবাকে বিদায় জানাতে আসব না?"

স্যুটকেসের ঢাকনা লাগিয়ে গাড়ির উদ্দেশ্যে চলল ওয়ালান্ডার। তারপর স্যুটকেসটা বুটে রেখে অপেক্ষা করতে লাগল। হেডলাইটের আলোয় ফাঁদে পড়া জন্তুর মতো দেখাচ্ছে ওর বাবাকে। জীবনযুদ্ধ শেষে ক্লান্ত, শেষ পরিণতির জন্য অপেক্ষারত এক মনুষ্য জীব। চোখেমুখে দ্বিধা নিয়ে গাড়ির দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন তিনি।

গাড়ির পেছনের সিটের দরজা খুলে ধরল ওয়ালান্ডার। ভেতরে গিয়ে বসলেন ওর বাবা। বুট থেকে একটা কম্বল বের করে এনেছিল ওয়ালান্ডার। বাবার গায়ে সেটা জড়িয়ে দিল সে।

এমন সময় ছায়া থেকে একটা বুড়ো লোককে বেরিয়ে আসতে দেখে পিলে চমকে গেল ওর।

"আমিই ফোন করেছিলাম পুলিশের কাছে," বলল ময়লা ওভারঅল পরা লোকটা। "এখন কী অবস্থা?"

"ভালো," জবাব দিল ওয়ালান্ডার। "ধন্যবাদ ফোন করার জন্য।"

"ভাগ্য ভালো আমার চোখে পড়েছিল।"

"জি। আবারও ধন্যবাদ আপনাকে।"

চালকের আসনে গিয়ে বসল ওয়ালান্ডার। পিছনে তাকিয়ে দেখে শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে ওর বাবা।

"এবার স্টেশনের দিকে যাওয়া যাক," বলল সে। "বেশিক্ষণ লাগবে না।"

তারপর সোজা চলে এল হাসপাতালের জরুরি বিভাগে। ভাগ্য ওর ওপর সুপ্রসন্নই বলতে হয়। দেখা হয়ে গেল মারিয়া লভগ্রেনের মৃত্যুর সময় পরিচয় হওয়া এক ডাক্তারের সাথে। ডাক্তারকে সব খুলে বলল সে।

"পর্যবেক্ষণের জন্য আজ রাতটা উনাকে এখানে রাখতে হবে," বলল ডাক্তার। "আগামীকাল সোশ্যাল ওয়ার্কারের সাথে কথা বলে উনার একটা গতি কর.র চেষ্টা করব।"

"ধন্য বাদ," বলল ওয়ালান্ডার। "আমি এখন বাবার সাথে কিছুক্ষণ থাকতে চাই।"

এরিমধ্যে নেতিয়ে পড়েছেন ওর বাবা। শুয়ে আছেন একটা স্ট্রেচারে।

"অবশেষে আমি ইতালি যাচ্ছি," বললেন তিনি।

স্ট্রেচারের পাশে একটা চেয়ারে বসল ওয়ালান্ডার। "ঠিক বলেছেন। এবার ঠিক ইতালি পৌছে যাবেন।"

হাসপাতাল থেকে ওর বের হতে হতে দুইটা বেজে গেল। স্টেশনে ফিরে এল সে। ন্যাশনাল পুলিশ প্রধানের টিভি অনুষ্ঠানটা দেখছিল হ্যানসন। বাদবাকি সবাই বাড়ি চলে গেছে ততক্ষণে।

"নতুন কোন খবর?" জানতে চাইল ওয়ালান্ডার।

"না," বলল হ্যানসন। "কয়েকটা টিপ-অফ এসেছিল অবশ্য। কিন্তু গুরুত্ব দেয়ার মতো না। আমি জোর করে সবাইকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি। কয়েক ঘন্টা ঘুমিয়ে আসুক।"

"ভালো করেছ। কিন্তু সিটোয়েন গাড়িটার কোন খোঁজ পাওয়া গেল না কেন, ভাবাচ্ছে আমাকে।"

"আমিও তাই ভাবছিলাম। হয়ত ই৬৫ রুট ধরে কিছুদুর গিয়ে অন্য কোন রাস্তা দিয়ে উল্টো পথ ধরেছে। মানচিত্র নিয়ে একটু ঘাঁটাঘাঁটি করেছিলাম। ওই জায়গায় ছোট ছোট অনেক রাস্তা আছে। একটা অভয়ারণ্যও আছে। শীতে ওদিকটা কেউ মাড়ায় না। ক্যাম্পগুলো যারা প্রহরা দেয়, তারা আজ রাতে ওই রাস্তাগুলোতে চিরুনি অভিযান চালাবে।"

মাথা দোলাল ওয়ালান্ডার। "আবহাওয়া একটু ঠিক হলে হেলিকপ্টার পাঠাতে হবে। ওই অভয়ারণ্যেই হয়ত লুকানো আছে গাড়িটা।"

বলতে বলতে এক কাপ কফি ঢেলে নিল।

"তোমার বাবার কথা বলল সুইয়েডবার," বলল হ্যানসন। "এখন কী অবস্থা?"

"হাসপাতালে রেখে এসেছি। বয়সের রোগ ধরেছে বুড়োর। তবে মারাত্মক কিছু ঘটেনি।"

"বাসায় চলে যাও। ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে। কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নাও।"

"কয়েকটা জিনিস লেখা বাকি আছে।"

ভিডিও বন্ধ করে দিল হ্যানসন। "আমি তাহলে খানিকক্ষণ সোফায় গড়িয়ে উঠি।"

অফিসে ফিরে টাইপরাইটার নিয়ে বসল ওয়ালান্ডার। ক্লান্তিতে চোখ লেগে আসতে চাইছে। কিন্তু মাথাটা ভালো কাজ করছে অদ্ভুতভাবে। দুটো খুন হয়েছে এক অজপাড়া গাঁয়ে, সাজিয়ে নিতে লাগল সে মনে মনে। এই দুটো খুনের কারণে মরতে হলো এক নিরাপরাধ মানুষকে। এসবই ঘটেছে এক সপ্তাহের মধ্যে। ধেয়ে আসছে আরও একটা মৃত্যু। তা ঠেকাতে হলে জোড়াখুনের দ্রুত সমাধান করতে হবে আমাদের।

বিয়র্ককে দেয়ার জন্য মেমো লিখে ফেলল সে। সিদ্ধান্ত নিল, বিমানবন্দরে নামার সাথে সাথে পুলিশ প্রধানের কাছে যেন ওটা পৌঁছে তা নিশ্চিত করবে। হাই তুলে ঘড়ির দিকে তাকাল সে। তিনটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিট। নিজের পিতার কথা ভাবতে চাইল না। ভয় পাচ্ছে, হাসপাতালের সোশ্যাল ওয়ার্কার হয়ত ওর বাবার জন্য ভালো কোন সমাধান বের করতে পারবে না।

ওর বোনের নাম লেখা নোটটা এখনও আটকানো আছে টেলিফোনে। আলো ফুটবে কয়েক ঘন্টার মধ্যে। তখন ফোন দিবে বলে ঠিক করল।

আবারও হাই তুলল ওয়ালান্ডার। হাত তুলে বগল শুঁকলো। দুর্গন্ধে নাক কুঁচকে এল ওর। এমন সময় অর্ধেক ভেজানো দরজা দিয়ে উঁকি দিল হ্যানসন। তার চোখ দেখেই ওয়ালান্ডার বুঝে গেল, কিছু একটা ঘটেছে।

"এই মাত্র একটা ফোন এসেছে মালমো থেকে," বলল হ্যানসন। "একটা লোক বলল তার গাড়ি নাকি চুরি হয়েছে।"

"সিটোয়েন?"

মাথা দুলিয়ে সায় জানালো হ্যানসন।

"রাত চারটা বাজে কিভাবে বুঝল সে যে তার গাড়ি উধাও?"

"বলল, ইয়োতেবোরিয়ায় একটা বাণিজ্য মেলায় যাওয়ার জন্য নাকি রওনা হচ্ছিল। তখন দেখে তার গাড়ি উধাও।"

"মালমোর পুলিশ স্টেশনে জানিয়েছে?"

মাথা দোলাল হ্যানসন।

রিসিভার তুলে নিল ওয়ালান্ডার। মালমোর পুলিশ জানালো, ঘটনাটা ভালো করে তলিয়ে দেখবে তারা। চুরি যাওয়া গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নম্বর, মডেল, সাল আর রঙ ইতোমধ্যে জানিয়ে দেয়া হয়েছে জেলার সব পুলিশ স্টেশনে।

"বিবিএম ১৬০," জানালো হ্যানসন। "নীলচে রঙের একটা টার্টল। ছাদ সাদা। এরকম কয়টা গাড়ি থাকতে পারে এই জেলায়? একশো?"

"যদি না পুঁতে ফেলে, তাহলে খুঁজে পাওয়া যাবেই," বলল ওয়ালান্ডার। "সূর্য উঠবে কয়টায়?"

"আটটা-নয়টার দিকে," জানালো হ্যানসন।

"আলো ফোটা মাত্র একটা হেলিকপ্টার পাঠাতে হবে অভয়ারণ্যে। এ কাজের ভার তোমাকে দিলাম।"

মাথা দোলাল হ্যানসন। চলে যেতে গিয়ে থেমে গেল সে।

"ধুস! একটা কথা বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম।"

"কী?"

"যে লোকটা ফোন করেছিল, মানে যার গাড়ি চুরি গেছে, সে একজন প্রাক্তন পুলিশ অফিসার।"

পরিষ্কার শোনা সত্ত্বেও যেন কথাটা বুঝতে পারল না ওয়ালান্ডার। "মানে?"

"মানে তোমার-আমার মতোই সে-ও এককালে পুলিশে ছিল।"

এগারো

স্টেশনের একটা হোল্ডিং সেলে ঢুকে শুয়ে পড়ল ওয়ালান্ডার। খানিক ঘুমিয়ে নিবে। কিছুক্ষণ শুঁতোশুঁতি করে সক্ষম হলো হাতঘড়িতে অ্যালার্ম দিতে। ঘুম ভাঙলো দুই ঘন্টা পর বিপবিপ শব্দ শুনে। উঠে বসতে গিয়ে টের পেল, মাথা কেমন ভার হয়ে আছে। তৎক্ষণাৎ মনে পড়ল ওর বাবার কথা। কাবার্ড খুঁজে কয়েকটা অ্যাসপিরিন পেল সে। কুসুমগরম কফির সাথে গিলে ফেলল ওষুধগুলো। এরপর আগে গোসলে যাবে নাকি ওর বোনকে ফোন দিবে, এ নিয়ে দ্বিধায় পড়ে গেল।

শেষতক নিচে চেঞ্জিং রুমে গিয়ে গোসল করে নিল সে। মাথাব্যথা চলে গেছে পানির শীতল পরশ পেয়ে। কিন্তু বোঝা হয়ে চাপছে নানা দুশ্চিন্তা। অফিসে ফিরে চেয়ারে গিয়ে বসল সে। সকাল সাতটা বেজে পনের মিনিট। ওর বোন ক্রিস্টিনা ভোর হতেই উঠে পড়ে ঘুম থেকে। ফোন দেয়া মাত্রই রিসিভ করল সে। সবকিছু খুলে বলল ওয়ালান্ডার।

"আগে জানাওনি কেন আমাকে?" বলল ক্রিস্টিনা। "এসব নিশ্চয় একদিনে হয়নি।"

"আমি বুঝে উঠতে পারিনি," বলল ওয়ালান্ডার।

ভাইবোনে মিলে সিদ্ধান্ত নিল, ওয়ালান্ডার সোশ্যাল ওয়ার্কারের সাথে কথা বলা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ক্রিস্টিনা। তারপর নাহয় আসা যাবে স্কেওনাতে।

"মোনা আর লিন্ডা কেমন আছে?" বিদায় নেয়ার আগে জিজ্ঞেস করল ক্রিস্টিনা।

ওয়ালান্ডারের মনেই ছিল না যে বিচ্ছেদের কথা বোনকে জানায়নি।

"ভালো," বলল সে। "পরে কথা হবে তাহলে।"

ফোন রেখে রওনা হলো হাসপাতালের উদ্দেশ্যে। আবারও কমতে শুরু করেছে তাপমাত্রা। দক্ষিণপশ্চিম থেকে ধেয়ে আসছে হাড়কাঁপানো শৈত্যপ্রবাহ।

হাসপাতালে পৌছে ডিউটিতে থাকা নার্সের সাথে দেখা করল ওয়ালান্ডার। নার্স জানালো, রাতে ভালো ঘুম হয়নি ওর বাবার। এছাড়া আর কোন সমস্যা হয়নি। বাবার সাথে দেখা করার আগে সোশ্যাল ওয়ার্কারের সাথে কথা বলার সিদ্ধান্ত নিল ওয়ালান্ডার।

সোশ্যাল ওয়ার্কারদের মোটেও বিশ্বাস করে না সে। চাকুরি জীবনের বহুবার মুখোমুখি হতে হয়েছে এদের। অপ্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের তুলে দিতে হয়

সোশ্যাল ওয়ার্কারদের হাতে। ওয়ালান্ডারের মতে, সোশ্যাল ওয়ার্কাররা হলো অকর্মার ঢেঁকি। এদের নরম ব্যবহার পেয়ে অপ্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীরা না শুধরিয়ে বরং আরও অন্ধকারে চলে যায়। এ নিয়ে কম রাগ ঝাড়েনি সে ওয়েলফেয়ার কর্তৃপক্ষগুলোর ওপর।

কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছি এক মহিলা স্বাগত জানালো তাকে। পিতার আকস্মিক অবনতির কথা জানালো ওয়ালান্ডার।

"এটা ক্ষণস্থায়ীও হতে পারে," বলল মহিলা। "বয়স হলে মানুষ এমন উদ্ভট আচরণ করতে পারে মাঝেমাঝে। আসলে এমন বয়সে এসে তাদের দরকার পারিবারিক যত্ন। তবে যদি দেখা যায় যে বাস্তবিকই আপনার পিতা বোধবুদ্ধি হারিয়েছেন, সেক্ষেত্রে একটা ব্যবস্থা তো করতেই হবে।"

সিদ্ধান্ত হলো, এই সপ্তাহটা পর্যবেক্ষণ করা হবে ওয়ালান্ডারের পিতাকে। তারপর ডাক্তারের সাথে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেবে মহিলা। চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল ওয়ালান্ডার। মহিলার কথাবার্তা শুনে কিছুটা ভরসা পাচ্ছে।

"ধন্যবাদ আপনাকে," বলল সে। "হঠাৎ করে এমন একটা পরিস্থিতিতে পড়ে দিশেহারা পড়েছিলাম।"

মাথা দোলাল মহিলা। "জানি কতটা বিড়ম্বনায় পড়তে হয় যখন সন্তানরা বাধ্য হয় তাদের জন্মদাতা-জন্মদাত্রীদের বাবা-মায়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে। আমার মায়েরও মাথা বিগড়ে যাচ্ছিল। শেষতক এমন অবস্থা হয় যে বাড়িতে রাখা যাচ্ছিল না।"

পিতাকে দেখতে গেল ওয়ালান্ডার। ওর বাবা যে রুমে থাকছেন, আরও চারটা বেড আছে সেখানে। প্রত্যেকটাতেই মানুষ আছে। একজনের হাত কাস্ট করা, আরেকজন এমনভাবে শুয়ে আছে যেন পেট ব্যথায় ভুগছে। ওয়ালান্ডারের বাবা তাকিয়ে আছেন সিলিঙের দিকে।

"কেমন আছেন, বাবা?" জিজ্ঞেস করল ওয়ালান্ডার।

কয়েক মুহূর্ত পর জবাব দিলেন ওর বাবা। নিচু স্বরে বললেন, "চলে যাও এখান থেকে।"

ওয়ালান্ডারের মনে হলো, বুকভরা ব্যথা নিয়ে কথাটা বলেছেন ওর বাবা। অসহায় বোধ করল সে। খাটের কিনারায় কিছুক্ষণ বসে থাকল। তারপর চলে যেতে উদ্যত হলো।

"পরে আবার আসব, বাবা। আর ক্রিস্টিনাও আসছে।"

দ্রুত পায়ে হাসপাতাল ছেড়ে বেরিয়ে এল সে। বাইরে এসে দাঁড়াতেই শীতল বাতাস এসে ঝাপটা মেরে গেল ওর মুখে। স্টেশনে ফিরে যেতে ইচ্ছা করল না। জানিয়ে দিতে হ্যানসনকে ফোন দিল কার ফোন থেকে।

"আমি মালমো যাচ্ছি," বলল সে। "হেলিকপ্টার রওনা হয়েছে?"

"আধ ঘন্টা আগেই হয়েছে," জানালো হ্যানসন। "এখনও ওখানেই আছে। কিন্তু কিছু খুঁজে পায়নি। দুইটা ডগ পেট্রলও পাঠানো হয়েছে। অভয়ারণ্যে যদি ওই গাড়ি থেকে থাকে, খুঁজে বের করবই।"

মালমোর উদ্দেশ্যে রওনা হলো ওয়ালান্ডার। রাস্তায় মারাত্মক জ্যাম। পাশ কাটিয়ে যাওয়া গাড়িগুলো মাঝেমাঝেই শোল্ডারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে তাকে। একটা স্কোয়াড কার নিয়ে বের হলে ভালো হত, ভাবল সে। অবশ্য আজকাল তাতে লাভ হয় কিনা কে জানে।

মালমো পুলিশ স্টেশনে এসে পৌছাল সে। গাড়ি চুরি গেছে যার, ওয়ালান্ডারের জন্য অপেক্ষা করছিল সেই লোকটা। তার সাথে কথা বলবার আগে চুরির রিপোর্ট যে অফিসার লিখেছিলেন, তার সাথে কথা বলল ওয়ালান্ডার।

"উনি কি সত্যিই আগে পুলিশে ছিলেন?" জানতে চাইল সে।

"জি," জবাব দিল অফিসার। "তবে বেশিদিন চাকুরি করেননি। আর্লি-রিটায়ারমেন্টে চলে যান।"

"কেন?"

শ্রাগ করল অফিসার। "অসুস্থতাজনিত কারণে বোধ হয়। আমি নিশ্চিত না।"

"উনাকে আপনি চেনেন?"

"যদিও দশ বছর কাজ করেছি একত্রে, তবুও চিনি বললে ভুল হবে। অতটা মিশতেন না তিনি।"

"কেউ না কেউ নিশ্চয় আছে যার সাথে খাতির ছিল?"

আবারও শ্রাগ করল অফিসার। "আমি খুঁজে দেখব। তবে বলে রাখি, চোর যে কেউই হতে পারে।"

কথা শেষে ওয়ালান্ডার লোকটার সাথে দেখা করতে গেল। তার নাম রুন বার্গম্যান। বয়স তেপ্পান। চার বছর হলো অবসরে গেছে। শীর্ণ দেহ, দুচোখে অস্থিরতা। নাকের একপাশে কাটা দাগটা ছুরির আঘাত সম্ভবত।

দেখামাত্রই লোকটাকে অতিরিক্ত সতর্ক মনে হলো ওয়ালান্ডারের। কারণটা সে নিজেও জানে না। আর যতই কথা এগোলো লোকটার সাথে, ততই জোরালো হলো অনুভূতিটা।

"বলুন আপনি যা যা জানেন," বলল সে। "ভোর চারটায় আপনি দেখেন যে আপনার গাড়ি নেই।"

"ইয়োতেবোরিয়া যাবার জন্য বের হয়েছিলাম। দূর যাত্রার ক্ষেত্রে সাধারণত ভোর থাকতেই বেরিয়ে পড়ি আমি। বেরিয়ে দেখি গাড়িটা উধাও।"

"গ্যারেজ নাকি পার্কিং প্লেস থেকে?"

"আমার বাসার সামনেই রাখা ছিল গাড়িটা। গ্যারেজ আছে যদিও, কিন্তু ওখানে এত মালামাল রাখা আছে যে গাড়ি রাখবার জায়গা নেই।"

"কোথায় থাকেন?"

"জ্যাগেসরোর কাছেই একটা শহরতলীতে।"

"আপনার প্রতিবেশীদের কেউ কিছু দেখেছে?"

"জিজ্ঞেস করেছিলাম। কেউ কিছু দেখেনি, শোনেওনি।"

"শেষ কবে দেখেছেন গাড়িটা?"

"সারাদিন বাসা থেকে বের হইনি। তবে গতকাল রাতেও ছিল।"

"লক করা ছিল?"

"অবশ্যই।"

"স্টিয়ারিং হুইলে লক ছিল?"

"না। ওই লকটা ভাঙা ছিল।"

স্বাভাবিকভাবেই উত্তর দিচ্ছে লোকটা। কিন্তু এখনও তাকে সন্দেহজনকভাবে সতর্ক মনে হচ্ছে ওয়ালান্ডারের।

"যে বাণিজ্যমেলায় আপনি যাচ্ছিলেন, তা কিসের মেলা?" জিজ্ঞেস করল সে।

বিস্ময় ফুটল লোকটার চেহারায়। "এটা কেমন প্রশ্ন? এসব কেন জানতে চাইছেন?"

"এমনি জানতে চাইছি।"

"বিমান মেলা।"

"বিমান মেলা?"

"জি, নানা মডেলের বিমান প্রদর্শন করা হয় ওখানে। পুরাতন বিমানের প্রতি ঝোঁক আছে আমার। আমি নিজেও বিমানের মডেল বানাই।"

"আপনি নাকি দ্রুত অবসর নিয়েছিলেন?"

"কী যা-তা প্রশ্ন করছেন আপনি? আমার গাড়ি চুরি যাওয়ার সাথে এসবের কী সম্পর্ক?"

"কোনও সম্পর্ক নেই।"

"তাহলে আজেবাজে প্রশ্ন না করে আমার গাড়ির চোরকে ধরার চেষ্টা করুন।"

"চেষ্টা করা হচ্ছে। আমাদের ধারণা, আপনার গাড়ি চোর সম্ভবত খুনের সাথে জড়িত।"

সরাসরি ওয়ালান্ডারের চোখের দিকে তাকাল লোকটা। নার্ভাস ভাবটা চলে গেছে।

"শুনেছি আমি," বলল সে।

আর কিছু জিজ্ঞেস করার নেই ওয়ালান্ডারের। "আপনার বাসায় যেতে হবে। গাড়িটা কোথায় পার্ক করা ছিল দেখতে হবে।"

"আমার বাসার অবস্থা কিন্তু খুবই খারাপ। আশা করি সমস্যা হবে না।"

"বিবাহিত?"

"ডিভোর্স হয়ে গেছে।"

ওয়ালান্ডারের গাড়িতে করে রওনা হলো ওরা। জ্যাগেসরো পেরিয়ে থামল একটা হলদে ইটের বাড়ির সামনে। ছোট একটা লন আছে বাড়িটার মুখে।

"আপনি এখন যেখানে পার্ক করেছেন, ঠিক এখানেই ছিল আমার গাড়িটা," বলল লোকটা।

গাড়ি কয়েক মিটার পিছনে পিছিয়ে নিল ওয়ালন্ডার। তারপর নেমে পড়ল। খেয়াল করে দেখল, লোকটার গাড়িটা দুটো স্ট্রিটলাইটের মাঝে পার্ক করা ছিল।

"সবাই কি এরকম রাস্তায় গাড়ি পার্ক করে রাখে রাতে?" জানতে চাইল সে।

নেমে এসে ওয়ালান্ডারের পাশে দাঁড়িয়েছে লোকটা। "সাধারণত একটা গাড়ি থাকেই। এখানকার অনেকেরই দুইটা গাড়ি আছে। গ্যারেজে তো দুইটার জায়গা ধরে না।"

স্ট্রিটলাইটের দিকে ইঙ্গিত করল ওয়ালান্ডার। "লাইটগুলো ঠিক আছে?"

"জি। নষ্ট হলে আমার চোখ এড়ায় না।"

চারপাশে নজর বুলাতে লাগল ওয়ালান্ডার। আর কিছু জিজ্ঞেস করার নেই ওর।

"শীঘ্রই যোগাযোগ করা হবে আপনার সাথে।"

"আমি আমার গাড়ি ফেরত চাই," বলল লোকটা।

এমন সময় আরেকটা প্রশ্ন উঁকি দিয়ে গেল ওয়ালান্ডারের মনে। "আপনার কি অস্ত্র রাখার অনুমতি আছে? সাথে কি কোন অস্ত্র রাখেন?"

রক্ত সরে গেল লোকটার মুখ থেকে। একটা অদ্ভুত ধারণা জন্মালো ওই মুহূর্তে ওয়ালান্ডারের মনে। গাড়ি চুরির কাহিনি পুরোটাই বানোয়াট। সোমালি

লোকটার খুনের জন্য যে দুজন দায়ী, তাদের একজন এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে।

"কী যা-তা বলছেন? তখন থেকেই দেখছি আজেবাজে প্রশ্ন করেই যাচ্ছেন। আপনি কি ভাবছেন ওই খুনের পেছনে আমার হাত আছে?"

"পুলিশে যেহেতু ছিলেন, আশা করি জানেন যে সব ধরণের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে হয় আমাদের," বলল ওয়ালান্ডার। "আপনার বাসায় কি কোন আগ্নেয়াস্ত্র আছে?"

"অস্ত্র ও অস্ত্র রাখার লাইসেন্স দুটোই আছে।"

"কী ধরণের অস্ত্র?"

"শিকার করতে ভালোবাসি। হরিণ শিকারের জন্য তাই একটা মৌজার আছে।"

"আর?"

"একটা ল্যানবার ব্যারন শটগান। খরগোশ শিকারের জন্য।"

"ওগুলো পরীক্ষা করে দেখতে হবে। নিয়ে যাওয়ার জন্য কাউকে পাঠাব আমি।"

"কেন? ওগুলো কেন পরীক্ষা করতে হবে?"

"কারণ গতকাল যে লোক খুন হয়েছে, তাকে একটা শটগান দিয়ে গুলি করা হয়েছে।"

তাচ্ছিল্যভরে তাকাল লোকটা। "আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। অকারণে সন্দেহ করছেন আমাকে।"

চলে গেল ওয়ালান্ডার। সরাসরি চলে এল মালমো স্টেশনে। ওখান থেকে ফোন দিল ইস্তাতে। পাওয়া যায়নি গাড়িটা। ফোন রেখে মালমো স্টেশনের ডিপার্টমেন্ট ফর হোমিসাইড অ্যান্ড ভায়োলেন্ট ক্রাইমসের দায়িত্বে থাকা অফিসারের সাথে কথা বলতে চাইল সে। গোরান বোম্যানের সাথে যখন এসেছিল, তখন একবার দেখা হয়েছিল লোকটার সাথে। উদ্ধত আর অহংকারী মনে হয়েছিল লোকটাকে তখন।

অফিসারকে কেসটা বুঝিয়ে বলল ওয়ালান্ডার।

"আমি চাই তার অস্ত্রগুলো পরীক্ষা করে দেখা হোক," বলল সে। "তার বাড়িটাও সার্চ করে দেখতে হবে। তাছাড়া বর্ণবাদী কোন সংস্থার সাথে তার যোগাযোগ আছে কিনা, তাও জানা দরকার।"

ওর দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইল অফিসার। তারপর বলল, "গাড়ি চুরির ঘটনাটা উনার বানানো বলছেন? এমনটা ভাবার কোন কারণ আছে?

কিসের ভিত্তিতে সন্দেহ করছেন যে খুনের সাথে তার যোগসাজশ থাকতে পারে?"

"তার কাছে যেহেতু অস্ত্র আছে, প্রতিটা সম্ভাবনা আমাদের তদন্ত করে দেখতে হবে।"

"হাজার হাজার শটগান আছে এই জেলায়। এদের প্রত্যেকের মালিককে কি আপনি সার্চ করে দেখতে চান? তাছাড়া কেসটা হলো গাড়ি চুরির। তার বাসা সার্চ করার জন্য অনুমতি দিবে আমাকে?"

"এই কেসটা আর দশটা কেসের মতো না," বিরক্তির সুরে বলল ওয়ালান্ডার। কাউন্টি পুলিস চীফকে বলব আমি। "দরকার হলে ন্যাশনাল পুলিস চীফকে ফোন দিব।"

"আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করব," বলল অফিসার। "তবে একজন সহকর্মীর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করাটা কেউই পছন্দ করে না। আর যদি এসব প্রেসের কানে যায়? কী ঘটবে বুঝতে পারছেন?"

"তো? এসব ভাবার সময় নেই। তিনটা খুনের কেস ঝুলছে আমার হাতে। চার নম্বরটার হুমকি দেয়া হয়েছে। এবং তা ঘটতে দিতে পারি না আমি।"

ইস্তায় ফেরা পথে হ্যাজহোমে থামল ওয়ালান্ডার। টেকনিশিয়ানদের কাজ শেষ এখানে। ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে রিডবার্গের বলা কথাগুলো মিলিয়ে দেখল সে। ভুল অনুমান করেনি রিডবার্গ। যে জায়গাটার কথা বলেছে, সেখানেই গাড়িটা পার্ক করে রাখার সম্ভাবনা বেশি।

ভাবতে গিয়ে ওয়ালান্ডারের খেয়াল হলো, চুরি যাওয়া গাড়ির মালিককে সিগারেট বা আপেল খায় কিনা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছে।

ইস্তার উদ্দেশ্যে রওনা হলো সে। স্টেশনে ঢুকবার মুখে এক অস্থায়ী কর্মীকে লাঞ্চে যেতে দেখে একটা পিৎজা নিয়ে আসতে বলল তার জন্য।

তারপর গেল হ্যানসনের অফিসে। না, এখনও সন্ধান পাওয়া যায়নি গাড়িটার।

"পনের মিনিটের মধ্যে আমার অফিসে আসতে বল সবাইকে," আদেশ দিল ওয়ালান্ডার। "সবাই যেন থাকে। যারা স্টেশনে নেই, ফোন কর।"

নিজের অফিস রুমে ফিরে ওভারকোট না খুলেই চেয়ারে বসে পড়ল সে। তারপর ফোন দিল ওর বোনকে। ক্রিস্টিনা জানালো, স্কেওনার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যাবে সে। ঠিক হলো, পরদিন সকাল দশটায় স্টুরাপ বিমানবন্দর থেকে তাকে তুলে নেবে ওয়ালান্ডার।

কপালে হাত বুলালো সে। ফোলা জায়গাটা এখন রঙ পাল্টে হলুদ-লাল ধারণ করেছে। বিশ মিনিটের মাঝে মার্টিনসন আর সুইয়েডবার বাদে সবাই হাজির হয়ে গেল।

"কোথায় যেন গর্ত খুড়তে গেছে সুইয়েডবার," জানালো রিডবার্গ। "ওখানে নাকি সন্দেহজনক একটা গাড়ি দেখতে পেয়েছিল একজন। মার্টিনসন গেছে সিটোয়েন ক্লাবের একজনকে খুঁজে বের করতে। ওই লোক নাকি স্কেওনার সব সিটোয়েন সম্পর্কে জানে। সে আবার পেশায় একজন ডার্মাটোলজিস্ট।"

"ডার্মাটোলজিস্ট?" ওয়ালন্ডারের কণ্ঠে বিস্ময়।

"কেন, ডার্মাটোলজিস্টদের কি শখ থাকতে পারে না?"

মালমোতে সাবেক পুলিশ সদস্যের সাথে হওয়া আলাপচারিতা সম্পর্কে জানালো ওয়ালান্ডার। যখন বলল যে লোকটার ওপর অনুসন্ধান চালানোর আদেশ দিয়েছে সে, তার নিজের কানেই বিষয়টা বেখাপ্পা ঠেকল।

"মনে হয় না এসবের সাথে লোকটা জড়িত," বলল হ্যানসন। "খুনের সাথে জড়িত কোন পুলিশের লোক নিশ্চয় যেচে পড়ে গাড়ি চুরি যাবার রিপোর্ট করার মতো বোকামি করবে না, তাই না?"

"হয়ত না," বলল ওয়ালান্ডার। "কিন্তু সব সম্ভাবনাই তদন্ত করে দেখতে হবে।"

চুরি হওয়া গাড়ি উঠে এল আলোচনায়।

"আমার মনে হচ্ছে, গাড়িটা ঘটনাস্থলের আশেপাশেই আছে," বলল হ্যানসন। "ওই এলাকা ছেড়ে বের হতে গেলে কারও না কারও চোখে পড়ত নিশ্চয়। আর আমরাও জেনে যেতাম।"

টেবিলের ওপর একটা মানচিত্র বিছাল ওয়ালান্ডার। সবাই চারপাশ থেকে এমনভাবে ঝুঁকে এল যেন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

"লেকগুলো বাদ দিচ্ছি কেন?" বলল রিডবার্গ। "ক্রাগেহোম লেক, সুইনহোম লেক। এমনও তো হতে পারে যে লেকে ডুবিয়ে দিয়েছে গাড়িটা খুনিরা।"

"ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায় কাজটা," আপত্তি করল ওয়ালান্ডার। "মানুষের চোখে পড়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।"

তবুও সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, লেকগুলোতে অনুসন্ধান চালানোর। পরিত্যক্ত খামারগুলোতেও তল্লাশি চালাতে লোক পাঠানো হবে। মালমো থেকে পাঠানো ডগ পেট্রল কিছু খুঁজে পায়নি। হেলিকপ্টার সার্চও বৃথা গেছে।

"আচ্ছা, ইরানিয়ান লোকটা ভুল করেনি তো?" বলল হ্যানসন।

ভেবে দেখল ওয়ালান্ডার।

"আবারও স্টেশনে আনাতে হবে তাকে," বলল সে। "সিটোয়েন সহ ছয়টা গাড়ির ওপর পরীক্ষা নেয়া হবে তার।"

প্রত্যক্ষদর্শীর দায়িত্ব দেয়া হলো হ্যানসনের ওপর। তারপর আলোচনা মোড় নিল লুনাপের জোড়া খুনের ঘটনায়। এখানেও ভোরে লরি চালকের দেখা গাড়িটায় এসে থমকে যেতে হচ্ছে ওদের।

সহকর্মীদের ক্লান্ত মনে হলো ওয়ালান্ডারের। আজ শনিবার। এদের অনেকেই টানা কাজ করে যাচ্ছে লম্বা সময় ধরে।

"লুনাপের ঘটনার তদন্ত সোমবার পর্যন্ত স্থগিত করা হলো," বলল সে। "আপাতত হ্যাজহোমের ঘটনাকে প্রাধান্য দিতে হবে। যাদের এখন কোন কাজ নেই, তারা বাড়ি ফিরে বিশ্রাম নাও গে। এই সপ্তাহের মতোই কাজের ওপর দিয়ে যাবে মনে হচ্ছে আগামী সপ্তাহটাও।"

সহসাই ওর মনে পড়ল, বিয়র্ক ফিরে আসছে সোমবার।

"সোমবার বিয়র্ক দায়িত্ব বুঝে নেবে," বলল সে। "তাই এই সুযোগে সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই তোমাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য।"

"আমরা কি পাস করেছি?" মশকরা করল হ্যানসন।

"সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছ তুমি," জবাব দিল ওয়ালান্ডার।

মিটিং এর পরে রিডবার্গকে থাকার জন্য বলল সে। নিরিবিলিতে কারও সাথে কথা বলা দরকার ওর। আর রিডবার্গের মতামতকে সবচেয়ে বেশি গুরত্ব দেয় সে। তাকে জানালো কৃষানইস্তায় বোম্যানের চালানো তদন্তের কথা। চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলালো রিডবার্গ। দ্বিধান্বিত দেখাচ্ছে তাকে।

"যতই ভাবি, জোড়াখুনের ঘটনাটা ততই রহস্যজনক মনে হয় আমার," বলল সে।

"কিভাবে?" জানতে চাইল ওয়ালান্ডার।

"মারিয়া লভগ্রেনের বলা শেষ কথাটা উড়িয়ে দিতে পারছি না কিছুতেই। মানছি তার বয়স হয়েছিল। অত্যাচারের শিকার হয়ে প্রচন্ড যন্ত্রণায় ভুগছিলেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে মারা গেছে তার স্বামী। তার সময়ও ঘনিয়ে এসেছে। যখন মানুষ বুঝতে পারে যে আর কিছুই বাকি নেই তার, তখন চেষ্টা করে সমাধান দিয়ে যেতে। এটা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। আর মৃত্যুর আগে মারিয়া লভগ্রেন শুধু একটা কথাই বলেছিলেন: বিদেশি। তাও একবার না, কয়েকবার। আমার মনে হয় না এটা প্রলাপ ছিল। তার ওপর ওই ফাঁস আর গিঁট। তুমিই বলেছ যে খুনের পদ্ধতির মধ্যে ঘৃণা আর

প্রতিশোধের ছাপ আছে। অথচ আমরা এসব পাত্তা না দিয়ে অন্যদিকে হাতড়িয়ে মরছি।"

"লভগ্রেনদের সব আত্মীয়স্বজনদের একটা তালিকা বানিয়েছে সুইয়েডবার," বলল ওয়ালান্ডার। "ওই তালিকায় বিদেশি কারও নাম নেই। সবাই সুইডিশ।"

"ইয়োহানেস লভগ্রেনের দ্বৈতজীবনের কথা ভুলে যেও না," বলল রিডবার্গ। "চল্লিশ বছর পাশাপাশি থেকেও তার ধনসম্পদ সম্পর্কে কিছু অনুমান করতে পারেনি নিসটর্ম। এই কাহিনির আড়ালে যে অন্য কোন কাহিনি নেই তা নিশ্চিত হচ্ছ কী করে?"

"তাহলে কী করা উচিত বলছ?"

"এখন যা করছি ঠিক তাই। তবে আমাদের তদন্ত যে ভুল পথে চলতে পারে, এই সম্ভাবনা নাকচ করে দেয়া যাবে না।"

সোমালি খুনের ঘটনার দিকে নজর ফেরালো ওরা। মালমো থেকে ফিরে আসার পর থেকেই একটা ধারণা গজিয়েছে ওয়ালান্ডারের মনে।

"আর কিছুক্ষণ থাকতে পারবে?" জিজ্ঞেস করল সে।

"অবশ্যই," জবাব দিল রিডবার্গ। তার কণ্ঠে বিস্ময়। "কেন পারব না?"

"ওই সাবেক পুলিশ অফিসার নিয়ে কথা বলতে চাইছিলাম," বলল ওয়ালান্ডার। "জানি এটা আমার অনুমান মাত্র, যার ওপর ভরসা করার কোন যুক্তি নেই। কিন্তু আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, ওই লোকের ওপর নজর রাখা দরকার। যদি তুমি রাজি হও আরকি। অন্তত এই সাপ্তাহিক ছুটির সময়টা। তারপর দেখা যাবে আদৌ নজর রাখার দরকার আছে কিনা। যদি আমার ধারণা অনুযায়ি তার গাড়ি চুরি না হয়ে থাকে এবং এসবের সাথে সে কোনভাবে জড়িত থাকে, উল্টোপাল্টা কিছু একটা করবেই।"

"তবে আমি হ্যানসনের সাথে একমত। কোন পুলিশ অফিসার এতটা বোকা হবে না যে খুনের সাথে জড়িত থেকে পুলিশের কাছে গিয়ে গাড়ি চুরি যাবার ভান করবে।"

"ভুল করছ তোমরা দুজনেই। ঠিক যেভাবে ভুল করেছে ওই সাবেক পুলিশ অফিসার। তোমাদের মতোই সে-ও ভেবেছে যে শুধুমাত্র পুলিশ বলেই সব সন্দেহের থাকবে।"

হাঁটুতে হাত বুলাতে লাগল রিডবার্গ।

"তাহলে তোমার কথাই পালন করা হবে," বলল সে। "যদি তোমার মনে হয় এটা গুরুত্বপূর্ণ, তাহলে আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কিছু যায়-আসে না।"

"আমি শুধু লোকটার ওপর নজর রাখতে চাই," বলল ওয়ালান্ডার। "সোমবার সকাল পর্যন্ত শিফট ভাগাভাগি করে কাজ করব আমরা। চাপ পড়বে যদিও, কিন্তু কিছু করার নেই। তুমি চাইলে নাইট শিফটে আমি পাহারা দিতে রাজি আছি।"

রিডবার্গ জানালো, মাঝরাত পর্যন্ত সে-ই সামলে নিতে পারবে। তাকে ঠিকানা জানিয়ে দিল ওয়ালান্ডার। অর্ডার দেয়া পিৎজা নিয়ে হাজির হলো কর্মচারী।

"খেয়েছ?" জিজ্ঞেস করল ওয়ালান্ডার।

"হ্যাঁ," ইতস্তভাবে জবাব দিল রিডবার্গ।

"মিথ্যা বলছ কেন? এটা নাও। আমি আরেকটা আনিয়ে নিচ্ছি।"

ওয়ালান্ডারের ডেস্কে বসে পিৎজাটা সাবাড় করে দিল রিডবার্গ। তারপর মুখ মুছে উঠে দাঁড়াল।

"হয়ত তোমার কথাই ঠিক," বলল সে।

"হয়ত," জবাব দিল ওয়ালান্ডার।

বাকিদিনে আর কিছু ঘটল না। গাড়িটার খোঁজ পাওয়া যায়নি। ফায়ার ডিপার্টমেন্ট লেকগুলো সেচে ফেলেছে। কিন্তু পুরনো কিছু ভাঙা যন্ত্রপাতি ছাড়া কিছু পাওয়া যায়নি। কয়েকটা টিপ-অফ এসেছে সাধারণ মানুষ থেকে।

বর্তমান পরিস্থিতি জানতে চেয়ে ক্রমাগত ফোন করে গেছে পত্রিকা, রেডিও আর টিভির সাংবাদিকেরা। সাদা ছাতওয়ালা একটা নীল রঙের সিটোয়েনের খোঁজ চেয়ে জনসাধারণকে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে পুলিশের সাথে। বাড়তি সুরক্ষা চেয়ে ফোন করেছে বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরের পরিচালকেরা। যতটা সম্ভব ধৈর্য সহকারে জবাব দিয়েছে ওয়ালান্ডার।

গাড়ি চাপা পড়ে বিয়ারেসজোতে নিহত হয়েছে এক বৃদ্ধা। কেসটার দায়িত্ব দেয়া হলো সুইয়েডবারকে। গর্ত খুঁড়ে ফিরে এসেছে সে। বিকেলবেলা তাকে ছুটি দিবে বলে কথা দিয়েছিল ওয়ালান্ডার। কিন্তু কথা রাখা সম্ভব হয়নি।

বিকাল পাঁচটার দিকে ফোন দিল নাসলুন্ড। কণ্ঠ শুনে তাকে মাতাল মনে হলো ওয়ালান্ডারের। কোন কাজ আছে কিনা জানতে চাইল নাসলুন্ড। নাহয় ক্রিলিনায় একটা পার্টিতে যাবে সে। যেতে বলল ওয়ালান্ডার।

পিতার খবরাখবর নিতে দুইবার হাসপাতালে ফোন করল সে। প্রতিবারই তারা জানালো যে কথা বলছেন না ওর বাবা। স্টেন ওয়াইডেনকেও ফোন দিল সে। একটা পরিচিত কণ্ঠ ভেসে এল ওপ্রান্ত থেকে।

"তোমাকে মই নিয়ে সাহায্য করেছিলাম আমি," বলল ওয়ালান্ডার। "ওই যে, দেখেই যাকে পুলিশ বলে চিনতে পেরেছিলে। স্টেন কি আছে? আমি তার সাথে কথা বলতে চাই।"

"ঘোড়া কিনতে ডেনমার্কে গিয়েছেন তিনি," জবাব দিল লুইজ।

"কবে ফিরবে?"

"আগামীকাল মনে হয়।"

"ফিরলে বলবে আমাকে কল করার জন্য।"

"ঠিক আছে।"

ফোন রেখে দিল ওয়ালান্ডার। মেয়েটার কথা বিশ্বাস হয়নি ওর। ডেনমার্কে যায়নি স্টেন ওয়াইডেন। লুইজের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল হয়ত পুরোটা সময়। চুপচাপ শুনে গেছে। কিংবা মেয়েটার সাথে শুয়েছিল খাটে।

বিয়র্কের জন্য লেখা মেমো একজন পেট্রল অফিসারকে দিল ওয়ালান্ডার। অফিসার কথা দিল, স্টুরাপ বিমানবন্দরে প্লেন থেকে বিয়র্ক নামামাত্রই তার হাতে পৌছে দিবে মেমোটা।

মাসের প্রথম দিকে পরিশোধ করতে ভুলে যাওয়া বিলগুলোর কথা মনে পড়ল ওয়ালান্ডারের। একগাদা গাইরো স্লিপ পূরণ করে একটা ম্যানিলা খামে ঢুকাল সে। সাথে পুরে দিল একটা চেক। এই মাসেও ভিডিও বা স্টেরিও কেনা হবে না তার। তারপর ফেব্রুয়ারিতে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া রয়্যাল অপেরায় গমন নিশ্চিত করল সে। মঞ্চে প্রথমবারের মতো ওয়াইতজেক দেখার সুযোগ হাতছাড়া করবে না।

এসব করতে করতে কোন ফাঁকে রাত আটটা বেজে গেল। বিয়ারেসজোতে ঘটা দুর্ঘটনার ওপর সুইয়েডবারের রিপোর্ট পড়তে লাগল ওয়ালান্ডার। গাড়ি চালাচ্ছিল এক কৃষক। গতিসীমার ভেতরেই ছিল সে। নিহত মহিলা হুট করে গাড়ির সামনে এসে পড়েন। প্রত্যক্ষদর্শীরা কৃষককে নিরপরাধ বলে মত দিয়েছে। পুরোটা নিছক এক দুর্ঘটনা মাত্র। ময়নাতদন্তের পর রিপোর্টটা অ্যানেট ব্রোলিনকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল ওয়ালান্ডার।

রাত সাড়ে আটটার দিকে একটা সংঘাতের খবর এল পুলিশের কাছে। পিটারস আর নরেন গিয়ে থামাল মারামারি করতে থাকা দুই ভাইকে। পুলিশ এদের ভালো করেই চেনে। বছরভর ঝগড়া লেগেই থাকে এদের মাঝে।

মার্সভিন্সহোমে একটা গ্রেহাউন্ড হারানোর রিপোর্ট এল। কুকুরটাকে পশ্চিম দিকে যেতে দেখা গেছে। একারণে স্কুরাপ স্টেশনে পাঠিয়ে দেয়া হলো রিপোর্টটা।

দশটার দিকে স্টেশন থেকে বেরিয়ে এল ওয়ালান্ডার। বেশ ঠান্ডা পড়েছে বাইরে। কনকনে বাতাসে রক্ত জমে যাবার জোগাড়। আকাশ পরিষ্কার অবশ্য। ঝলমল করছে তারায়। তুষারপাত হওয়ার কোন লক্ষণ নেই। বাসায় ফিরে লং আন্ডারওয়্যার আর উলের ক্যাপ পরে নিল সে। আনমনে পানি ঢালল রান্নাঘরের জানালায় রাখা মৃতপ্রায় গাছগুলোতে। তারপর রওনা হলো মালমোর উদ্দেশ্যে।

আজ রাতের ডিউটিতে নরেন। যদিও ওয়ালান্ডার কথা দিয়েছে যে ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখবে, কিন্তু তার বোধ হয় প্রয়োজন হবে না। বিয়র্ক আসবে আজ। তাকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হবে নরেনকে।

পথে সেদালার এক রেস্তোরাঁয় থামল ওয়ালান্ডার। কী খাবে তা নিয়ে দ্বিধায় ভুগল কিছুক্ষণ। এরকম পরিস্থিতে খাদ্যাভ্যাস না পাল্টানোই বুদ্ধিমানের কাজ হবে বলে মনে হলো তার। তবে এটাও ঠিক যে ভারী খাবার এড়িয়ে যেতে হবে। নাহয় ঘুম চলে আসতে পারে।

খাওয়া শেষে কয়েক কাপ কফি খেল সে। এক বৃদ্ধা এসে দ্য ওয়াচ টাওয়ার গছিয়ে দিতে চাইল। এক কপি কিনে নিল ওয়ালান্ডার। রাতে বসে পড়া যাবে।

ই৬৫ রুটে উঠে ফের মালমোর উদ্দেশ্যে চলল সে। যে কাজে যাচ্ছে, তা কতটুকু ফলপ্রসূ হবে তা নিয়ে দ্বিধা জাগছে মনে। সামান্য স্বজ্ঞাকে এতটা প্রাধান্য দেয়া কি ঠিক হচ্ছে? হ্যানসন আর রিডবার্গের আপত্তি কি যথেষ্ট ছিল না? অনিশ্চয়তায় ভুগল সে।

বার্গম্যানের বাড়ির কাছাকাছি যখন পৌছালো, তখন রাত এগারোটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট। গাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এল সে। কানের ওপর টেনে দিল ক্যাপ। ঘুমিয়ে পড়েছে শহরতলী। আঁধারে ঢাকা পড়েছে দালানগুলো। এমন সময় দূর থেকে কানে এল টায়ারের ঘর্ষণ। যতটা সম্ভব ছায়ার মধ্যে থেকে রোজন্যাল নামক রাস্তা ধরে এগোলো সে।

সাথে সাথেই দেখতে পেল রিডবার্গকে। দাঁড়িয়ে আছে একটা বিশাল চেস্টনাট গাছের নিচে। গাছটার কান্ড এত মোটা যে বোঝাই যায় না কেউ লুকিয়ে আছে।

গা বাঁচিয়ে গাছের ছায়ায় চলে এল ওয়ালান্ডার। শীতে কাঁপছে রিডবার্গ। হাতে হাতে ঘষে চেষ্টা করছে উষ্ণ থাকতে।

"কিছু ঘটেছে?" জানতে চাইল ওয়ালান্ডার।

"উল্লেখযোগ্য কিছু না," জবাব দিল রিডবার্গ। "চারটার দিকে মুদি দোকানে গিয়েছিল সে। দু ঘন্টা পর একবার নেমে এসেছিল বাতাসে খুলে যাওয়া গেট লাগাতে। বারো ঘন্টা পাহারা দিয়ে কাজের কাজ কিছুই হলো না। তবে এটা

ঠিক যে অতিরিক্ত সাবধানী মনে হয়েছে লোকটা। মনে হচ্ছে তোমার কথাই ঠিক।"

বার্গম্যানের পাশের বাড়িটার দিকে ইঙ্গিত করল সে।

"ওই বাড়িটা খালি। উঠান থেকে রাস্তা আর বার্গম্যানের পেছনের দরজা দুটোই দেখা যায়। হয়ত ওই পথে বের হতে পারে সে। একটা বেঞ্চ আছে। সাথে গরম কাপড় থাকলে বসতে পার।"

আগেরবার বার্গম্যানের বাসায় যখন এসেছিল, একটা ফোন বক্স চোখে পড়েছিল ওয়ালান্ডারের। রিডবার্গকে ওখান থেকে নরেনকে ফোন করতে বলল সে। সাথে বলে দিল, জরুরি কোন দরকার না থাকলে তার গাড়ি নিয়ে চলে যেতে।

"সাতটার দিকে চলে আসব," বলল রিডবার্গ। "জমে মরে যেও না এই ফাঁকে।"

নিঃশব্দে উধাও হলো সে। খানিকক্ষণ বার্গম্যানের হলদে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকল ওয়ালান্ডার। দুটো জানালায় আলো জ্বলছে-একটা নিচ তলায়, আরেকটা ওপর তলায়। পর্দা নামানো থাকায় ভেতরের কিছু দেখা যায় না। ঘড়ি দেখল সে। মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। রিডবার্গ ফিরে আসেনি। তারমানে ইস্তায় সব শান্ত।

দ্রুত পায়ে রাস্তা পেরিয়ে গেট খুলে খালি বাড়িটার উঠোনে চলে এল ওয়ালান্ডার। অন্ধকার হলেও অসুবিধা হলো না রিডবার্গের বলা বেঞ্চটা খুঁজে পেতে। শরীর গরম রাখতে হাঁটার ব্যায়াম করতে লাগল সে। একবার এগিয়ে গিয়ে আবার পিছিয়ে যাচ্ছে পাঁচ পা। এরপর যখন ঘড়ি দেখল, তখন বারোটা বেজে মাত্র পঞ্চাশ মিনিট। লম্বা এক রাত অপেক্ষা করছে সামনে। এরিমধ্যে শীত করছে। আকাশ দেখে সময় পার করবার চেষ্টা করল সে। কিন্তু একটু পর ঘাড় ব্যথা করাতে মাথা নামিয়ে নিল অগত্যা।

দেড়টার সময় নিভে গেল বার্গম্যানের বাড়ির নিচ তলার আলো। দোতলা থেকে যেন রেডিও বাজার শব্দ কানে এল ওয়ালান্ডারের। রাত জাগে মি. বার্গম্যান, ভাবল সে। দ্রুত অবসরে গেলে বোধহয় এমনই হয়। সময় কাটতে চায় না। একটা পঞ্চান্নতে পরপর দুটো গাড়ি চলে গেল সাঁ সাঁ করে। তারপর আবারও কবরসম নীরবতা। ওপর তলার আলো জ্বলছে এখন অবধি। এদিকে শীতে কাহিল ওয়ালান্ডার।

দুইটা পঞ্চান্নের দিকে আলো নিভে গেল। রেডিও এর আওয়াজও শোনা যাচ্ছে না আর। দুই হাতে শরীর জড়িয়ে ধরল ওয়ালান্ডার। গুণগুণ করে ভাঁজতে লাগল একটা সুর।

এমন সময় খট করে একটা শব্দ কানে এল তার। দরজার খিলি লাগানোর আওয়াজ। এতটাই মৃদু যে রাতের নিস্তব্ধ পরিবেশ না হলে শুনতেই পেত না। উঠে দাঁড়াল সে। তখনই দেখতে পেল ছায়াটাকে।

পা টিপে টিপে হাঁটছে রুন বার্গম্যান। বাড়ির পেছনের আঙ্গিনা দিয়ে তাকে হারিয়ে যেতে দেখল ওয়ালান্ডার। কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করল সে। তারপর সাবধানে বেড়া টপকালো। যদিও অন্ধকারে ভালো দেখা যাচ্ছে না, তবুও কোনমতে বার্গম্যানের বাড়ির বিপরীতের আঙ্গিনা আর ছাউনির মাঝ দিয়ে একটা সরু পথ খুঁজে পেল সে। দ্রুত পা চালিয়ে বেরিয়ে এল রোজন্যালের সমান্তরালে চলে যাওয়া একটা রাস্তায়। তখনই বার্গম্যানকে দেখতে পেল দুটো রাস্তার সংযোগস্থলের ডানদিকে হেঁতে যেতে। আর এক সেকেন্ড দেরি হলেই বার্গম্যানকে হারাতে হত।

এক মুহূর্তের জন্য দ্বিধায় ভুগল ওয়ালান্ডার। প্রায় পঞ্চাশ মিটার দুরে পার্ক করা তার গাড়ি। এখনই গিয়ে যদি গাড়ি নিয়ে না আসে আর কাছে কোথাও যদি বার্গম্যানের আরেকটা গাড়ি থাকে, তাহলে তাকে আর অনুসরণ করতে পারবে না।

প্রাণপণে দৌড়াল ওয়ালান্ডার। মটমট করে উঠল পায়ের হাড়। গাড়ির কাছে পৌছে হাঁপাতে লাগল সে। তড়িঘড়ি চাবি বের করে খুলে ফেলল দরজা। ভাবছে, বার্গম্যানকে গিয়ে আটকাবে কিনা।

মরার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো ভুল রাস্তায় গাড়ি ছুটাল সে। যখন ভুলটা ধরতে পারল, ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। সামনে এগোনোর রাস্তা নেই। হাল না ছেড়ে গাড়ি পেছাতে লাগল সে। যেকোন রাস্তা ধরেই যেতে পারে বার্গম্যান।

শান্ত হও, মনে মনে বলল ওয়ালান্ডার। ঠান্ডা মাথায় ভাবো কী করা উচিত।

কাছেই একটা কার পার্কিং এরিয়া আছে। বার্গম্যানের ওদিকে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি মনে হলো ওয়ালান্ডারের। জ্যাগেসরো ট্রাক আর কিছু ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের মাঝে অবস্থিত বিশাল কার পার্কের দিকে এগোলো সে। হাল ছেড়ে দিবে, এমন সময় দেখতে পেল বার্গম্যানকে। একটা নতুন হোটেলের সামনের ফোন বক্সে কথা বলছে।

গাড়ি থামাল ওয়ালান্ডার। ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল, নিভিয়ে দিল হেডলাইট। বার্গম্যান দেখতে পায়নি ওকে।

কয়েক মিনিট পর একটা ট্যাক্সি এসে উপস্থিত হলো। বার্গম্যান চড়ে বসল পেছনের সিটে। গাড়ি চালু করল ওয়ালান্ডার। ইয়োতেবোরিয়ার রাস্তা ধরল ট্যাক্সি। পিছু নেয়ার আগে একটা লরিকে সামনে যেতে দিল ওয়ালান্ডার।

পেট্রল গেজের দিকে চোখ গেল ওর। ট্যাক্সিটাকে হামইস্তা পর্যন্ত অনুসরণ করার মতো জ্বালানি আছে গাড়িতে। আচমকা ডান দিকে মোড় নিল ট্যাক্সি। লুন্দের দিকে যাচ্ছে।

রেল স্টেশনে পৌছে থেমে গেল ট্যাক্সি। পাশ কাটিয়ে যাবার সময় বার্গম্যানকে ভাড়া মেটাতে দেখল ওয়ালান্ডার। মূল সড়ক থেকে সরে গিয়ে তাড়াহুড়ো করে গাড়ি পার্ক করল সে। দ্রুত কদমে হাঁটছে বার্গম্যান। ছায়ায় লুকিয়ে পিছু নিল ওয়ালান্ডার।

রিডবার্গ ঠিক বলেছিল। অতিরিক্ত সতর্ক দেখাচ্ছে বার্গম্যানকে। আচমকা থেমে গিয়ে চারপাশে নজর বুলালো সে। লুকানোর জন্য মাথা নিচু করে একটা খোলা দরজার ওপর ঝাঁপ দিল ওয়ালান্ডার। সিঁড়িতে গিয়ে ঠুকল ওর কপাল। চোখের ওপরের ফোলা জায়গাটা কেটে গলগল করে নামল রক্তস্রোত। হাতের গ্লাভ দিয়ে মুখ থেকে রক্ত মুছে নিল সে। তারপর দশ পর্যন্ত গুণে আবারও পিছু নিল।

স্ক্যাফোল্ডিং আর চট দিয়ে ঢাকা একটা দালানের সামনে এসে দাঁড়াল বার্গম্যান। আবারও তাকাল চারপাশে। চট করে একটা গাড়ির আড়ালে লুকিয়ে পড়ল ওয়ালান্ডার। মাথা নামিয়ে অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ। যখন মাথা তুলল, বার্গম্যান নেই কোথাও।

একটু পর দরজা বন্ধ হবার শুনতে পেল ওয়ালান্ডার। প্রায় একই সাথে আলো জ্বলে উঠল তৃতীয় তলার একটা কামরায়।

রাস্তা পেরিয়ে চটের পেছনে চলে এল সে। দ্বিধা না করেই উঠতে লাগল স্ক্যাফোল্ডিং বেয়ে। ওর ভারে কিঁচকিঁচ করে উঠল নির্মাণকাজে ব্যবহৃত হওয়া কাঠামোটা। দোতলায় উঠে এল সে। আলোকিত জানালাটা এখন ওর মাথা থেকে এক মিটারেরও কম উঁচুতে। কপাল থেকে ক্রমাগত রক্ত গড়িয়ে পড়ায় বারবার চোখ মুছে নিতে হচ্ছে ওকে। পকেট থেকে রুমাল বের করে তাই কপালে বেঁধে নিল রক্তপাত বন্ধ করতে।

সাবধানে ওপরের প্লাটফর্মে উঠে এল ওয়ালান্ডার। এতটাই ধকল গেছে যে প্রায় এক মিনিটের মতো শুয়ে থাকল। তারপর মাথা সামান্য তুলে এগোলো কাঠের তক্তার ওপর দিয়ে। নিচের দিকে তাকানোর কথা মনেও আনল না। মাথা ঘুরে যদি পড়ে যায়?

জানালার কিনারা দিয়ে প্রথম রুমটা দেখল সে। পর্দার ওপাশে বিশাল একটা খাটে এক মহিলাকে ঘুমাতে দেখতে পেল। তার পাশের কম্বল এমনভাবে সরানো, যেন তাড়াহুড়ো করে খাট ছেড়ে নেমে গেছে কেউ।

কনুইয়ে ভর আরও এগিয়ে গেল সে। উঁকি দিল দ্বিতীয় জানালা দিয়ে। বার্গম্যানকে দেখতে পেল বাদামি রঙের ড্রেসিং গাউন পরা এক লোকের সাথে কথা বলতে। লোকটাকে চেনা চেনা মনে হলো ওয়ালান্ডারের। এর কৃতিত্ব ওই রোমানিয়ান মহিলার। এতটাই নিখুঁতভাবে মাঠে দাঁড়িয়ে আপেল খাওয়া লোকটাকে বর্ণনা করেছিল সে।

গুড়গুড় শব্দে ঢাক বাজতে লাগল যেন ওয়ালান্ডারের বুকের ভেতর। তার অনুমানই ঠিক হলো শেষ পর্যন্ত। এই লোকটাই খুন করেছে সোমালি বৃদ্ধকে। নিচু গলায় কথা বলছে বার্গম্যান আর লোকটা। ওয়ালান্ডারের কান পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে না। একটা দরজা দিয়ে কোথাও গেল ড্রেসিং গাউন পরা লোকটা। ঠিক ওই মুহূর্তে সরাসরি ওয়ালান্ডারের দিকে তাকাল বার্গম্যান।

ধরা পড়ে গিয়েছি, ঝট করে মাথা নামাতে গিয়ে ভাবল ওয়ালান্ডার। বিপদ বুঝতে পারলে আমাকে খুন করতেও দ্বিধা করবে না এরা। ভয়ে অসাড় হয়ে গেল ওর শরীর। মেরে ফেলবে ওরা আমাকে, সহসাই ভয় ঢুকল ওর মনে। গুলি করে উড়িয়ে দিবে আমার মাথা। কিন্তু তেমন কিছুই ঘটল না।

সাহস করে আবারও মাথা তুলল সে। ফিরে এসেছে ড্রেসিং গাউন পরা লোকটা, হাতে একটা আপেল। বার্গম্যানের হাতে দুটো শটগান। টেবিলের ওপর একটা রেখে দিল সে। আরেকটা ঢুকাল তার কোটের ভেতর।

যথেষ্ট হয়েছে, ভাবল ওয়ালান্ডার। উল্টো ঘুরে যে পথে এসেছে, সে পথে ফিরে চলল।

এরপর যা ঘটল, তার জন্য প্রস্তুত ছিল না সে।

অন্ধকারে পা ফসকালো ওর। পতন ঠেকাতে হাত ছুড়ল সে স্ক্যাফোল্ডিং ধরার জন্য। কিন্তু কিছুই ঠেকল না হাতে। পড়তে লাগল সে। মৃত্যুর কথা চিন্তা করার সুযোগও পেল না। দুটো তক্তার খাঁজে আটকে গেল ওর পা। ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেল পতন। তীব্র ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল পায়ে। উল্টো হয়ে ঝুলতে লাগল সে মাটি থেকে এক মিটার ওপরে।

পা ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করেও পারল না ওয়ালান্ডার। এদিকে রক্তের চাপ বাড়ছে মাথায়। ব্যথায় পানি চলে এল ওর চোখে। এমন সময় বাইরের দরজা খোলার শব্দ কানে এল।

ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়ে গেছে বার্গম্যান। চিৎকার করার তীব্র ইচ্ছাটা দমন করল ওয়ালান্ডার। চটের মধ্য দিয়ে বার্গম্যানকে আচমকা দাঁড়িয়ে পড়তে দেখল সে। একেবারে তার সামনে। তারপর আলোর ঝলকানি। গুলি করেছে নিশ্চয়, ভাবল ওয়ালান্ডার। এবার মারা যাচ্ছি নিশ্চিত।

কিন্তু এবারও তেমন কিছু ঘটল না। সিগারেট ধরিয়েছে বার্গম্যান। লাইটারের আলো দেখে ভুল ভেবেছিল ওয়ালান্ডার। ধীরে ধীরে সরে যেতে লাগল বার্গম্যানের পায়ের শব্দ। জ্ঞান হারানোর উপক্রম হলো ওয়ালান্ডারের। এক ঝলকের জন্য দেখতে পেল লিন্ডাকে।

সর্বশক্তি দিয়ে শরীরটাকে দোলালো সে। সৌভাগ্যক্রমে এক হাতে ধরে ফেলল স্ক্যাফোল্ডিং এর একটা দন্ড। কষ্টেসৃষ্টে শরীরটাকে তুলে অন্য হাতে আকড়ে ধরল তক্তাগুলো যেখানে পা আটকেছে। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে আলগা করার চেষ্টা করল তক্তা দুটো। মুক্ত হয়ে গেল ওর পা। একই সাথে হাত ফসকালে মাটিতে গিয়ে ঠেকল পিঠ। নড়ার চেষ্টা করল না সে। চুপচাপ শুয়ে বোঝার চেষ্টা করল কিছু ভেঙ্গেছে কিনা।

উঠে দাঁড়াল ওয়ালান্ডার। মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠলে পতন ঠেকাতে ভর দিল দেয়ালে। চারপাশটা কেমন দুলছে বলে মনে হলো ওর। গাড়িতে পৌছাতে লেগে গেল পাক্কা বিশ মিনিট। গাড়ির ঘড়ির ওপর চোখ পড়লে দেখল, সাড়ে চারটা বাজে।

সিটে হেলান দিয়ে চোখ বুজল সে। তারপর ফিরে চলল ইস্তায়। ঘুমাতে হবে, ভাবল সে। আগামীকাল দেখা যাবে কী করা যায় বার্গম্যানের ব্যাপারে।

বাথরুমের আয়নায় নিজের চেহারা দেখে গুঙিয়ে উঠল ওয়ালান্ডার। গরম পানিয়ে ধুয়ে ফেলল আহত জায়গাটা। তারপর যখন বিছানায় শুতে গেল, ঘড়িতে ছয়টা বেজে পঁয়তাল্লিশ।

শোবার সময় শরীরের কোনখানে ব্যথা সবচেয়ে কম খোঁজার চেষ্টা করল সে। যেইমাত্র চোখ লেগে এসেছে, অমন সময় জোরে থাবা পড়ল সদর দরজায়। চমকে খুলে গেল ওয়ালান্ডারের চোখ। বিরক্ত হয়ে আবিষ্কার করল, খবরের কাগজ দিতে এসেছে হকার।

আবারও ঘুম নামল ওর চোখে। স্বপ্নে দেখা দিল অ্যানেট ব্রোলিন। কোথাও থেকে ভেসে আসছে হেষাধ্বনি।

ভোরের দিকে জোরে বাতাস শুরু হলো উত্তরপূর্ব দিক থেকে। উদিত হলো ১৪ জানুয়ারির সূর্য। আরেকটা দিন চলে এল গুটিগুটি পায়ে। রোববার।

ঘুমিয়েই থাকল কার্ট ওয়ালান্ডার।

বারো

জেগে উঠে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল সে কিছুক্ষণ। শঙ্কিত বোধ করল ঘুমিয়ে অনেক সময় পার করে ফেলেছে ভেবে। পরমুহূর্তেই স্বস্তি পেল ঘড়ির ওপর চোখে পড়লে। যেমনটা ভাবছে, অতটা সময় ঘুমায়নি। আসলে ঘুমাতে পারেনি। টেলিফোনের শব্দে ভেঙ্গে গেছে ঘুম। মালমোর একটা ফোন বক্স থেকে ফোন করেছে রিডবার্গ।

"চলে এস," বলল ওয়ালান্ডার। "ওখানে দাঁড়িয়ে শীতে জমে যাওয়ার দরকার নেই। আমার এখানে চলে এস।"

"কী হয়েছে?"

"বার্গম্যান দোষী।"

"নিশ্চিত?"

"একদম।"

"আসছি আমি।"

খাট থেকে নামতে কষ্ট হলো ওয়ালান্ডারের। সারা শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা। দপদপ করছে কপালের শিরা। চুলোয় কফি বসিয়ে একটা আয়না নিয়ে বসল সে। কষ্টেসৃষ্টে গজ ব্যান্ডেজ বেঁধে নিল কপালে। নীল-বেগুনী কালশিটে দিয়ে ভরে গেছে ওর মুখ।

রিডবার্গের আসতে এক ঘন্টাও লাগল না। কফিতে চুমুক দিতে দিতে তাকে সব জানালো ওয়ালান্ডার।

"এ তো উপন্যাসে পড়া স্পাইদের মতো খেল দেখিয়েছ," শোনা শেষে বলল রিডবার্গ। "অসাধারণ। এবার ওই শয়তানগুলোকে পাকড়াও করতে হবে। লুন্দের ওই লোকটার নাম কী?"

"ভুলে গিয়েছিলাম ডোরওয়েতে নামটা দেখতে। আর ওদের আমরা ধরছি না। এটা বিয়র্কের কাজ।"

"সে ফিরেছে?"

"গত রাতে ফেরার কথা।"

"তাহলে চল, গিয়ে ধরি তাকে।"

"প্রসিকিউটরকেও জানাতে হবে। সেই সাথে মালমো আর লুন্দের পুলিশ বাহিনীর সাথে সহায়তা নিতে হবে।"

ফোনের কাজ সেরে নিতে লাগল রিডবার্গ। সেই ফাঁকে পোশাক পাল্টাতে চলে গেল ওয়ালান্ডার। অ্যানেট ব্রোলিনের কথা মনে পড়ল তার। কে জানে এই সাপ্তাহিক ছুটিতে তার স্বামী বেড়াতে আসবে কিনা।

বেডরুমের দোরগোড়ায় উপস্থিত হলো রিডবার্গ। টাই বাঁধছিল ওয়ালান্ডার।

"তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে মুখে ঘুষি খাওয়া এক বক্সার," হেসে বলল রিডবার্গ।

"বিয়র্কের সাথে কথা হয়েছে?"

"যা যা ঘটেছে, সব জেনে নিয়েছে সে এরিমধ্যে। অন্তত একটা খুনের সমাধান করতে পেরেছি দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে।"

"প্রসিকিউটর?"

"তিনিও আসছেন।"

"ফোন কি তিনিই ধরেছিলেন?"

বিস্ময় ফুটল রিডবার্গের চেহারায়। "তাহলে আর কে ধরবেন?"

"তার স্বামীও তো ধরতে পারেন।"

"তাতে কী আসে-যায়?"

পাশ কাটিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিল ওয়ালান্ডার। "এমন বেহাল অবস্থার জন্য নিজের গালেই চড় বসাতে ইচ্ছা করছে। চল, যাই।"

ওরা যখন বের হয়ে এল, সবে আলো ফুটেছে। বাতাস বইছে সবেগে। আকাশে কালো মেঘের ছড়াছড়ি।

"কী মনে হয়, তুষার পড়বে?" জিজ্ঞেস করল ওয়ালান্ডার।

"ফেব্রুয়ারির আগে না," বলল রিডবার্গ। "কিন্তু তাতে কষ্ট বাড়বে বৈ কমবে না।"

ছুটির দিনে নীরবতা স্টেশনে। নরেনের জায়গায় এখন ডিউটিতে সুইয়েডবার। তাকে সংক্ষেপে গতকাল রাতে যা যা ঘটেছে জানালো রিডবার্গ।

"কী কেলেঙ্কারি!" বলল সুইয়েডবার। "শেষ পর্যন্ত একজন পুলিশ?"

"সাবেক পুলিশ।"

"গাড়িটা কোথায় লুকিয়েছে সে?"

"এখনও জানা যায়নি।"

একই সময়ে স্টেশনে প্রবেশ করল বিয়র্ক আর অ্যানেট ব্রোলিন। বিয়র্কের বয়স চুয়ান্ন, ভিস্তমানলান্দের অধিবাসী। একটা মাঝারি আকারের জেলার পুলিশ প্রধান হিসেবে বরাবরই তাকে আদর্শ বলে মনে হয়েছে ওয়ালান্ডারের। মাথায় ঘিলু কিছুটা কম থাকলেও তার আচার-ব্যবহার ভালো। আর পুলিশ ডিপার্টমেন্টের সুনাম অক্ষুণ্ন রাখতে কোন কিছুতেই কার্পণ্য বোধ করে না।

শঙ্কিত দৃষ্টিতে ওয়ালান্ডারকে দেখল বিয়র্ক। "তোমার দেখি অবস্থা খারাপ।"

"আমাকে মেরেছে ওরা," বলল ওয়ালান্ডার।

"মেরেছে? কারা?"

"অন্য অফিসারেরা। ভারপ্রাপ্ত প্রধান হওয়ায় এই দশা করেছে।"

হাসলো বিয়র্ক।

সমবেদনা ফুটল অ্যানেট ব্রোলিনের চোখে। "বেচারা। কষ্ট হয়েছে, তাই না?"

"ঠিক আছি আমি," জবাব দিল ওয়ালান্ডার।

বলার সময় মুখ ঘুরিয়ে নিল। দাঁত ব্রাশ করতে ভুলে গেছে আসার সময়।

বিয়র্কের অফিসে জড়ো হলো সবাই। যেহেতু রিপোর্ট লেখার সময় পাওয়া যায়নি, কেসটার ওপর সংক্ষেপে বক্তৃতা দিল ওয়ালান্ডার। ফাঁকে ফাঁকে অনেকগুলো প্রশ্ন করল বিয়র্ক আর অ্যানেট ব্রোলিন।

"তুমি বাদে আর কেউ যদি রোববারের সাতসকালে ঘুম থেকে ডেকে এই কাহিনি শোনাত, বিশ্বাস করতাম না," বলল বিয়র্ক।

তারপর অ্যানেট ব্রোলিনের দিকে ফিরল। "আটক করা যাবে? নাকি শুধু জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তুলে আনব?"

"জবানবন্দির ওপর ভিত্তি করে ডিটেনশন অর্ডারের জন্য আবেদন করব আমি," বলল অ্যানেট ব্রোলিন। "তবে শিবিরের ওই রোমানিয়ান মহিলা লুন্দের লোকটাকে চিনতে পারে কিনা নিশ্চিত করতে পারলে ভালো হত।"

"কিন্তু তা করতে তো কোর্ট অর্ডার লাগবে," বলল বিয়র্ক।

"হ্যাঁ," সায় দিল অ্যানেট ব্রোলিন। "তবে অর্ডার ছাড়াও করা যেতে পারে।"

আগ্রহভরে তার দিকে তাকাল ওয়ালান্ডার আর রিডবার্গ।

"মহিলাকে আমরা স্টেশনে আনতে পারি," বলে চলল ব্রোলিন। "তারপর ঘটনাক্রমে লুন্দের লোকটার সাথে করিডোরে দেখা হয়ে যেতেই পারে।"

মাথা দুলিয়ে সায় জানালো ওয়ালান্ডার। আইনের ফাঁক গলতে পার আকিসনের চেয়ে কম যায় না অ্যানেট ব্রোলিন।

"মন্দ বলেননি," বলল বিয়র্ক। "মালমো আর লুন্দের পুলিশ স্টেশনের সাথে যোগাযোগ করছি আমি। দশটার মধ্যে তুলে আনব সন্দেহভাজনদের।"

"আর খাটে যে মহিলাকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখেছিলাম?" বলল ওয়ালান্ডার। "তার কী হবে?"

"তাকেও নিয়ে আসা হবে," বলল বিয়র্ক। "জিজ্ঞাসাবাদ করবে কে কে?"

"আমি বার্গম্যানকে চাই," বলল ওয়ালান্ডার। "রিডবার্গ আপেল খাওয়া লোকটার সাথে কথা বলুক।"

"বিকাল তিনটার দিকে ডিটেনশন অর্ডার নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে," বলল অ্যানেট ব্রোলিন। "ততক্ষণ বাসাতেই থাকব।"

রিসিপশন পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিতে এল ওয়ালান্ডার। "ভেবেছিলাম গতকাল রাতে ডিনারের নিমন্ত্রণ জানাব আপনাকে। কিন্তু সুযোগ হলো না।"

"তাড়াহুড়োর কিছু নেই," বলল ব্রোলিন। "আরও অনেক সন্ধ্যা পড়ে আছে। চমৎকার কাজ দেখিয়েছেন কেসটায়। আচ্ছা, জানলেন কিভাবে যে ওই সাবেক পুলিশ অফিসার জড়িত থাকতে পারে?"

"জানতাম না। অনুমান করেছি।"

শহরের দিকে ব্রোলিনকে এগিয়ে যেতে দেখল ওয়ালান্ডার। সহসাই খেয়াল হলো, সেদিনের ডিনারের পর মোনার কথা একবারও মনে পড়েনি ওর।

এরপর দ্রুত ঘটতে লাগলো সব। হ্যানসনকে বাড়ি থেকে ডেকে পাঠিয়ে বলা হলো রোমানিয়ান মহিলা আর একজন দোভাষীকে নিয়ে আসতে।

"মালমোর আমাদের সহকর্মীদের খুব একটা সন্তুষ্ট মনে হলো না," উদ্বিগ্ন স্বরে জানালো বিয়র্ক। "আসলে নিজের সহর্কমীকে অপরাধী হিসেবে দেখতে কারো ভালো লাগে না। পত্রিকাওয়ালারা পুরো শীত মেতে থাকবে এটা নিয়ে।"

"মেতে থাকার কী আছে?" বলল বার্গম্যান। "বার্গম্যান বহু আগে স্বেচ্ছা অবসর নিয়েছে।"

"তাও। সাংবাদিকেরা তো শুধু ছাপবে, খুনি একজন পুলিশ। পুলিশ বাহিনীর ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে এই ঘটনা।"

দশটার কিছু আগে স্ক্যাফোল্ডিং এ ঢাকা বিল্ডিং এ উপস্থিত হলো ওয়ালান্ডার। সাদা পোশাকে লুন্দের চারজন পুলিশ এসেছে তার সাথে।

"বন্দুক আছে লোকটার সাথে," গাড়িতে সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বলল ওয়ালান্ডার। "ঠান্ডা মাথায় একটা খুন করেছে সে। তবুও আশা করছি বিনা ঝামেলাতেই ধরতে পারব তাকে। আমাদের এই আকস্মিক আগমন তার কাছে অপ্রত্যাশিত। এই সুযোগটাই কাজে লাগাতে হবে।"

সাথে করে রিভলভার নিয়ে এসেছে ওয়ালান্ডার। শেষ কবে অস্ত্রটা বের করেছিল ভুলেই গেছে। সম্ভবত তিন বছর আগে। কুমলা কারাগার থেকে পালিয়ে মসবি সৈকতের কাছেই একটা সামার-হাউসে আশ্রয় নেয়া এক কয়েদিকে ধরতে হয়েছিল সেবার।

এখন ওরা বসে আছে লুন্দের সেই দালানের বাইরে একটা গাড়িতে। দিনের আলোতে ওয়ালান্ডার টের পেল, না বুঝে অনেক উপরে উঠে গিয়েছিল সে। অত উপর থেকে যদি পড়ত, মেরুদন্ডের হাড় একটাও আস্ত থাকত না।

আজ সকালে লুন্দ স্টেশন থেকে একজনকে পত্রিকার হকার সাজিয়ে পাঠানো হয়েছিল ফ্ল্যাটটা দেখে যেতে। সে জেনে এসেছে, আপেল খাওয়া লোকটার নাম ভালফ্রিড স্টম। পুলিশের খাতায় নামটা উঠেনি কখনও। তার আয়ের উৎসও অজানা। হকার সেজে যাওয়া অফিসার বাড়িটা ভালো করে দেখে এসেছে। দালানের পেছনের অংশে কোন সিঁড়ি বা স্ক্যাফোল্ডিং নেই, যা দিয়ে পালাতে পারবে লোকটা।

দশটা বাজলে সঙ্গীদের নিয়ে গাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এল ওয়ালান্ডার। দালানের সদর দরজায় রেখে যাওয়া হলো একজন অফিসারকে। ইন্টারকম সিস্টেম থাকলেও নষ্ট। একটা স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল ওয়ালান্ডার।

"সিঁড়িতে একজনের থাকা উচিত," বলল সে। "তুমি আর আমি ওপরে যাব। কী নাম তোমার?"

"এনবার্গ।"

"ডাকনাম?"

"ক্যাল।"

"চল, ক্যাল, যাওয়া যাক।"

দরজার বাইরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কান পাতল ওরা। রিভলভার বের করে আনল ওয়ালান্ডার। এনবার্গকেও বের করতে ইঙ্গিত করল। তারপর চেপে ধরল কলিং বেল।

দরজা খুলল ড্রেসিং গাউন পরা এক মহিলা। ঝট করে রিভলভার ধরা হাতটা পেছনে নিয়ে গেল ওয়ালান্ডার। চিনতে অসুবিধা হলো না তার। এই মহিলাকেই ঘুমিয়ে থাকতে দেখেছিল গতরাতে।

"আমরা পুলিশ," বলল সে। "আপনার স্বামী ভালফ্রিড স্টমের কাছে এসেছি।"

ভয় ফুটল চল্লিশ বছর বয়স্কা মহিলার চোখেমুখে। দরজা থেকে সরে পুলিশদের ঢোকার জন্য জায়গা করে দিল সে।

সহসাই উদয় হলো ভালফ্রিড স্টম। পরনে সবুজ রঙের ট্র্যাকস্যুট। মাথায় অর্ধচন্দ্রাকৃতির টাক।

"থানা থেকে এসেছি আমরা," বলল ওয়ালান্ডার। "আপনাকে আমাদের সাথে যেতে হবে।"

সরু চোখে তার দিকে তাকাল লোকটা। "কেন?"

বইঘর.কম

"জিজ্ঞাসাবাদের জন্য।"

"কী কারণে?"

"সেটা থানায় গেলেই জানতে পারবেন।"

মহিলার দিকে ফিরল ওয়ালান্ডার। "আপনাকেও যেতে হবে আমাদের সাথে। পোশাক পরে নিন।"

ভাবান্তর ঘটেনি ভালফ্রিড স্ট্রমের। "কারণ না জানা পর্যন্ত কোথাও যাচ্ছি না আমি, বলল সে। তবে আগে আপনাদের পরিচয়পত্র দেখালে ভালো হয়।"

পকেটে ডান হাত ঢুকাতে গিয়ে রিভলভারের অস্তিত্ব ফাঁস করে দিল ওয়ালান্ডার। আর লুকাছাপা করার প্রয়োজন নেই দেখে অস্ত্রটা বাম হাতে নিয়ে নিল। তারপর ওয়ালেট হাতড়াতে লাগল পকেটে।

ঠিক একই মুহূর্তে ওর উদ্দেশ্যে ঝাঁপ দিল স্ট্রম। মাথা দিয়ে বাড়ি মারল ওয়ালান্ডারের কপালের আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে। পিছনে ছিটকে গেল ওয়ালান্ডার। হাত থেকে ছুটে গেল রিভলভার। এনবার্গ পরিস্থিতি বুঝে উঠতে উঠতে দরজা দিয়ে পালিয়ে গেল স্ট্রম। এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল মহিলা। পরিস্থিতি দেখে ভয়ে চেঁচাতে লাগল সে। মেঝে থেকে রিভলভার খুঁজে নিয়ে সিঁড়ির দিকে দৌড়াল ওয়ালান্ডার। চিৎকার করে সাবধান করে দিল নিচে অপেক্ষারত অফিসার দুজনকে।

কিন্তু স্ট্রমের ক্ষিপ্রতার কাছে পাত্তা পেল না তারা। কনুইয়ের এক ঘায়ে পরাস্ত হলো দালানের ভেতরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা অফিসার। দরজা ঠেলে রাস্তায় বেরিয়ে এল স্ট্রম। দরজার আঘাতে ভূপাতিত হলো দ্বিতীয়জন। ওদিকে চোখের ওপর রক্ত গড়িয়ে পড়তে থাকায় ভালো করে দেখতেও পাচ্ছে না ওয়ালান্ডার। দৌড়ে নামতে গিয়ে হোঁচট খেল অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকা এক অফিসারের শরীরে। রিভলভারের সেফটি ক্যাচ টেনে দিল সে। তারপর বেরিয়ে এল রাস্তায়।

"কোন দিকে গেছে?" জিজ্ঞেস করল দরজার বাইরে পড়ে থাকা হতবিহ্বল অফিসারকে।

"বামে।"

দৌড় দিল ওয়ালান্ডার। একটা আন্ডারপাসের নিচে হারিয়ে যেতে দেখল সবুজ রঙের ট্র্যাকস্যুট পরা একটা অবয়বকে। ক্যাপ খুলে মুখ মুছে নিল সে। চার্চের উদ্দেশ্যে হাঁটছিল কয়েকজন বয়স্ক মহিলা। ওয়ালান্ডারের রক্তমাখা মুখ দেখে ভয়ে দূরে সরে গেল তারা। আন্ডারপাসে গিয়ে ঢুকল ওয়ালান্ডার। একই সময়ে মাথার ওপর দিয়ে ঝমঝম করে চলে গেল একটা ট্রেন।

খোলা রাস্তায় বেরিয়ে এল সে। স্টমকে দেখতে পেল একটা গাড়ি নিয়ে পালাতে। গাড়িটার চালক হতভম্ব হয়ে পড়ে আছে রাস্তায়। টেনে চালকের আসন থেকে তাকে বের করে দিয়েছে স্টম।

কাছাকাছি একটা বিশাল হর্সবক্স ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না ওয়ালান্ডারের। ঘোড়া বহনকারী বাহনটার মালিক দাঁড়িয়ে আছে কাছেই। একটা দোকানের ভেন্ডিং মেশিন থেকে কনডমের প্যাকেট বের করছে। ওয়ালান্ডারের রক্তে মাখামাখি মুখ আর হাতের রিভলভার দেখে ভয় পেয়ে গেল সে। কনডম ফেলেই দিল ভোঁদৌড়।

চালকের আসনে উঠে বসল ওয়ালান্ডার। পেছন থেকে শুনতে পেল ঘোড়ার ডাক। ইঞ্জিন চালুই ছিল। ফার্স্ট গিয়ারে গাড়ি ছুটালো সে।

ভেবেছিল স্টমকে হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু একটু পরেই দেখতে পেল গাড়িটা। লাল বাতি উপেক্ষা করে একটা সরু রাস্তা ধরে ছুটছে সোজা ক্যাথেড্রালের দিকে। দ্রুত গিয়ার পাল্টে যাচ্ছে ওয়ালান্ডার। চেষ্টা করছে গাড়িটাকে চোখের আড়াল হতে না দিতে। পেছনের খাঁচায় ভয়ে আর্তনাদ করছে ঘোড়াগুলো। সদ্য ত্যাগ করা মূত্রের গন্ধ এসে লাগল ওয়ালান্ডারের নাকে।

একটা তীক্ষ্ম বাঁকে এসে আরেকটু হলেই নিয়ন্ত্রণ হারাতো সে। দুটো পার্ক করা গাড়িকে ধাক্কা মেরে তবেই সোজা হলো বিশাল হর্সবক্সটা।

হাসপাতাল পেরিয়ে একটা শিল্প এলাকায় এসে ঢুকল গাড়ি দুটো। তীব্র গতিতে পালানোর চেষ্টা করছে স্টম। পেছনে সমান তালে ধাওয়া করে চলছে ওয়ালান্ডার। একটা ফোন দেখতে পেল সে গাড়িটায়। এক হাত স্টিয়ারিং হুইলে রেখে অন্য হাতে চেষ্টা করল ইমার্জেন্সি নম্বরে ফোন দিতে।

যেইমাত্র ইমার্জেন্সি অপারেটর ফোন রিসিভ করল, অমনি একটা মোড় পড়ল সামনে। গাড়ির দিক ঠিক রাখতে গিয়ে ফোনটা পড়ে গেল ওয়ালান্ডারের হাত থেকে। গাড়ি থামানো ছাড়া ওটা তোলার উপায় নেই।

এই পরিস্থিতির মাঝেও বোনের কথা মনে পড়ল ওয়ালান্ডারের। স্টুরাপ বিমানবন্দর থেকে তাকে তুলে নেয়ার সময় হয়ে গেছে।

স্টাফফানস্টর্পের প্রবেশমুখে এসে একটা বাসকে তার দিকে ছুটে আসতে দেখল স্টম। সংঘর্ষ এড়াতে চেষ্টা করল ব্রেক কষতে। মাত্রাতিরিক্ত গতির কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটা সোজা ছুটে গেল একটা কংক্রিট পিলারের দিকে। একশো মিটার পেছন থেকে গাড়িটা বিস্ফোরিত হতে দেখল ওয়ালান্ডার। সাথে সাথে পা দিয়ে জোরে চেপে ধরল ব্রেক। একটা গর্তে পড়ে

কাত হয়ে গেল হর্সবক্সটা। সশব্দে খুলে গেল পেছনের দরজা। টপাটপ লাফিয়ে বেরিয়ে পড়ল দুটো ঘোড়া।

সংঘর্ষের ধাক্কায় গাড়ি থেকে ছিটকে বাইরে পড়েছে স্ট্রম। কাটা গেছে তার এক পা। কাঁচের টুকর দিয়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে মুখ। কাছে না গিয়েও ওয়ালান্ডার বুঝে গেল, লোকটা আর বেঁচে নেই।

আশেপাশের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে মানুষজন। রাস্তায় চলমান গাড়িগুলো থেমে পড়েছে একপাশে। লোকজনকে তার হাতের দিকে তাকাতে দেখে ওয়ালান্ডারের খেয়াল হলো, রিভলভার হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। কয়েক মিনিট পর প্রথম স্কোয়াড কার এসে উপস্থিত হলো। তারপর একটা অ্যাম্বুলেন্স। পরিচয়পত্র দেখিয়ে স্কোয়াড কার থেকে স্টেশনে ফোন করল ওয়ালান্ডার।

"কী খবর ওদিকে?" জানতে চাইল বিয়র্ক। "বার্গম্যানকে তুলে নিয়ে আসা হচ্ছে। কোন ঝামেলা করতে পারেনি। আর যুগোস্লাভিয়ান মহিলাকেও নিয়ে আসা হয়েছে তার দোভাষীর সাথে।"

"লুন্দ জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়ে দিন ওদের," বলল ওয়ালান্ডার। "একটা লাশ শনাক্ত করাতে হবে। আর হ্যাঁ, ওই মহিলা রোমানিয়ান।"

"মর্গে? কেন?" জিজ্ঞেস করল বিয়র্ক।

"লাশ শনাক্ত করার জন্য," বলে ফোন রেখে দিল ওয়ালান্ডার।

মাঠের দিকে চোখ পড়লে একটা সাদা ঘোড়াকে মাঠে চরে বেড়াতে দেখল সে। এমন সুন্দর ঘোড়া আগে কখনও দেখেনি।

ইস্তায় যখন ফিরে এল সে, স্ট্রমের মৃত্যুর খবর ততক্ষণে চাউর হয়ে গেছে। শুনে ভেঙ্গে পড়েছে তার স্ত্রী। পুলিশ মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইলেও বাঁধা দিল একজন ডাক্তার।

রিডবার্গ ওয়ালান্ডারকে জানালো যে অপরাধ স্বীকার করেনি বার্গম্যান। এখনও দাবি করছে, তার গাড়ি চুরি হয়েছে। হ্যাজহোমে যায়নি সে। গতরাতে স্ট্রমের বাসাতেও যায়নি। তাকে ছেড়ে দেয়ার জন্য জোরাজুরি করছে।

"শালার মুখ আমি খোলাচ্ছি," বলল ওয়ালান্ডার।

"কারও মুখ খোলানোর দরকার নেই," বলল বিয়র্ক। "যথেষ্ট হয়েছে। লুন্দে যা দেখিয়ে এসেছ, তাতেই অনেক ঝামেলা পোহাতে হবে। পাঁচ-পাঁচজন পুলিশ অফিসার মিলে একজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ধরে আনতে পারলে না? তার ওপর এমন আক্কেল যে ধাওয়া করতে গিয়েছ একটা হর্সবক্স নিয়ে। ওই গাড়ির একটা ঘোড়া যে গাড়ি চাপা পড়েছ, জানো? ঘোড়াটার নাম সুপার

নোভা। আর ওটার মালিক ক্ষতিপূরণ হিসেবে এক লক্ষ ক্রোনার দাবি করেছে।"

রাগে লাল হয়ে গেল ওয়ালান্ডারের মুখ। ফুঁসতে লাগল ভেতরে। এরকম একটা পরিস্থিতিতে বিয়র্ক কোথায় ওকে সমর্থন দিবে, তা না, উল্টো তাচ্ছিল্য করছে।

"এখন ওই রোমানিয়ান মহিলা স্টমকে চিনতে পারে কিনা দেখা যাক," বলল বিয়র্ক। "খবরদার, আমি ছাড়া কেউ প্রেসের সামনে মুখ খুলবে না।"

"বাঁচলাম," বলল ওয়ালান্ডার।

রিডবার্গকে নিয়ে নিজের অফিসে চলে এল সে। তারপর দরজা লাগিয়ে দিল।

"আয়নায় নিজের হাল দেখেছ একবার?" বলল রিডবার্গ।

"আপাতত না দেখলেও চলবে।"

"তোমার বোন ফোন করেছিল। আমি মার্টিনসনকে বলেছি এয়ারপোর্ট থেকে তাকে তুলে নিতে। তুমি ভুলে গিয়েছিলে বোধ হয়।"

ওপরে নিচে মাথা দোলোলো ওয়ালান্ডার। কয়েক মিনিট পর বিয়র্ক প্রবেশ করল কামরায়।

"মহিলা চিনতে পেরেছে স্টমকে," জানালো সে। "পেয়ে গেছি আমাদের খুনিকে।"

"পরিচয় জানা গেছে স্টমের?" জিজ্ঞেস করল রিডবার্গ।

"ব্যবসায়ী বলে নিজের পরিচয় দিত সে," বলল বিয়র্ক। "বয়স সাতচল্লিশ। তবে আমাদের যা জানা দরকার, খুঁজে বের করতে সময় লাগেনি স্টকহোমের সিকিউরিটি পুলিশের। ষাটের দশক থেকেই বর্ণবাদী আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিল স্টম। প্রথমে যোগ দিয়েছিল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স বা এই জাতীয় কোন একটা সংঘটনে। পরে আরও উগ্র কিছু দলের সাথে জড়িয়ে পড়ে। তবে মিটিং-মিছিল থেকে কিভাবে সে একজন খুনি হয়ে উঠল, তা বার্গম্যান বলতে পারবে হয়ত। কিংবা স্টমের স্ত্রী।"

উঠে দাঁড়াল ওয়ালান্ডার। "এবার বার্গম্যান মুখ না খুলে যাবে কোথায়?"

একটা কামরায় বসে সিগারেট ফুঁকছিল বার্গম্যান। বিয়র্ক, রিডবার্গ আর ওয়ালান্ডার তিনজনেই প্রবেশ করল একসাথে। প্রথম থেকেই আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল ওয়ালান্ডার।

"গতকাল রাতে আমি কী করছিলাম জানেন?" জিজ্ঞেস করল সে।

"আমি কিভাবে জানব?" বিরক্তির সুরে বলল বার্গম্যান।

"আপনাকে অনুসরণ করে লুন্দে গিয়েছিলাম।"

লোকটার চেহারায় এক মুহূর্তের জন্য যেন শঙ্কা খেলে যেতে দেখল ওয়ালান্ডার।

"আপনাকে অনুসরণ করে লুন্দে গিয়েছিলাম," আবারও বলল সে। "তারপর স্টুম যে দালানে থাকতো, সেটার স্ক্যাফোল্ডিং বেয়ে ওপরে উঠেছিলাম। আপনাকে শটগান বিনিময় করতে দেখেছি আমি। স্টুম এখন মৃত। তবে হ্যাজহোমের ঘটনায় তাকে খুনি হিসেবে সনাক্ত করেছে একজন প্রত্যক্ষদর্শী। এ বিষয়ে আপনার কিছু বলার আছে?"

কিছু বলল না বার্গম্যান। আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে তাকিয়ে রইল সিলিঙের দিকে।

"ঠিক আছে, আপনি না বললে আমরাই বলছি," বলল ওয়ালান্ডার। "কিভাবে কী ঘটেছে, সবই জানা আছে আমাদের। তবে দুটো জিনিস বাদে। এক, আপনার গাড়িটা কী করেছেন? দুই, কেন সোমালি লোকটাকে খুন করলেন?"

মুখ খুলল না বার্গম্যান। তিনটার কিছু পরে খুন কিংবা খুনে সহযোগিতা করার অপরাধে গ্রেফতার করা হলো তাকে, এবং একজন উকিলের সাথে পরামর্শ করার সুযোগ দেয়া হলো।

চারটা বাজে ভালফ্রিড স্টুমের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করল ওয়ালান্ডার। মহিলা এখনও বিপর্যস্ত, তবে জবাব দিল সব প্রশ্নের। মহিলা জানালো, দুই বছরও হয়নি স্টুমের সাথে তার বিয়ে হয়েছে। দামি গাড়ি আমদানি করত স্টুম। শরণার্থীদের আশ্রয় দেয়ার ঘোরতর বিরোধী ছিল সে। ওয়ালান্ডারের মনে হলো, দ্রুতই শোক কাটিয়ে উঠবে মহিলা।

জিজ্ঞাসাবাদের পর রিডবার্গ আর বিয়র্কের সাথে কথা বলল সে। তারপর লুন্দ ছেড়ে না যাওয়ার আদেশ দিয়ে ছেড়ে দিল মহিলাকে। পুলিশের গাড়িতে করে মহিলাকে বাসায় পৌছে দিয়ে আসা হলো।

আরও একবার বার্গম্যানকে কথা বলানোর চেষ্টা করল রিডবার্গ আর ওয়ালান্ডার। বার্গম্যানের উকিল অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সে। সে বলল, বার্গম্যানের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে সেগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বিনা প্রমাণে গ্রেফতার করে অবিচার করা হয়েছে তার মক্কেলের প্রতি।

আরও কিছুক্ষণ কথা হলো রিডবার্গ আর ওয়ালান্ডারের মধ্যে। সহসাই একটা সম্ভাবনা খেলে গেল রিডবার্গের মাথায়।

"স্টুম পালিয়ে কোথায় যেতে চাচ্ছিল?" জিজ্ঞেস করল ওয়ালান্ডারকে।

মানচিত্রে ইঙ্গিত করল ওয়ালান্ডার।

"স্টাফফানস্টর্পে কেন গিয়েছিল?" বলল রিডবার্গ। "এমন কি হতে পারে যে ওখানে বা তার আশেপাশে এমন কোন ওয়্যারহাউজ আছে যেখানে সে লুকাতে চেয়েছিল? জায়গাটা কিন্তু হ্যাজহোম থেকে দুরে না।"

ফোন করা হলো স্ট্রমের স্ত্রীকে। রিডবার্গের অনুমান সত্য বলে প্রমাণিত হলো। স্টাফফানস্টর্প আর ভেবেরডের মাঝে স্ট্রমের একটা ওয়্যারহাউজ আছে বলে জানালো মহিলা। ওখানেই আমদানিকৃত গাড়িগুলো রাখা হয়। স্কোয়াড কার নিয়ে রওনা হয়ে গেল রিডবার্গ। পৌছে ফোন দিল ওয়ালান্ডারকে।

"সুখবর," বলল সে। "এখানে একটা নীলচে সিটোয়েন পেয়েছি!"

"আমাদের সন্তানদেরও আওয়াজ শুনে গাড়ি চেনা শেখানো উচিত ছিল," বলল ওয়ালান্ডার।

আবারও বার্গম্যানের সাথে কথা বলল সে। কিন্তু মুখ খুলবে না বলে যেন পণ করেছে লোকটা।

ইস্তায় ফিরে এল রিডবার্গ। সিটোয়েনের গ্লোভ কম্পার্টমেন্টে এক বাক্স শটগান শেল খুঁজে পেয়েছে সে। ওদিকে মালমো আর লুন্দে বার্গম্যান আর স্ট্রমের অ্যাপার্টমেন্টে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

"এই দুই ভদ্রলোক মনে হচ্ছে একাধিক কু-ক্লাক্স-ক্ল্যান আন্দোলনে জড়িত ছিল," বলল বিয়র্ক। "আরও অনেকেই জড়িত থাকতে পারে এদের সাথে। পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে।"

এখনও কথা বলছে না বার্গম্যান।

মিডিয়ার সাথে কথা বলতে হচ্ছে না দেখে স্বস্তিতে আছে ওয়ালান্ডার। তবে সারা দিনের ব্যস্ততায় ক্লান্ত হয়ে আছে। তার ওপর মুখে প্রচন্ড ব্যথা। ছয়টার দিকে মার্টিনসনকে ফোন দিয়ে বোনের সাথে কথা বলার সুযোগ হলো ওর অবশেষে। তারপর গাড়ি নিয়ে রওনা হয়ে গেল। তাকে দেখে চমকে উঠল ক্রিস্টিনা।

"এরকম অবস্থায় বাবার সামনে না যাওয়াই ভালো হবে," বলল ওয়ালান্ডার। "আমি গাড়িতে বসে থাকব। তুমি দেখা করে আসবে।"

ক্রিস্টিনা জানালো, ইতোমধ্যে বাবার সাথে দেখা করে এসেছে সে। শারীরিকভাবে এখনও দুর্বল, তবে মেয়েকে দেখে খুশি হয়েছেন তিনি।

"ওই রাতের তার খুব একটা মনে নেই," হাসপাতালের দিকে দিকে যাওয়ার সময় বলল ক্রিস্টিনা।

"মনে না থাকলেই ভালো।"

বোনকে হাসপাতালের ভেতরে পাঠিয়ে গাড়িতে বসে অপেক্ষা করতে লাগল ওয়ালান্ডার। চোখ বুজে শুনতে লাগল রোসিনি অপেরা। গাড়ির দরজা

খুলে যখন ক্রিস্টিনা প্রবেশ করল, চমকে উঠল সে। টেরই পায়নি কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। তারপর লুডেরাপে ওদের বাবার বাসার দিকে চলল ওরা।

বোনের চেহারা দেখেই ওয়ালান্ডার বুঝতে পারছে, পিতার অমন দুরাবস্থা দেখে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে ক্রিস্টিনা। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আবর্জনা আর ময়লা কাপড় পরিষ্কার করল ওরা একসাথে।

"এমনটা কিভাবে হলো?" জিজ্ঞেস করল ক্রিস্টিনা। বলার ধরণ দেখে ওয়ালান্ডারের মনে হলো, তাকে দুষছে ক্রিস্টিনা ওদেরদের বাবার এমন দশার জন্য।

হয়ত ক্রিস্টিনাই ঠিক। চাইলে ওয়ালান্ডার হয়ত কিছু করতে পারত। অন্তত আরও আগেই টের পাওয়া উচিত ছিল ওর। মুদি দোকান থেকে সদাইপাতি কিনে মারিয়াগতায় ফিরে এল ওরা। ডিনার খেতে খেতে কথা বলতে লাগল ওদের পিতার ভবিষ্যৎ নিয়ে।

"রিটায়ারমেন্ট হোমে পাঠালে উনি মারাই যাবেন," বলল ক্রিস্টিনা।

"এছাড়া আর কী উপায়ই বা আছে?" বলল ওয়ালান্ডার। "এখানে থাকতে পারবেন না। তোমার সাথে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। লুডেরাপের বাসাটায় রাখলেও লাভ হবে না। তাহলে কী করব?"

শেষতক দুজনে একমত হলো যে, নিজের বাড়িতে থাকাটাই ওদের পিতার জন্য সবচেয়ে ভালো হবে। মাঝে মাঝে এসে দেখা করে যাবে দুই ভাইবোন।

"আমাকে কখনও দেখতে পারতেন না তিনি," কফি খাওয়ার সময় বলল ওয়ালান্ডার।

"কী যা-তা বলছ? দেখতে পারবেন না কেন?"

"আমি পুলিশে যোগ দেয়ার কারণে।"

"তোমার কী ধারণা, বাবা অন্য কিছু বানাতে চেয়েছিলেন তোমাকে?"

"হ্যাঁ, কিন্তু কী, সেটা কখনও বলেননি।"

ঘুমানোর জন্য বোনকে সোফায় জায়গা করে দিল ওয়ালান্ডার। যখন ওদের বাবাকে নিয়ে আর কিছু বলার রইল না, তখন যা যা ঘটেছে সব খুলে বলল সে। বলতে গিয়ে টের পেল, আগের মতো সৌহার্দ্যপূর্ণ ভাবটা নেই আর তাদের মাঝে। অনেক দিন ধরে দেখাসাক্ষাৎ নেই আমাদের, ভাবল সে। এমনকি মোনা আর আমার বিচ্ছেদ নিয়েও কিছু বলতে সংকোচ করছে ও।

অর্ধেক ভরা কগনেকের একটা বোতল নিয়ে এল সে। মাথা নাড়িয়ে ক্রিস্টিনা না করে দিল নিজের জন্য এক গ্লাস ঢেলে নিল।

টিভি চ্যানেলগুলো স্টকমকে নিয়ে মেতে আছে। বার্গম্যানের পরিচয় ফাঁস করা হয়নি। ওয়ালান্ডার জানে, শুধুমাত্র সাবেক পুলিশ অফিসার হওয়ার

কারণেই এই সুবিধাটুকু পেয়েছে বার্গম্যান। তার পরিচয় ও শরণার্থী খুনের সাথে সম্পৃক্ততা ঢাকতে গলদঘর্ম হতে হচ্ছে ন্যাশনাল পুলিশ প্রধানকে। তবে আজ হোক বা কাল, সত্য বেরিয়ে আসবেই।

এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল।

বোনকে ফোনটা রিসিভ করতে বলল ওয়ালান্ডার। "দেখ কে কল করেছে। তারপর বলবে, আমি বাসায় আছি কিনা চেক করে দেখবে তুমি।"

"ব্রোলিন নামের এক মহিলা," করিডোর থেকে ফিরে এসে জানালো ক্রিস্টিনা।

যন্ত্রণা হওয়া সত্ত্বেও চেয়ার ছেড়ে উঠে ফোন ধরতে গেল ওয়ালান্ডার।

"আশা করি আপনার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাইনি," বলল অ্যানেট ব্রোলিন।

"একদমই না। আমার বোন এসেছে। ওর ওপর কাজের ভার চাপিয়ে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলাম আরকি।"

"ভাবলাম আপনাকে ফোন করে অভিনন্দন জানাই। এমন অসাধারণ কাজের জন্য আপনারা প্রশংসার দাবিদার।"

"ভাগ্য সহায় ছিল অনেক ক্ষেত্রে।"

কেন ফোন করেছে ব্রোলিন? ভাবল ওয়ালান্ডার। তারপর দ্রুত একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে বসল।

"আপনি কি ব্যস্ত? একটা ড্রিঙ্ক হলে কেমন হয়?"

"মন্দ না। কোথায়?" ব্রোলিনের কণ্ঠে বিস্ময়।

"আমার বোন তো এখন ঘুমিয়ে পড়বে। আপনার ওখানে হলে সমস্যা হবে?"

"নাহ, চলে আসুন।"

ফোন রেখে লিভিং রুমে ফিরে এল ওয়ালান্ডার।

"এত তাড়াতাড়ি ঘুমাই না আমি," বলল ক্রিস্টিনা।

"আমি একটু বের হচ্ছি। কখন ফিরব ঠিক নেই। তুমি ঘুমিয়ে পড়।"

ঠান্ডা বাতাসে এসে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল ওয়ালান্ডার। রেগেমেন্টসগতায় এসে এক ধরণের স্বস্তি অনুভব করল। আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে হ্যাজহোমের খুনের সমাধা করতে পেরেছে ওরা। ফের লুনাপের জোড়া খুনের দিকে নজর দিবার সময় হয়েছে এবার।

সে জানে যে চমৎকারভাবে শরণার্থী খুনটার ইতি টেনেছে। ভুল করেনি নিজের স্বজ্ঞাকে প্রাধান্য দিয়ে। হর্সবক্সে করে ধাওয়া করার কথা মনে পড়তেই শিউরে উঠল একবার। তবে স্বস্তির আবেশ ছেড়ে গেল না।

সদ্য বানানো একটা বিল্ডিং এর চতুর্থ তলায় থাকে অ্যানেট ব্রোলিন। ওয়ালান্ডার ইন্টারকমে ফোন দিলে রিসিভ করল সে। ফ্ল্যাটটা বিশাল হলেও সুসজ্জিত না। ঝুলানোর অপেক্ষায় পড়ে আছে কিছু চিত্রকর্ম।

"জিন অ্যান্ড টনিক চলবে?" জিজ্ঞেস করল ব্রোলিন। "আমি আবার অত বাছবিচার করি না।"

মাথা কাত করে সায় জানালো ওয়ালান্ডার। গ্লাস হাতে ওর মুখোমুখি একটা সোফায় পা তুলে বসল ব্রোলিন। আরও একবার তার রূপে মশগুল হলো ওয়ালান্ডার।

"আয়নায় আপনার চেহারাটা দেখেছেন একবার?" হেসে বলল ব্রোলিন।

"এতটাই কি বাজে দেখাচ্ছে? অনেকবার শুনতে হলো কথাটা।"

এমন সময় ক্লাস ম্যানসনের কথা মনে পড়ল ওয়ালান্ডারের। একটা দোকানে ডাকাতি করেছে লোকটা। কিন্তু ব্রোলিন আটকের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। যদিও এখন পেশাগত কোন বিষয় নিয়ে কথা বলা উচিত না। তবুও নিজেকে সামলাতে পারল না ওয়ালান্ডার।

"ক্লাস ম্যানসন," বলল সে। "নামটা মনে আছে?"

মাথা দোলাল ব্রোলিন।

"হ্যানসন বলল, আপনি নাকি বলেছেন আমাদের তদন্ত যথেষ্ট না। ম্যানসনের রিমান্ডের জন্যেও নাকি আবেদন করবেন না।"

"তদন্ত যথাযথ ভাবে করা হয়েছে বলে মনে হয়নি আমার। দুর্বল সাক্ষী, অপর্যাপ্ত প্রমাণ। এরকম অবস্থায় রিমান্ডের জন্য আবেদন করাটা হবে দায়িত্বজ্ঞানহীনের পরিচয়।"

"অন্য কেসগুলোর চেয়ে কম গুরত্ব দেয়া হয়নি এই কেসটা তদন্ত করার সময়। তাছাড়া একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপনি ভুলে যাচ্ছেন।"

"কী?"

"আগেও কয়েকটা দোকানে ডাকাতির অভিযোগ আছে ক্লাস ম্যানসনের বিরুদ্ধে।"

"তাহলে আরও ভালোভাবে তদন্ত করুন।"

"রিপোর্টে তো কোন সমস্যা দেখি না। এই লোককে যদি আমরা ছেড়ে দিই, তাহলে বেরিয়ে আবারও অপরাধে লিপ্ত হবে সে।"

"চাইলেই কাউকে আটক করতে পারেন না আপনি।"

শ্রাগ করল ওয়ালান্ডার। "অন্তত যথাযথ প্রমাণ জোগাড় করা পর্যন্ত তাকে আটকে রাখার অনুমতি দিন?"

"সম্ভব না।"

"এত একগুঁয়ে কেন আপনি? ম্যানসনই করেছে ডাকাতিটা। আরও কিছুদিন আটকে রাখতে পারলে সে স্বীকার করবেই। কিন্তু কিঞ্চিৎ পরিমাণেও যদি ছাড়া পাবার আশা দেখতে পায়, তাহলেই বেঁকে বসবে।"

"প্রসিকিউটরদের একগুঁয়ে হতে হয়। নাহলে দেশে আইন-কানুন বলে কিছু থাকবে?"

বেপরোয়া হয়ে উঠল ওয়ালান্ডার।

"প্রশ্নটা আমিও করতে পারি," বলল সে। "একটা প্রদেশের সামান্য এক পুলিস ডিটেকটিভ আমি। এক সময় বিশ্বাস করতাম, জনগণের জানমালের হেফাজত করাই হচ্ছে পুলিশের দায়িত্ব। হয়ত এখনও বিশ্বাস করি তা। কিন্তু আইনকানুন কিভাবে প্রতিনিয়ত ব্যর্থ হচ্ছে তা আমি দেখেছি। বয়সের দোহাই দিয়ে কিশোর অপরাধীদের আরও প্ররোচিত করা হয় অপরাধে। কেউ হস্তক্ষেপ করে না। দিনকে দিন বেড়েই চলছে অপরাধের পরিমাণ। ভোগান্তি বাড়ছে সাধারণ মানুষের। কিন্তু এ নিয়ে কি কারও মাথাব্যথা আছে? যত দিন যাচ্ছে, আরও অবনতি ঘটছে।"

"আপনি দেখছি আমার বাবার মতো," বলল ব্রোলিন। "পুরনো ধ্যানধারণায় বিশ্বাসী, প্রগতিবিরোধী। আগে বিচারক ছিলেন বাবা। এখন অবসর নিয়েছেন। আগের দিনগুলো কেমন সোনালি ছিল, তাই নিয়ে আফসোস করেই দিন কাটান এখন।"

"হতে পারে। হয়ত আমি রক্ষণশীল, প্রাচীন ধারণায় বিশ্বাসী। কিন্তু এখন বুঝতে পারি, কেন মানুষ আইন নিজের হাতে তুলে নেয়।"

"তাহলে একজন বিপথগামী মানুষ কেন একজন নিরীহ শরণার্থীকে খুন করল, তাও বুঝতে পারছেন নিশ্চয়?"

"হ্যাঁ এবং না। মানুষ এখন আর নিজেদের নিরাপদ ভাবতে পারে না। ভীত থাকে বিপদের আশঙ্কায়। বিশেষ করে এরকম কৃষিভিত্তিক এলাকাগুলোতে। শীঘ্রই দেখবেন, মিউনিসিপাল ভোটের আশায় কেউ একজন শরণার্থীদের বিরুদ্ধে কথা বলে হিরো হয়ে যাবে।"

"সংসদের সিদ্ধান্তের বাইরে আমরা কেউই যেতে পারব না। শরণার্থীদের ব্যাপারে দেশে আইন আছে। এবং আমাদের তা মেনে নিতে হবে।"

"ভুল। বরং শরণার্থীদের ব্যাপারে যথাযথ আইনের অভাবই এই বিশৃঙ্খলার মূল কারণ। বর্তমান পরিস্থিতির কথাই ধরুন। যে যেখান থেকে, যে দিক দিয়ে পারে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ছে। নিয়ন্ত্রণ করার কেউ নেই। কাস্টম সার্ভিস দেখে যাচ্ছে হাতপা গুটিয়ে। প্রতিনিয়ত মাদক আর অবৈধ শরণার্থী দিয়ে ভরে যাচ্ছে দেশটা।"

সোমালি খুনের প্রসঙ্গ উদাহরণ হিসেবে টানল ওয়ালান্ডার।

"বার্গম্যানকে অবশ্যই তার প্রাপ্য শাস্তি ভোগ করতে হবে, বলল সে। "কিন্তু ইমিগ্রেশন সার্ভিস আর সরকারকেও তাদের দায়ভার নিতে হবে।"

"কী যা-তা বলছেন?"

"অবান্তর কিছু বলছি না। রোমানিয়ানিদের নিরাপত্তার ভার কি আমাদের নেয়ার কথা? ওদের নিরাপত্তা দেখবে ওদের দেশের স্বৈরাচারী সিক্রেট পুলিস। অথচ তারা এসে ভিড় করছে সুইডেনে। এদের কি আশ্রয় দেয়া উচিত?"

"আইন সবার জন্য সমান।"

"সবসময় কি তা মানা হয়? ভুল হলেও কি মানা উচিত?"

সোফা থেকে উঠে গ্লাস দুটো ভরে আনতে গেল ব্রোলিন। হতাশ বোধ করল ওয়ালান্ডার। অনেক পার্থক্য আমাদের চিন্তাধারায়, মনে হলো তার। দশ মিনিট হলো না, এরইমাঝে একটা শূন্যতা তৈরি হয়ে গেল দুজনের মাঝে।

ক্রোধ ভর করল ওর ওপর। ব্রোলিনের দিকে তাকাতেই কামনা জাগল শরীরে। শেষ কবে মিলিত হয়েছিল মোনার সাথে? এক বছর হয়ে গেছে প্রায়। যৌনতা বিহীন এক বছর।

ভাবনাটা মাথায় আসতেই গুঙিয়ে উঠল সে।

"আপনি ঠিক আছেন?" জিজ্ঞেস করল ব্রোলিন।

সহানুভূতির আশায় মাথা নাড়াল ওয়ালান্ডার।

"আপনার এখন ঘুম দরকার," বলল ব্রোলিন।

কিন্তু এখনই ফেরার ইচ্ছা নেই ওয়ালান্ডারের। মোনাকে হারিয়ে ঠিকানা হারিয়েছে সে। খালি গ্লাসটা বাড়িয়ে ধরল ব্রোলিনের দিকে আরেকবার ভরে দেয়ার জন্য। এতটাই মাতাল হয়ে পড়েছে যে স্বাভাবিক বোধবুদ্ধি কাজ করছে না।

"আরেক গ্লাস," বলল সে। "আমার সফলতার পুরষ্কার স্বরুপ।"

"তারপর বাড়ি ফিরে যাবেন," শীতল কণ্ঠে বলল ব্রোলিন।

হঠাৎ করেই পাল্টে গেছে তার সুর। পাত্তা দিল না ওয়ালান্ডার। গ্লাস ভর্তি করে ব্রোলিন ফিরে এলে টান দিয়ে তাকে চেয়ারে বসালো।

"আমার পাশে বসুন," ব্রোলিনের উরুতে হাত বুলিয়ে বলল সে।

ঝট করে উঠে দাঁড়াল ব্রোলিন। তারপর ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিল ওয়ালান্ডারের মুখে। হাতের আঙটির খোঁচা খেয়ে কেটে গেল ওয়ালান্ডারের গাল।

"এক্ষুনি বাড়ি ফিরে যান," বলল সে।

হাতের গ্লাস টেবিলে নামিয়ে রাখল ওয়ালান্ডার। "নাহলে কী করবেন?" বলল সে। "পুলিশ ডাকবেন?"

উত্তর দিল না ব্রোলিন। রাগ ফেটে পড়ছে তার দুচোখ থেকে। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে পড়ে যেতে নিয়েছিল ওয়ালান্ডার। সহসাই অনুধাবন করতে পারল কী করেছে সে।

"ক্ষমা করবেন," বলল সে। "আমি আসলে স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলাম না।"

"আমি এই ঘটনার কথা ভুলে যাব," বলল ব্রোলিন। "কিন্তু এখনই আপনি বেরিয়ে যান।"

"আমার মাথা ঠিকমতো কাজ করছিল না," হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল ওয়ালান্ডার।

হাত মেলালো ব্রোলিন।

"আমি মনে রাখব না যা করেছেন," বলল ব্রোলিন। "শুভরাত্রি।"

আরও কিছু বলতে চাইল ওয়ালান্ডার। এরকম ধোঁয়াটে অবস্থাতেও পরিষ্কার বুঝতে পারছে, সে যা করেছে তা অমার্জনীয়। যেমনটা করেছিল মোনার সাথে ডিনারের পর মাতাল অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে। কিন্তু বলার মতো কিছু পেল না। ব্রোলিনের বাসা থেকে বেরিয়ে এল সে। পেছনে সশব্দে লেগে গেল দরজা।

রাগ হচ্ছে ওর নিজের ওপর। মদ খাওয়া বন্ধ করতে হবে আমাকে, বলল মনে মনে। মাতাল হলে নিজেকে সামলাতে পারি না আমি। রাস্তায় বেরিয়ে জোরে শ্বাস টানল সে। ফুসফুস ভরে গেল শীতল বাতাসে।

এ কী করেছি আমি? ভাবল সে। কিভাবে এরকম বোকামি করতে পারলাম এই বয়সে এসে? একটা মাতাল ছেলে হলে নাহয় এক কথা ছিল।

বাড়ি ফিরে এল ওয়ালান্ডার। আগামীকাল থেকে আবারও শুরু হবে লুনাপের জোড়াখুনের খুনিদের তালাশ।

বইঘর.কম

তেরো

সোমবার সকালে মালমোতে অবস্থিত একটা শপিং সেন্টারে গেল ওয়ালান্ডার। ফুলের দোকান থেকে কিনল দুটো ফুলের তোড়া। এক সপ্তাহ আগে এই রাস্তা ধরেই গিয়েছিল একটা খুনের ঘটনাস্থলে। গত সপ্তাহটা ছিল ওর পেশাগত জীবনের সবচেয়ে টানটান উত্তেজনাকর সময়। যতবার আয়না দেখে, প্রতিটা আঁচড়-কালশিটেকে মনে হয় গেল সপ্তাহের স্মৃতিচিহ্ন।

তাপমাত্রা আজ মাইনাস ছয় ডিগ্রী সেলসিয়াস। বাতাসের ছিটেফোঁটাও নেই। সকাল আটটার খানিক পরে স্টেশনে এসে পৌছাল ওয়ালান্ডার। সুইচবোর্ডে গিয়ে একটা ফুলের তোড়া দিল এবাকে। প্রথমে নিতে চাইল না এবা। তবে খুশিতে ঝলমল করতে লাগল তার মুখ। দ্বিতীয় তোড়াটা নিয়ে নিজের অফিসে চলে এল ওয়ালান্ডার। ডেস্কের ড্রয়ার থেকে একটা কার্ড বের করে ভাবতে বসল কী লিখবে অ্যানেট ব্রোলিনের উদ্দেশ্যে। শেষমেশ মনের মতো কিছু না পেয়ে গত রাতে তার অযাচিত ও অনিচ্ছাকৃত আচরণের জন্য ক্ষমা চাইল। দোষ চাপালো মদের ওপর।

"সত্যি বলতে আমি খুব লাজুক স্বভাবের মানুষ," লিখল সে, যদিও কথাটা ডাহা মিথ্যা। ভাবছে, এই লাইনটা পড়ে হয়ত কিছুটা হলেও রাগ কমবে অ্যানেট ব্রোলিনের।

প্রসিকিউটরের অফিসের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যাবে সে, এমন সময় এল বিয়র্ক। গায়ে স্পেন থেকে আনা ফুলের ছাপঅলা শার্ট। বরাবরের মতোই এত আস্তে নক করেছে যে ওয়ালান্ডার শুনতেই পায়নি।

"ফুলের তোড়া পাঠিয়েছে নাকি কেউ?" বলল বিয়র্ক। "ভালো। এটা তোমার প্রাপ্য। নিগ্রো খুনের কেসটায় ভালো কাজ দেখিয়েছ।"

সোমালি লোকটাকে বিয়র্কের নিগ্রো বলাটা পছন্দ হলো না ওয়ালান্ডারের। তবে এটা নিয়ে তর্কে জড়ানোর কোন ইচ্ছা ওর নেই।

জানালার পাশের নড়বড়ে চেয়ারে বসে পড়ল বিয়র্ক।

"লুনাপের জোড়াখুনের দিকে এবার নজর দেয়া উচিত বলে মনে হলো আমার," বলল ওয়ালান্ডারের দিকে তাকিয়ে। "তদন্তের রিপোর্টগুলো পড়েছি আমি। অনেক খুঁত রয়ে গেছে। ভাবছি রিডবার্গকে এই কেসটার দায়িত্ব দিব। আর তুমি চেষ্টা কর বার্গম্যানের মুখ খোলাতে। কী বল?"

পাল্টা প্রশ্ন করল ওয়ালান্ডার। "রিডবার্গের কী মত?"

"ওর সাথে কথা বলিনি এখনও।"

"আমার মনে হয় উল্টোটা করলে ভালো হয়। রিডবার্গের পায়ে সমস্যা। আর লুনাপের কেসটায় প্রচুর হাঁটাহাঁটির দরকার পড়বে।"

কথাটা ভুল বলেনি ওয়ালান্ডার। তবে রিডবার্গের পায়ের কথা ভেবে বলেনি তা। লুনাপের খুনিদের সে নিজে ধরতে চায়।

"আরেকটা কাজ করা যায়," বলল বিয়র্ক। "বার্গম্যানের দায়িত্ব সুইয়েডবার আর হ্যানসনকে দেয়া যেতে পারে।"

মাথা দোলাল ওয়ালান্ডার। আপত্তি নেই তার।

নড়বড়ে চেয়ারটা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বিয়র্ক। "নতুন আসবাবপত্র লাগবে মনে হচ্ছে স্টেশনে।"

"লোকবল লাগবে আরও বেশি," বলল ওয়ালান্ডার।

বিয়র্ক বেরিয়ে যাবার পর টাইপরাইটারের সামনে বসে পড়ল ওয়ালান্ডার। দ্রুত হাতে রিপোর্ট লিখতে লাগল রুন বার্গম্যানের গ্রেফতার আর ভালফ্রিড স্ট্রমের মৃত্যুর ওপর। এমনভাবে লেখার চেষ্টা করল যাতে অ্যানেট ব্রোলিন বিরোধিতা করতে না পারে। পাক্কা দুই ঘন্টা লাগল শেষ করতে। শেষ কাগজটা টাইপরাইটার থেকে বের করে, সাইন করে, রিডবার্গের কাছে নিয়ে গেল সে।

ডেস্কের পেছনে বসে আছে রিডবার্গ। ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে। ওয়ালান্ডার যখন প্রবেশ করল, সবে টেলিফোন নামিয়ে রেখেছে সে।

"শুনলাম বিয়র্ক আমাদের আলাদা করতে চাইছে," বলল রিডবার্গ। "ভাগ্য ভালো যে বার্গম্যানকে নিয়ে ভাবতে হবে না আর।"

ডেস্কের ওপর রিপোর্টটা রাখল ওয়ালান্ডার। "পড়ে দেখ। কোন আপত্তি না থাকলে হ্যানসনকে দিয়ে দিবে।"

"আজ সকালে বার্গম্যানের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছে সুইয়েডবার," বলল রিডবার্গ। "লাভ হয়নি। এখনও মুখ খুলছে না বার্গম্যান। তবে গাড়িটা যেখানে দাঁড়িয়ে থাকার কথা, সেখানে যে ব্রান্ডের সিগারেটের অবশিষ্টাংশ পাওয়া গেছে, সে-ও একই ব্রান্ডের সিগারেট খায়।"

"শেষ পর্যন্ত কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে যে কী বেরুবে কে জানে," বলল ওয়ালান্ডার। "কারা দায়ী এসবের পেছনে? নিও-নাৎসী সংঘঠনগুলো? ইউরোপ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা বর্ণবাদীরা? এরকম একটা অপরাধ কেন করল তারা? ইচ্ছা হলো আর এসে গুলি করে দিল এক আগন্তুককে? কেন, সে কালো বলে?"

"জানার উপায় নেই," বলল রিডবার্গ। "এসব এখন আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মেনে নিয়েই এগিয়ে যেতে হবে।"

আধা ঘন্টা পর আবার দেখা করার সিদ্ধান্ত নিল দুজনে। ততক্ষণে রিপোর্টটা পড়ে শেষ করবে রিডবার্গ। এরপর লুনাপের জোড়াখুন নিয়ে আলোচনা করবে।

প্রসিকিউটরের অফিসে গেল ওয়ালান্ডার। অফিসে নেই অ্যানেট ব্রোলিন। ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে গেছে। ফিরলে তাকে দেয়ার জন্য ফুলের তোড়াটা রিসিপশনে জমা দিল ওয়ালান্ডার।

"আজ উনার জন্মদিন নাকি?" জিজ্ঞেস করল রিসিপশনে বসা তরুণী।

"মনে হয়," বলল ওয়ালান্ডার।

অফিসে ফিরে দেখে ক্রিস্টিনা অপেক্ষা করছে। সকালে ওয়ালান্ডার ঘুম থেকে উঠার আগেই বেরিয়ে গিয়েছিল সে। ভাইকে জানালো, ডাক্তার ও সোশ্যাল ওয়ার্কারের সাথে কথা হয়েছে তার।

"বাবা আগের চেয়ে ভালো আছেন," বলল সে। "ডাক্তার বলেছেন, ডিমেনশিয়ার কোন লক্ষণ নেই তার মধ্যে। যা ঘটেছে, তা সাময়িক মানসিক অসুস্থতা। বাসায় দেখেশুনে রাখলে ঠিক হয়ে যাবে। আজ দুপুরের দিকে কি আমাদের বাবার বাড়িতে নিয়ে যেতে পারবে? সময় না হলে তোমার গাড়িটা দিলেও চলবে।"

"অবশ্যই পারব। কিন্তু বাবাকে দেখে রাখবে কে?"

"এক মহিলাকে ঠিক করব ভাবছি। বাবার বাড়ির কাছেই থাকেন তিনি।"

মাথা দোলাল ওয়ালান্ডার। "ভাগ্য ভালো যে তুমি এসেছ। নাহলে যে কী হত!"

দুপুরের দিকে হাসপাতালে পৌছে যাওয়ার কথা দিল ওয়ালান্ডার। ক্রিস্টিনা চলে যাবার পর ডেস্ক খালি করল সে। তারপর লভগ্রেন কেসের যাবতীয় তথ্য-রিপোর্ট সম্বলিত একটা মোটা ফোল্ডার নিয়ে বসল চেয়ারে। কাজে নামবার পালা এবার।

বিয়র্ক জানিয়েছে, লুনাপের কেসে আপাতত চারজন থাকবে ওয়ালান্ডারের দলে। যেহেতু নাসলুন্ড অসুস্থ, মাত্র তিনজন নিয়ে রিডবার্গের অফিসে মিটিং শুরু হলো। মার্টিনসনের নতুন কিছু জানানোর নেই। তাকে দেখে মনে হচ্ছে, মদের প্রভাবে ভুগছে কিছুটা।

তদন্তের বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করতে লাগল ওরা। সেন্ট্রাল ক্রিমিনাল রেকর্ড থেকে জানতে পারা কিছু তথ্য যোগ করল মার্টিনসন। পুলিশ না এমন মানুষদের কাছে এমন খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা ও চুলচেরা বিশ্লেষণ সময়ের অপচয় মনে হতে পারে। কিন্তু তিনজন পুলিশ অফিসারের কাছে চিত্রটা ভিন্ন। তুচ্ছ তথ্যগুলোর আড়ালেই লুকিয়ে থাকে সত্য।

"লভগ্রেনের ইস্তায় যাতায়াতের খোঁজ নেওয়ার ভার দিলাম তোমাকে," মার্টিনসনের উদ্দেশ্যে বলল ওয়ালান্ডার। "কিভাবে তিনি শহরে গেলেন, আর কিভাবেই বা বাড়ি ফিরলেন, জানার চেষ্টা কর। তৃতীয় কোন সেফ-ডিপোজিট বক্স আছে কি লভগ্রেনের? দুটো ব্যাংকে যাওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে কী করছিলেন? কোন দোকানে গিয়ে কিছু কিনেছিলেন কি? কেউ কি দেখেছে তাকে? এই সব প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে আমাদের।"

"নাসলুন্ড বোধ হয় ব্যাংকগুলোর সাথে যোগাযোগ করা শুরু করেছিলেন," বলল মার্টিনসন।

"তাহলে বাসায় ফোন দিয়ে তার থেকে জেনে নাও," বলল ওয়ালান্ডার। "ওর সুস্থ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে পারব না আমরা।"

ঠিক হলো, রিডবার্গ যাবে লার্স হার্ডিনের সাথে দেখা করতে। আর ওয়ালান্ডার মালমোতে যাবে এরিক ম্যাগনোসনের সাথে দেখা করতে। গোরান বোম্যান মতে, এই লোকই লভগ্রেনের অবৈধ সন্তান।

"বাকি সব বাদ," বলল ওয়ালান্ডার। "যাকে যে কাজ করতে বলেছি, আগে সেগুলো শেষ করবে। তারপর পাঁচটা বাজে আবার মিটিং এ বসব।"

বোম্যানকে কল দিল সে।

"কাউন্টি কাউন্সিলে নিয়োজিত আছে এরিক ম্যাগনোসন," বলল বোম্যান। "তবে সে ওখানে ঠিক কী করে, তা জানতে পারিনি। কৃষানইস্তায় সময়টা ব্যস্ত যাচ্ছে একটু। তাই খোঁজ নিয়ে উঠতে পারিনি।"

"সমস্যা নেই। আমি খুঁজে বের করব তাকে," বলল ওয়ালান্ডার। "আগামীকাল সকালে ফোন দিব তোমাকে।"

দুপুরের দিকে হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা হলো সে। রিসিপশনে অপেক্ষা করছিল ওর বোন। লিফটে করে দুজনে চলল ওদের বাবার ওয়ার্ডের উদ্দেশ্যে।

ওরা পৌছে দেখে ডিসচার্জ করে দেয়া হয়েছে ওদের বাবাকে। করিডোরে বসে অপেক্ষা করছেন তিনি। মাথায় হ্যাট, পাশে নোংরা আন্ডারওয়্যার আর রঙের টিউব ভর্তি স্যুটকেস। তার পরনে নতুন স্যুট দেখে অবাক হলো ওয়ালান্ডার।

"আমি কিনে দিয়েছি," বলল ক্রিস্টিনা। "গত ত্রিশ বছরে একটা নতুন স্যুটও কেনা হয়নি তার।"

"কেমন আছ, বাবা?" জিজ্ঞেস করল ওয়ালান্ডার।

সরাসরি ওর চোখের দিকে তাকালেন ওর বাবা। তার দৃষ্টি দেখে ওয়ালান্ডার বুঝতে পারল, সুস্থ হয়ে গিয়েছেন তিনি।

"বাড়ি ফিরতে পারলে ভালো হয়," তীর্যক সুরে বললেন ওর বাবা। তারপর উঠে দাঁড়ালেন। মেয়ের হাতে ভর দিয়ে এগোলেন হাসপাতালের প্রবেশমুখের দিকে। স্যুটকেসটা তুলে নিয়ে পেছন পেছন চলল ওয়ালান্ডার। বাবাকে নিয়ে পেছনের সিটে বসল ক্রিস্টিনা। তারপর সবাই মিলে চলল লুডেরাপের দিকে।

ওদিকে ওয়ালান্ডারের মালমো যেতে হবে। বোনকে কথা দিল, সন্ধ্যা ছয়টার দিকে ফিরে আসবে। রাতে পিতার সাথে থাকবে বলে জানালো ক্রিস্টিনা। ওয়ালান্ডারকে বলল ডিনার কিনে আনতে। বাড়ি ফিরেই স্যুট পাল্টে আঁকাআঁকিতে লেগে পড়েছেন ওদের বাবা। ইজেলের সামনে দাঁড়িয়ে তুলি বুলাচ্ছেন অসমাপ্ত ছবিটাতে।

"যে মহিলাকে দেখাশোনার জন্য ঠিক করবে ভেবেছ, বাবা কি তাকে মেনে নেবে?" জিজ্ঞেস না করে পারল না ওয়ালান্ডার।

"জানতে হলে অপেক্ষা করতে হবে," জবাব দিল ক্রিস্টিনা।

ওয়ালান্ডার যখন কাউন্টি কাউন্সিলের মূল দালানের সামনে পৌঁছাল, তখন দুপুর দুইটা। গাড়ি পার্ক করে ভেতরে চলে এল সে।

"এরিক ম্যাগনোসনের কাছে এসেছি আমি," বলল রিসিপশনে বসে থাকা মহিলাকে।

"এখানে অন্তত তিনজন এরিক ম্যাগনোসন আছেন," বলল কাঁচের ওপাশে বসে থাকা মহিলা। "আপনি কোনজনকে খুঁজছেন?"

পরিচয়পত্র বের করে মহিলার সামনে তুলে ধরল ওয়ালান্ডার।

"আমি ঠিক জানি না," বলল সে। "তবে যাকে খুঁজছি, তার জন্মসাল পঞ্চাশের দশকে।"

সাথে সাথে বুঝে গেল মহিলা। "তাহলে আপনি বোধ হয় সেন্ট্রাল সাপ্লাইয়ের এরিক ম্যাগনোসনকে খুঁজছেন। বাকি যে দুজন আছেন, তারা আরও বয়স্ক। তা কী করেছে সে?"

মহিলার কৌতূহলী মুখের দিকে চেয়ে হাসলো ওয়ালান্ডার। "কিছু না। তার সাথে কথা বলতে এসেছি শুধু।"

সেন্ট্রাল সাপ্লাইয়ে যাওয়ার পথ বাতলে দিল মহিলা। ধন্যবাদ দিয়ে গাড়িতে ফিরে এল ওয়ালান্ডার। কাউন্টি কাউন্সিলের সাপ্লাই ওয়্যারহাউজ শহরের উত্তর প্রান্ত ঘেঁষে, অয়েল হারবারের নিকটে অবস্থিত। জায়গাটা খুঁজে পেতে অনেকক্ষণ ঘুরতে হলো ওয়ালান্ডারকে।

অফিস সাইন লাগানো দরজা দিয়ে প্রবেশ করল সে। বিশাল কাঁচের জানালা দিয়ে মালামাল নিয়ে ছুটোছুটি করতে দেখল কিছু হলুদ রঙের ফর্ক-লিফট ট্রাককে। খালি পড়ে আছে অফিস। সিঁড়ি বেয়ে একটা বিশাল

ওয়্যারহাউজে নেমে এল সে। বয়সে তরুণ একজনকে দেখতে পেল টয়লেট পেপার ভর্তি প্লাস্টিকের বস্তা জড়ো করতে। কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে ছেলেটার চুল।

"এরিক ম্যাগনোসনকে কোথায় পাওয়া যাবে?" কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল ওয়ালান্ডার।

লোডিং ডকের পাশে দাঁড়ানো একটা ফর্ক-লিফট ট্রাকের দিকে ইঙ্গিত করল ছেলেটা। লাল চুলো এক লোক বসে আছে ট্রাকের ক্যাবে। আর যাই হোক, এই লোককে মারিয়া লভগ্রেন বিদেশি ভেবে ভুল করেছে বলে মনে হলো না ওয়ালান্ডারের। অসন্তুষ্ট হলেও ভাবনাটা সরিয়ে রাখল একপাশে। এখনই কোন সিদ্ধান্তে পৌছানো উচিত হবে না।

"এরিক ম্যাগনোসন!" চেঁচিয়ে বলল সে। জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল লোকটা। তারপর ইঞ্জিন বন্ধ করে নেমে এল নিচে।

"এরিক ম্যাগনোসন?" জিজ্ঞেস করল ওয়ালান্ডার।

"কে বলছেন?"

"আমি থানা থেকে এসেছি। আপনার সাথে কিছু কথা ছিল।"

লোকটার মুখের ভাব পড়ার চেষ্টা করল ওয়ালান্ডার। অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ল না। পুলিশের কথা শুনে আর দশজন মানুষের মতোই অবাক হয়েছে লোকটা।

"কেন? কী হয়েছে?" জিজ্ঞেস করল সে।

চারপাশে তাকাল ওয়ালান্ডার। "কোথাও বসে কথা বলা যাবে?"

এক কোণায় বসানো কফি ভেন্ডিং মেশিনের কাছে চলে এল ম্যাগনোসন। ধুলো জমা কাঠের টেবিল আর কয়েকটা বেঞ্চ পাতানো আছে এখানে। দুটো এক ক্রোনা কয়েন ঢুকিয়ে এক কাপ কফি নিল ওয়ালান্ডার। ম্যাগনোসন নিল এক চিমটি নস্যি।

"আমি ইস্তা পুলিশ স্টেশন থেকে এসেছি," শুরু করল ওয়ালান্ডার। "লুনাপ নামের একটা গ্রামে ঘটে যাওয়া জোড়া খুন নিয়ে আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করার ছিল। আশা করি পত্রিকায় ঘটনাটা পড়েছেন?"

"পড়েছিলাম। কিন্তু এর সাথে আমার কী সম্পর্ক?"

ওয়ালান্ডারও তাই ভাবছে। এরিক ম্যাগনোসনের মধ্যে খুনির কোন বৈশিষ্ট্যই দেখতে পাচ্ছে না।

"আপনার বাবা নাম কী?"

কুঁচকে গেল লোকটার ভুরু। "বাবার নাম? আমার কোন বাবা নেই।"

"প্রত্যেক মানুষেরই জন্মদাতা থাকতে বাধ্য।"

বইঘর.কম

"আমার ঠিক জানা নেই।"

"মানে?"

"আমার যখন জন্ম হয়, তখন মা বিবাহিত ছিলেন না।"

"তিনি কখনও বলেননি আপনার জন্মদাতা কে?"

"না।"

"আপনি জানতে চাননি?"

"অবশ্যই চেয়েছি। ছোটবেলায় জ্বালিয়ে মেরেছি মাকে এই প্রশ্নটা করে। তারপর হাল ছেড়ে দিয়েছি।"

"কী বলতেন আপনার মা?"

দাঁড়িয়ে পড়ল ম্যাগনোসন। কফির জন্য বাটন চাপল ভেন্ডিং মেশিনে। "আমার পিতা সম্পর্কে কেন জানতে চাইছেন? এই খুনের ঘটনায় কি তিনি জড়িত?"

"পরে বলছি, বলল ওয়ালান্ডার। "আপনি যখন আপনার বাবা সম্পর্কে জানতে চাইতেন, তখন কী বলতেন আপনার মা?"

"ঠিক নেই।"

"বুঝলাম না।"

"একেক সময় একেক কথা বলতেন। কখনও বলতেন জানেন না। কখনও বলতেন একজন সেলসম্যান, যার সাথে পরে কখনও দেখা হয়নি। কখনওবা অন্য কিছু।"

"আপনার সন্দেহ জাগেনি?"

"জাগলেও বা কী? উনি যদি না বলেন, তাহলে আমি কী করতে পারি?"

ম্যাগনোসনের উত্তর শুনে সন্তুষ্ট হতে পারছে না ওয়ালান্ডার। নিজের পিতা পরিচয় সম্পর্কে কি কেউ এতটা উদাসীন হয়?

"মায়ের সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন?" জিজ্ঞেস করল সে।

"কী বলতে চাইছেন?"

"আপনাদের কি নিয়মিত দেখাসাক্ষাৎ হয়?"

"মাঝেমাঝে ফোন করেন মা। আমিও সময় পেলে কৃষানইস্তায় যাই দেখা করতে। আসলে সৎ বাবার সাথে আমার সম্পর্ক বেশি ভালো।"

ধাক্কা খেল ওয়ালান্ডার কথাটা শুনে। সৎ বাবা সম্পর্কে তো কিছু বলেনি বোম্যান।

"আপনার মা পুনরায় বিয়ে করেছিলেন?"

"ছোটবেলা থেকেই মাকে লোকটার সাথে থাকতে দেখে আসছি। জানি না তারা বিবাহিত কিনা। তাও আমি বাবা বলে ডাকি তাকে। তারপর আমার

বয়স যখন পনের, উনাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। এক বছর পর আমি মালমো চলে আসি।"

"যাকে আপনি বাবা বলে ডাকেন, উনি এখন কোথায়?"

"বাবা বেঁচে নেই। গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গেছেন।"

"উনিই যে আপনার আসল পিতা নন, এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত?"

"আমাদের দুজনের মাঝে যে পরিমাণ তফাৎ ছিল, তা কোন বাপ-ছেলের মধ্যে থাকা সম্ভব না।"

অন্য পথ অবলম্বনের সিদ্ধান্ত নিল ওয়ালান্ডার। "লুনাপে যে লোকটি খুন হয়েছেন, তার নাম ছিল ইয়োহানেস লভগ্রেন। এমন হওয়া কি সম্ভব যে তিনিই আপনার জন্মদাতা পিতা?"

বিস্ময় ফুটল সামনে বসে থাকা লোকটার চেহারায়।

"আমি কিভাবে জানব? আমার মাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন।"

"করা হয়েছে। কিন্তু তিনি স্বীকার করছেন না।"

"তাহলে আবার জিজ্ঞেস করুন। জীবিত কিংবা মৃত, আমিও আমার পিতার পরিচয় জানতে চাই।"

লোকটার কথা বিশ্বাস হলো ওয়ালান্ডারের। ম্যাগনোসনের ঠিকানা আর পার্সোনাল আইডেন্টিটি নাম্বার লিখে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে।

"আপনার সাথে আবারও যোগাযোগ করা হতে পারে," বলল এরিক ম্যাগনোসনের উদ্দেশ্যে।

ততক্ষণে ফর্ক-লিফটের ক্যাবে উঠে বসেছে লোকটা।

"সমস্যা নেই," বলল ম্যাগনোসন। "আর মায়ের সাথে দেখা হলে বলবেন, আমি হ্যালো বলেছি।"

ইস্তায় ফিরে এল ওয়ালান্ডার। স্কোয়ারে গাড়ি পার্ক করে হাঁটতে লাগল ফার্মেসির দিকে। সেখান থেকে গজ ব্যান্ডেজ কিনে চলল সুপারমার্কেট থেকে ডিনার কিনতে। গাড়িতে ফিরে আসার পথে নিজেকে রুখতে পারল না সে। কিছুদূর পিছনে গিয়ে ঢুকল মদের দোকানে। সামর্থ্যের বাইরে হওয়া সত্ত্বেও কিনে নিল এক বোতল মল্ট হুইস্কি।

ওয়ালান্ডার যখন স্টেশনে ফিরে এল, বিকেল তখন পড় পড়। রিডবার্গ বা মার্টিনসন দুইজনের একজনও নেই। প্রোসিকিউটরের অফিসে গেল সে। হাসলো রিসিপশনে বসে থাকা তরুণী।

"ফুলের তোড়া পছন্দ হয়েছে উনার," বলল সে।

"উনি কি অফিসে আছেন?"

"ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে।"

ফিরে চলল ওয়ালান্ডার। করিডোরে দেখা হয়ে গেল সুইয়েডবারের সাথে।

"বার্গম্যানের কী অবস্থা?" জিজ্ঞেস করল সে।

"মুখ খুলছে না এখনও," জানালো সুইয়েডবার। "তবে কথা না বলে যাবে কোথায়? অনেকগুলো প্রমাণ হাতে এসেছে। ল্যাবরেটরির টেকনিশিয়ানরা বলেছে, খুনের সাথে বার্গম্যানের অস্ত্রের সংযোগ বের করতে পারবে।"

"আর কিছু?"

"সন্দেহ নেই যে স্টুম আর বার্গম্যান একাধিক বর্ণবাদী আন্দোলনের সাথে জড়িত। কিন্তু খুনটা তারা নিজেরা করেছে, নাকি কারও আদেশে করেছে তা এখনও বলা যাচ্ছে না।"

"বিয়র্কের কী মত?"

"খুনিদের ধরা নিয়ে তো খুব হম্বিতম্বি করছিল। কিন্তু তারপর দেখা গেল, খুনের সাথে জড়িত একজন সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা। আমার ধারণা, বার্গম্যানকে আড়ালে রেখে সব দোষ স্টুমের ঘাড়ে চাপানো হবে। মরা লোক তো আর প্রতিবাদ করতে পারবে না। তবে আমার ধারণা, এই ঘটনায় বার্গম্যানও সমান ভাগিদার।"

"আমি ভাবছি স্টুমই আমাকে বাসায় ফোন করে হুমকি দিয়েছিল কিনা," বলল ওয়ালান্ডার। "তার মুখ থেকে কিছুই জানা গেল না।"

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল সুইয়েডবার। "এর মানে?"

"মানে হলো, এমন আরও অনেকেই থাকতে পারে যারা স্টুম আর বার্গম্যানের অসমাপ্ত কাজের ইতি টানতে চাইবে।"

"আমি বিয়র্ককে বলব শিবিরে নিরাপত্তা প্রহরা চালিয়ে যাওয়ার জন্য," বলল সুইয়েডবার। "ও, বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম। বেশ কিছু টিপ-অফ এসেছে। অনেকেই বলছে যে ইস্তায় আগুন লাগানোর ঘটনাটা এক দল বখাটের কাজ।"

"বৃদ্ধের মাথায় শালগম ছুড়ে মারার ঘটনাটাও মাথায় রেখো," বলল ওয়ালান্ডার।

"লুনাপের কেসটা কেমন যাচ্ছে?"

উত্তর দেয়ার আগে দ্বিধা করল ওয়ালান্ডার। "বুঝতে পারছি না। তবে আবারও উঠেপড়ে লেগেছি, এটা বলতে পারি।"

সাড়ে পাঁচটায় ওয়ালান্ডারের অফিসে হাজির হলো রিডবার্গ আর মার্টিনসন। ক্লান্ত দেখাচ্ছে রিডবার্গকে। আর মার্টিনসনের মেজাজ খারাপ।

"জানুয়ারির চার তারিখে বৃহস্পতিবারে লভগ্রেন কিভাবে ইস্তায় গেলেন আর ফিরলেন, তা এক রহস্য বটে," বলল সে। "ওই রুটের বাস চালকের

সাথে কথা বলেছি আমি। সে জানিয়েছে, শহরের দিকে আসতে হলে তার বাসেই চড়তেন ইয়োহানেস আর মারিয়া। কখনও একসাথে, কখনও আলাদা। তবে সে নিশ্চিত যে নববর্ষের পর ইয়োহানেস লভগ্রেন তার বাসে উঠেননি। আর কোন ট্যাক্সিও লুনাপের দিকে আসে না। নিস্ট্রম জানিয়েছেন, কোথাও যেতে হলে বাসেই যেতেন ওরা। আর লভগ্রেন যেরকম হাড়কিপ্টে ছিলেন, বাসে যাওয়াটাই তার পক্ষে স্বাভাবিক।"

"নিস্ট্রম আর লভগ্রেনরা বিকালে একসাথে কফি খেতেন প্রতিদিন," বলল ওয়ালান্ডার। "লভগ্রেনের ইস্তায় যাওয়া-আসা নিশ্চয় নিস্ট্রমদের কেউ দেখে থাকবেন।"

"এখানেই তো রহস্য," বলল মার্টিনসন। "উনারা বলছেন, ওইদিন নাকি লভগ্রেন শহরে যাননি। কিন্তু আমরা জানি সকাল সাড়ে এগারোটা থেকে দুপুর একটা পনেরো মিনিটের মাঝে দুইটা ব্যাংকে গিয়েছিলেন তিনি। অন্তত তিন-চার ঘন্টার জন্য বাড়ি ছিলেন না।"

"অদ্ভুত তো," বলল ওয়ালান্ডার। "ঠিক আছে, লেগে থাকো। দেখ, কিছু বের করতে পার কিনা।"

"ও, লভগ্রেনের আর কোন সেফ-ডিপোজিট বক্স নেই।"

"যাক, একটা সম্ভাবনা বাদ দেয়া গেল অন্তত।"

"কিন্তু সিমরিশামে থাকতে পারে। কিংবা থ্রেলেবোরি বা মালমোতে।"

"আগে ইস্তায় কিভাবে গেল-এল, সেটা বের করার চেষ্টা কর," বলল ওয়ালান্ডার। তারপর রিডবার্গের দিকে ফিরল।

"হার্ডিন তার আগের কথায় অনড়," নোটবুকে একবার চোখ বুলিয়ে বলল রিডবার্গ। "১৯৭৯ এর বসন্তে হঠাৎ করেই লভগ্রেন আর ওই মহিলাকে দেখতে পান। আর একটা বেনামি চিঠি থেকে জানতে পারেন লভগ্রেন আর ওই মহিলার সন্তান সম্পর্কে।"

"মহিলার বর্ণনা দিতে পেরেছে?"

"অত ভালোভাবে না। মনে হচ্ছে সন্দেহভাজন সব মহিলাকে লাইন ধরিয়ে দাঁড় করাতে হবে। তারপর হার্ডিন এসে খুঁজে বের করবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত জনকে।"

"হার্ডিনের কথায় সন্দেহ হচ্ছে নাকি তোমার?"

ঠাস করে নোটবুক বন্ধ করল রিডবার্গ।

"আগেই বলেছি তোমাকে, সব কেমন খাপছাড়া মনে হচ্ছে আমার। মানছি যে হাতে যেসব সূত্র আছে সেগুলোই এখন একমাত্র ভরসা। কিন্তু কেন যেন

মনে হচ্ছে ভুল পথে এগোচ্ছি আমরা। যে বিষয়টা আমাকে খোঁচাচ্ছে তা হলো, অন্য কোন পথ আমাদের সামনে খোলা নেই।"

এরিক ম্যাগনোসনের সাথে হওয়া সাক্ষাৎকারের কথা বলল ওয়ালান্ডার।

"খুনের রাতে উনি কোথায় ছিলেন জানতে চাননি?" মার্টিনসনের কণ্ঠে বিস্ময়।

এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে যাওয়ায় লজ্জা পেল ওয়ালান্ডার। তবে স্বীকার করল না সহকর্মীদের সামনে।

"আরও পরে," বলল সে। "একবারেই যদি সব জিজ্ঞেস করি ফেলি, তাহলে তো দ্বিতীয়বার যাওয়ার অজুহাত দেখাতে পারব না।"

ওয়ালান্ডারের নিজের কানেই বেখাপ্পা শোনাল কথাটা। অবশ্য রিডবার্গ কিংবা মার্টিনসন কেউই প্রতিক্রিয়া দেখাল না। নীরবতা নামল কামরায়। প্রত্যেকেই ডুবে গেল যার যার চিন্তায়। পূর্বেও বহুবার এমন পরিস্থিতিতে পড়েছে ওয়ালান্ডার। এমন একটা মুহূর্ত যখন তদন্ত থমকে দাঁড়ায়। অনেকটা নড়তে না চাওয়া ঘোড়ার মতো। এখন ওদের চেষ্টা করে যেতে হবে আর অপেক্ষা করতে হবে যতক্ষণ না ঘোড়াটা হাঁটতে শুরু করে।

"এখন আমাদের কিভাবে এগোনো উচিত?" নীরবতা ভেঙে অবশেষে মুখ খুলল ওয়ালান্ডার।

তারপর নিজেই উত্তর দিল।"মার্টিনসন, তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে কিভাবে সকলের চোখ ফাঁকি দিয়ে ইস্তায় যাওয়া ও ফিরে আসা সম্ভব। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটা জানতে হবে।"

"রান্নাঘরের একটা কাবার্ডে রসিদ ভর্তি একটা বয়াম দেখেছিলাম," বলল রিডবার্গ। "ওই শুক্রবারে কোন দোকান থেকে কিছু কিনে থাকতে পারেন লভগ্রেন। কোন দোকানদার হয়ত দেখে থাকবে তাকে।"

"কিংবা তার একটা উড়ন্ত গালিচা ছিল," বলল মার্টিনসন। "আমি খুঁজে দেখব।"

"তার সব আত্মীয়স্বজনদের খোঁজখবর নিতে হবে," বলল ওয়ালান্ডার।

মোটা ফোল্ডারটা থেকে নাম-ঠিকানা লেখা একটা লিস্ট বের করে আনল সে। বাড়িয়ে ধরল রিডবার্গের দিকে।

"লভগ্রেনদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বুধবারে," বলল রিডবার্গ। "ভিলা চার্চে। যদিও এসব আমি পাত্তা দিই না। কিন্তু এবার মনে হচ্ছে দিতে হবে।"

"আগামীকাল আবার কৃষানইস্তায় যাব আমি," বলল ওয়ালান্ডার। "এলেন ম্যাগনোসনের আচরণ সন্দেহজনক মনে হয়েছিল বোম্যানের। ওর ধারণা, মহিলা মিথ্যা বলেছে।"

ছয়টার কিছু আগে শেষ হলো ওদের মিটিং। পরের দিন বিকালে আবার মিটিং এ বসার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো।

"নাসলুন্ড যদি সুস্থ বোধ করে, চুরি যাওয়া গাড়িটার ওপর তদন্ত করতে বলবে," বলল ওয়ালান্ডার। "আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলেই গিয়েছিলাম। ওই পোলিশ দম্পতি লুনাপে কী করছে, খোঁজ নিয়েছ কেউ?"

"জামাই লোকটা জন্দবেরিয়ায় চিনি শোধনাগারে কাজ করে," জানালো রিডবার্গ। "কাগজপত্র সব ঠিকঠাক। অবশ্য লোকটা নিজেও জানতো না তা।"

রিডবার্গ আর মার্টিনসন চলে যাবার পর চুপচাপ বসে রইল ওয়ালান্ডার। একগাদা কাগজপত্র জমে আছে ডেস্কের ওপর। নববর্ষের সময় ঘটা একটা নারী নির্যাতনের কেস, কয়েকদিন আগে বয়ে যাওয়া ঝড়ে হারানো গরু থেকে শুরু উল্টে যাওয়া লরি-হাবিজাবি রিপোর্টে ভর্তি। শুধু নেই সময়। একদম তলার দিকে একটা নোট দেখতে পেল সে। নোটে লেখা, বেতন বাড়ানো হয়েছে তার। এখন থেকে প্রতি মাসে ঊনচল্লিশ ক্রোনার বেশি পাবে।

যাবতীয় সব কাগজপত্র যখন দেখা শেষ করল সে, সাড়ে সাতটা বেজে গেছে ততক্ষণে। বোনকে ফোন দিয়ে জানিয়ে দিল সে আসছে।

"আমরা উপোস বসে আছি," বলল ক্রিস্টিনা। "তুমি সবসময় এত দেরি করে বাড়ি ফিরো নাকি?"

একটা পুচ্চিনি অপেরার ক্যাসেট নিয়ে গাড়িতে গিয়ে বসল ওয়ালান্ডার। অ্যানেট ব্রোলিনের কথা মনে পড়ল তার। গতরাতের ঘটনা আসলেই ব্রোলিন ভুলে গেছে কিনা যাচাই করে দেখা দরকার। তবে তা পরে করলেও চলবে।

ওয়ালান্ডারের গাড়ির আওয়াজ শুনে ড্রাইভওয়েতে বেরিয়ে এল ক্রিস্টিনা। জানালো, ওদের বাবার দেখাশোনার জন্য যে মহিলাকে ঠিক করছে তার বয়স পঞ্চাশের কোঠায়। হলে কী হবে, মহিলা বেশ শক্ত ধাতের। ওদের বাবাকে যত্নেই রাখবেন।

"এর চেয়ে ভালো কাউকে পাওয়া সম্ভব না," বলল সে।

"বাবা কী করছেন এখন?" জিজ্ঞেস করল ওয়ালান্ডার।

"ছবি আঁকছেন।"

ডিনার বানাতে চলে গেল ক্রিস্টিনা। স্টুডিও এর টোবাগ্যানে বসে পিতার ছবি আঁকা দেখতে লাগল ওয়ালান্ডার। সেই রাতের ঘটনাটা যেন একেবারেই ভুলে গিয়েছেন ওর বাবা।

বাবার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে, ভাবল ওয়ালান্ডার। সপ্তাহে অন্তত তিনদিন। পারলে নির্দিষ্ট একটা সময়ে।

খাওয়া শেষে পিতার সাথে কয়েক ঘন্টা তাস খেলল দুই সন্তান। এগারোটার দিকে ঘুমাতে গেল ওদের বাবা।

"আগামীকাল চলে যাব আমি," বলল ক্রিস্টিনা। "অনেকদিন হয়ে গেল এসেছি।"

"ধন্যবাদ আসার জন্য," বলল ওয়ালান্ডার।

পরদিন সকাল আটটায় এসে বোনকে বিমানবন্দরে পৌছে দিবে বলে কথা দিল সে।

"স্টুরাপে সিট খালি পাইনি," বলল ক্রিস্টিনা। "এভারড থেকে উঠতে হবে আমাকে।"

সমস্যা নেই বলে জানালো ওয়ালান্ডার। এমনিতেই কৃষানইস্তায় যেতে হবে তাকে।

মাঝরাতের একটু পরে মারিয়াগতায় নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এল সে। বড় একটা গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে নিয়ে চলল বাথরুমে। তারপর লম্বা একটা সময় গা ভিজিয়ে রাখল কুসুম গরম পানিতে।

না চাইলেও রুন বার্গম্যান আর ভালফ্রিড স্টুম এসে ভিড় করতে লাগল তার চিন্তায়। ঘুরেফিরে একই ধারণা খেলে যাচ্ছে মাথায়। একটা নতুন পৃথিবীর জন্ম হয়েছে ওর অগোচরে। আর সে এখনও পুরনো পৃথিবীতে রয়ে গেছে। কিভাবে টিকে থাকবে এই নতুন যুগে? দ্রুত ঘটে চলা এতসব পরিবর্তনের সাথে কী করে তাল মেলাবে?

সোমালি খুনের ঘটনাটা নতুন জগতের অপরাধ। লুনাপের জোড়া খুন অবশ্য পুরনো ধাঁচের। আসলেই কি তাই? আগে কি খুনখারাপিতে এতটা নৃশংসতা ছিল? ফাঁস পরিয়ে অত্যাচার? মনে হয় না।

দেড়টার দিকে খাটে উঠে এল ওয়ালান্ডার। আগে কখনও এতটা একাকী বোধ করেনি সে।

পরবর্তী তিন দিন কিছুই ঘটল না। কাজে ফিরে ওয়ালান্ডার দেখে চুরি যাওয়া গাড়ির রহস্য সমাধান করে ফেলেছে নাসলুন্ড। ডাকাতি শেষে হালমইস্তায় গাড়িটা ফেলে যায় একজন পুরুষ আর একজন মহিলা। খুনের রাতে বাইস্তার একটা বোর্ডিং হাউজে ছিল তারা। বোর্ডিং হাউজের মালিক তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে।

এলেন ম্যাগনোসনের সাথে কথা বলেছে গোরান বোম্যান। এবারও মহিলা ইয়োহানেস লভগ্রেনকে তার সন্তানের পিতা হিসেবে অস্বীকার করেছেন।

ওয়ালান্ডার আবারও গেল এরিক ম্যাগনোসনের সাথে দেখা করতে। খুনের রাতে কোথায় ছিল জানতে চাইলে ম্যাগনোসন জানালো, তার বাগদত্তার সাথে

ছিল। মার্টিনসন এখনও জানতে পারেনি লভগ্রেন কিভাবে ইস্তায় গিয়েছিল আর ফিরে এসেছিল। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় গিয়ে লভগ্রেনদের উনিশজন আত্মীয়ের সাথে কথা বলেছে রিডবার্গ। কিন্তু তদন্তে কাজ দিবে এমন কিছু জানতে পারেনি।

হিমাঙ্কের ঘরে নেমে এসেছে তাপমাত্রা। একদিন বাতাস নেই তো, পরদিন দমকা হাওয়ায় যেন উড়িয়ে নেবে। করিডোরে অ্যানেট ব্রোলিনের সাথে দেখা হয়ে গেল ওয়ালান্ডারের। ফুলের তোড়ার জন্য ধন্যবাদ জানালো ব্রোলিন। তবে তার হাবভাব দেখে সেই রাতের ঘটনা আসলেই ভুলে গেছে কিনা নিশ্চিত হতে পারল না ওয়ালান্ডার।

যদিও তার বিরুদ্ধে গাদা গাদা প্রমাণ জড়ো হয়েছে, তবুও মুখ খুলছে না বার্গম্যান। একাধিক বর্ণবাদী সংঘঠন হামলার দায় স্বীকার করতে চেয়েছিল। সুইডেনের শরণার্থী পলিসি নিয়ে তর্কে মেতেছে প্রেস ও অন্যান্য মিডিয়া। স্কেওনাতে পরিস্থিতি শান্ত থাকলেও অন্যান্য জেলার বেশ কিছু শরণার্থী শিবিরে ক্রস পোড়ানো হয়েছে।

ওয়ালান্ডার আর তার দলের বাকিরা এসব থেকে গা বাঁচিয়ে চলল তদন্তের স্বার্থে। থমকে পড়া তদন্ত ছাড়া বলতে গেলে কোন কথাই হয় না তাদের মাঝে। তবে ওয়ালান্ডার ঠিক বুঝতে পারছে যে ওর মতোই আরও অনেকে আবির্ভূত হওয়া নতুন সমাজ নিয়ে সংশয়ে ভুগছে।

সবাই যেন হারিয়ে ফেলা এক স্বর্গ নিয়ে মাতম করছি, ভাবল সে। ফিরে চাইছি ওসব চোর-ডাকাতদের, গ্রেফতার হওয়ার সময়েও যারা ভদ্র আচরণ করত। কিন্তু সেইসব দিন আর নেই। তাছাড়া যেভাবে ভাবছি, আসলেই কি ওই দিনগুলো এতটা স্বস্তির ছিল?

তারপর এল শুক্রবার, ১৯ জানুয়ারি। এতদিনে না ঘটা সব যেন ওই একদিনে ঘটার অপেক্ষাতেই ছিল।

ওয়ালান্ডারের জন্য দিনটা শুরু হলো মন্দভাবে। সকাল সাড়ে সাতটার দিকে সে আবিষ্কার করল, তার গাড়িটা রাস্তায় চলাচলের অযোগ্য বললেই চলে। ইন্সপেকশন রিপোর্ট বলছে, মেরামত করতে প্রায় এক হাজার ক্রোনার লাগবে। পাত্তা না দিয়ে গাড়িটা নিয়ে স্টেশনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল সে।

ওভারকোট খুলে উঠতে পারেনি, তার আগেই ঝড়ের বেগে মার্টিনসন এসে ঢুকল তার অফিসে।

"ইয়োহানেস লভগ্রেন কী করে ইস্তায় গিয়েছিল আর ফিরে এসেছিল জেনে ফেলেছি আমি," বলল সে।

উত্তেজনায় নিজের গাড়িটার কথা ভুলে গেল ওয়ালান্ডার।

"কোন উদ্ভট গালিচা না, চিমনি সুইপার নিয়ে গিয়েছিল তাকে," বলল মার্টিনসন।

চেয়ারে বসে পড়ল ওয়ালান্ডার। "চিমনি সুইপার?"

"স্লিমিঞ্জের চিমনি সুইপার আর্থার লুন্ডিন। হঠাৎ করেই হ্যানা নিসট্রমের মনে পড়ল, জানুয়ারির চার তারিখে চিমনি পরিষ্কার করতে এসেছিল লোকটা। দুটো বাড়ির চিমনি পরিষ্কার করে সে। তারপর চলে যায়। হ্যানা নিসট্রম জানিয়েছেন, নিসট্রমদের পরে লভগ্রেনদের চিমনি পরিষ্কার করা হয়েছিল সেদিন। তারপর সকাল সাড়ে দশটার দিকে চলে যায় লোকটা। লুন্ডিনের সাথে দেখা করতে যাই আমি। রিডসগোডের হাসপাতালের চিমনি পরিষ্কার করছিল সে তখন। তার সাথে কথা বলে জানতে পারলাম, সে টিভিও দেখে না, পত্রিকাও পড়ে না। চিমনি পরিষ্কার করার পর বাকি সময়টা কাটায় অ্যাকভাভিট গিলে আর পোষা খরগোশগুলোর দেখাশোনা করে। লভগ্রেনরা যে খুন হয়েছে, এটা তার জানা ছিল না। যাই হোক, তার থেকেই জানতে পারলাম যে সেদিন ইয়োহানেস লভগ্রেনকে ইস্তায় পৌছে দিয়েছিল সে। লুন্ডিনের ভ্যানের জানালা বিহীন পেছনের সিটে বসেছিল লভগ্রেন। একারণে কেউ তাকে দেখতে পায়নি।"

"কিন্তু ভ্যানটাকে ফিরে আসতে দেখল না কেন নিসট্রমরা?"

"কারণ ভ্যানটা লভগ্রেনদের বাড়ি পর্যন্ত ফিরে যায়নি," জয়ীর হাসি ফুটল মার্টিনসনের মুখে। "আর যাওয়ার দরকার নেই বলে ভেবেরডসভ্যাগেনে নেমে পড়েছিল লভগ্রেন। সেখান থেকে সহজেই একটা কাঁচা রাস্তা ধরে লভগ্রেনদের বাড়ির পেছনে পর্যন্ত পৌছানো যায়। মাত্র এক কিলোমিটারের মতো দূরত্ব। নিসট্রমদের কেউ যদিওবা জানালা দিয়ে দেখতে পেতেন, তাহলে ভাবতেন যে আস্তাবল থেকে ফিরে এসেছে লভগ্রেন।"

কুঁচকে আছে ওয়ালান্ডারের ভুরু। "তাও, কেমন যেন মিলছে না।"

"কোন কথাই গোপন করেনি লুন্ডিন। লুনাপে পৌছে দেয়ার বিনিময়ে এক বোতল ভদকা দিবে বলেছিল লভগ্রেন। তাকে ইস্তায় রেখে শহরের উত্তর দিকের কয়েকটা বাড়ির চিমনি পরিষ্কার করতে যায় লুন্ডিন। তারপর আগে থেকে বলে দেয়া সময়ে ফিরে এসে তুলে নেয় লভগ্রেনকে। লভগ্রেন নেমে পড়ে ভেবেরডসভ্যাগেনে। আর লুন্ডিন পেয়ে যায় এক বোতল ভদকা। কাহিনি খতম।"

"সময় মিলিয়ে দেখেছ?" জিজ্ঞেস করল ওয়ালান্ডার।

"দেখেছি। ব্যাংকের সময়ের সাথে মিলে যায়।"

"ব্রিফকেসের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছ তাকে?"

"হ্যাঁ, লভগ্রেনের হাতে একটা ব্রিফকেস দেখেছিল সে।"

"আর কিছু ছিল?"

"লুন্ডিন বলেছে, ছিল না।"

"ইস্তায় লভগ্রেনকে কারও সাথে দেখা করতে দেখেছে সে?"

"না।"

"শহরে কেন যাচ্ছে এই ব্যাপারে কিছু বলেছিলেন লভগ্রেন?"

"না।"

"তোমার কী মনে হয়, এই চিমনি সুইপার কি বুঝতে পেরেছিল যে লভগ্রেনের ব্রিফকেসে সাতাশ হাজার ক্রোনার ছিল?"

"মনে হয় না। তাকে দেখে ডাকাত মনে হয়নি আমার। সাদাসিধে, নির্ভেজাল মানুষ।"

পরবর্তী প্রশ্ন করার আগে একটু ভেবে নিল ওয়ালান্ডার। "আচ্ছা, লভগ্রেনের কি ওই কাঁচা রাস্তায় কারও সাথে দেখা হয়েছিল? নাহলে ব্রিফকেসটা গেল কোথায়?"

"হয়ত। আমি ভাবছি ডগ স্কোয়াড দিয়ে খোঁজ করাবো।"

"তাই কর," বলল ওয়ালান্ডার। "অবশেষে এই কেসটার একটা কিনারা হতে যাচ্ছে হয়ত।"

অফিসে ছেড়ে বেরিয়ে গেল মার্টিনসন। যাওয়ার পথে আরেকটু হলেই ধাক্কা খেত হ্যানসনের সাথে।

"ব্যস্ত?" জিজ্ঞেস করল হ্যানসন।।

মাথা দুলিয়ে ভেতরে আসতে বলল ওয়ালান্ডার। "কেমন চলছে জিজ্ঞাসাবাদ?"

"মুখ খুলছে না বার্গম্যান। তবে অপরাধের সাথে তার সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া গেছে। তার রিমান্ডের জন্য আজকে আবেদন করবে ওই ব্রোলিন শালী।"

অ্যানেট ব্রোলিন সম্পর্কে হ্যানসনের মন্তব্য নিয়ে কিছু বলতে ইচ্ছা হলো না ওয়ালান্ডারের।

"আর কিছু বলবে?" জিজ্ঞেস করল সে।

জানালার পাশের চেয়ারে বসল হ্যানসন।

"তুমি তো জানোই ঘোড়দৌড়ে বাজি রাখি আমি," শুরু করল সে। "আচ্ছা, যে ঘোড়াটার কথা তুমি বলেছিলে, ওটা গোহারা হেরেছে। কে বলেছিল তোমাকে ওটা জিতবে?"

প্রথমে বুঝতে পারল না ওয়ালান্ডার। পরে মনে পড়ল তার। "ওটা আমি মজা করে বলেছিলাম। যাই হোক, এরপর বল।"

"জ্যাগেসরোতে এরিক ম্যাগনোসন নামের একটা ছেলে আসে প্রায়ই। বড় অঙ্কের টাকা বাজি ধরে আর হারে। কাউন্টি কাউন্সিলে কাজ করে সে।"

মুহূর্তেই কান খাড়া ফেলল ওয়ালান্ডার। "আনুমানিক কত হবে তার বয়স? দেখতে কেমন?"

বর্ণনা করল হ্যানসন। এই এরিক ম্যাগনোসন আর মালমোর এরিক ম্যাগনোসন যে একই ব্যক্তি, বুঝতে বাকি রইল না ওয়ালান্ডারের।

"শুনেছি, ছেলেটা নাকি অনেক দেনায় ডুবে আছে," বলল হ্যানসন। "আর জুয়ার দেনার ভয়াবহতা সম্পর্কে তো জানোই।"

"চমৎকার," বলল ওয়ালান্ডার। "এরকম কিছুই তো খুঁজছিলাম আমরা।"

উঠে দাঁড়াল হ্যানসন। "জুয়া আর মদ মানুষকে লাগামহীন করে তুলতে পারে। অবশ্য আমার মতো শুধু মজার জন্য জুয়া খেললে আলাদা কথা।"

রিডবার্গের বলা একটা কথা মনে পড়ে গেল ওয়ালান্ডারের। মাদকাসক্তি মানুষকে কল্পনার অতীত নৃশংসতায় জড়াতে পারে।

"ধন্যবাদ," হ্যানসনকে বলল সে। "অনেক বড় উপকার করেছ।"

অফিসে ছেড়ে বেরিয়ে গেল হ্যানসন। গোরান বোম্যানকে ফোন দিল ওয়ালান্ডার। ভাগ্য ভালো যে অফিসেই ছিল বোম্যান।

"কী করতে চাও তাহলে?" হ্যানসনের বিবরণী শোনার পর বলল সে।

"ম্যাগনোসনের অতীত ঘাঁটতে হবে," বলল ওয়ালান্ডার। "নজর রাখতে হবে তার ওপর।"

এলেন ম্যাগনোসনের পেছনে পুলিশ লাগানোর কথা দিল বোম্যান।

স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল হ্যানসন। ওয়ালান্ডার গিয়ে আটকালো।

"কার কাছে দেনা থাকতে পারে ম্যাগনোসনের?"

বলার জন্য যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল হ্যানসন। "টুগার্পের এক লোক ধার দিয়ে থাকে। ওই লোকের কাছ থেকে নেবার সম্ভাবনাই বেশি। চড়া সুদে ধার দেয় লোকটা। কয়েকটা পোষা গুণ্ডাপাণ্ডাও আছে। ধার ফেরত দিতে দেরি করলে গুন্ডা লেলিয়ে দেয়।"

"কোথায় পাওয়া যাবে লোকটাকে?"

"টুগার্পে একটা হার্ডওয়্যারের দোকান আছে তার। দেখতে ছোটখাটো, মোটাসোটা। বয়স ষাটের ওপরে হবে।"

"নাম কী তার?"

"লার্সন। তবে লোকে ডাকে জাঙ্কম্যান বলে।"

অফিসে ফিরে গেল ওয়ালান্ডার। রিডবার্গকে খুঁজল। কিন্তু পেল না। এবা জানালো হাসপাতালে গেছে রিডবার্গ। দশটার আগে ফিরবে না।

"সে কি অসুস্থ?" জিজ্ঞেস করল ওয়ালান্ডার।

"রুম্যাটিজমের সমস্যাটা ভোগাচ্ছে বোধহয়," বলল এবা। "পুরো শীতকাল কিভাবে খোঁড়ালো দেখনি?"

রিডবার্গের জন্য অপেক্ষা না করার সিদ্ধান্ত নিল ওয়ালান্ডার। গায়ে কোট চাপিয়ে গাড়ি চালাল টুগার্পের উদ্দেশ্যে।

হার্ডওয়্যারের দোকানটা শহরের একেবারে মধ্যখানে। হুইলব্যারো বিক্রির বিজ্ঞাপন ঝুলছে সামনে। ওয়ালান্ডার ভেতরে ঢুকলে টুং করে ঘন্টা বেজে উঠল। পেছন দিককার কামরা থেকে যে লোকটা বেরিয়ে এল, সে বাস্তবিকই আকারে ছোটখাটো ও মোটা। দোকানে ওয়ালান্ডার ছাড়া আর কেউ নেই। সরাসরি কাজে কথায় আসার সিদ্ধান্ত নিল সে। বের করে আনল পরিচয়পত্র। ভালো করে পরিচয়পত্র পড়ে দেখল জাঙ্কম্যান। তবে কোন ভাবান্তর দেখা গেল না তার মাঝে।

"ইস্তার পুলিশ হঠাৎ আমার কাছে?" বলল সে।

"এরিক ম্যাগনোসন নামের কাউকে চেনেন?"

সরাসরি উত্তর দিল না লোকটা। "চিনতে পারি। কেন?"

"আপনাদের পরিচয় কিভাবে?"

ভুল করে ফেলেছি, ভাবল ওয়ালান্ডার। অস্বীকার করতে পারে লোকটা এখন।

"মনে নেই।"

"কিন্তু তাকে চেনেন তো?"

"কিছু বিষয়ে আমাদের দুজনেরই আগ্রহ রয়েছে।"

"যেমন ঘোড়ার ওপর বাজি রাখা?"

"হয়ত।"

লোকটার মাত্রাতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস দেখে রেগে যেতে লাগল ওয়ালান্ডার।

"শুনুন," বলল সে। "আমি জানি যে জুয়াড়িদের টাকা ধার দিয়ে বেড়ান আপনি। তবে এখন ধারের ওপর আপনার সুদের হার নিয়ে তদন্ত করতে আসিনি। আপনার অবৈধ ব্যবসা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই এই মুহূর্তে। আমি যা জানতে এসেছি তা সম্পূর্ণ আলাদা।"

কৌতূহলী চোখে তাকাল জাঙ্কম্যান।

"আমি জানতে চাই এরিক ম্যাগনোসনের কাছ থেকে আপনি কত ক্রোনার পান," বলল ওয়ালান্ডার।

"এক ক্রোনাও পাই না।"

"আপনি নিশ্চিত?"

"হ্যাঁ।"

হতাশ হলো ওয়ালান্ডার। হ্যানসনের দেয়া খবর কোন কাজে লাগল না।

"তবে আগে পেতাম," বলল লোকটা।

"কত?"

"অনেক। তবে পুরো পঁচিশ হাজার ক্রোনারই পরিশোধ করে দিয়েছেন তিনি।"

"কবে?"

দিন গোণার ভঙ্গি করল লোকটা। "এক সপ্তাহের কিছু আগে মনে হয়। গত বৃহস্পতিবারের আগের বৃহস্পতিবারে।"

তারমানে ১১ জানুয়ারি, ভাবল ওয়ালান্ডার। অবশেষে সঠিক পথের নিশানা পাওয়া গেছে।

"কিভাবে পরিশোধ করেছিলেন তিনি?"

"নগদ দিয়ে গিয়েছিলেন।"

"আমি নোটের কথা বলছি।"

"পাঁচশোটা এক হাজার ক্রোনারের নোট।"

"কিসে করে এনেছিল নোটগুলো?"

"মানে?"

"ব্যাগে? নাকি ব্রিফকেসে?"

"একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে।"

"উনি কি সময় মতো পরিশোধ করতে পেরেছিলেন? নাকি দেরি করেছেন?"

"কিছুটা দেরি করেছিলেন।"

"যদি পরিশোধ করতে না পারতেন, তাহলে কী হত তার?"

"মনে করিয়ে দিতাম।"

"এই বিশাল অঙ্কের অর্থ উনি কিভাবে জোগাড় করেছিলেন, জানেন?"

শ্রাগ করল জাঙ্কম্যান। এমন সময় আরেকজন কাস্টমার ঢুকল দোকানে।

"সেটা আমার দেখার বিষয় না," বলল জাঙ্কম্যান। "আর কিছু?"

"আপাতত না, ধন্যবাদ। তবে আবারও আপনার সাথে যোগাযোগ করা হতে পারে।"

গাড়িতে ফিরে এল ওয়ালান্ডার। বাতাসের গতি বেড়েছে আগের চেয়ে। এবার পেয়েছি বাছাধনকে, ভাবল সে। কে ভেবেছিল হ্যানসনের জুয়া খেলা একদিন উপকারে আসবে?

খুশি মনে ইস্তায় ফিরে এল সে। অবশেষে সমাধান হতে যাচ্ছে লুনাপের জোড়াখুনের।

এরিক ম্যাগনোসন, মনে মনে বলল ওয়ালান্ডার। আমরা আসছি।

চৌদ্দ

শুক্রবার গভীর রাত পর্যন্ত চলল প্রস্তুতি। কেস মিটিং এ পুরো সময়টা ছিল বিয়র্ক। ওয়ালান্ডারের অনুরোধে হ্যানসনকে হ্যাজহোমের কেসটা আপাতত সরিয়ে রেখে লুনাপের কেসটায় যোগ দেয়ার অনুমতি দিয়েছে সে। আবারও অসুস্থ হয়ে পড়েছে নাসলুন্ড। তবে আগামীকাল যোগ দিবে বলে কথা দিয়েছে।

সাপ্তাহিক ছুটি হওয়া সত্ত্বেও প্রাণপণে খাটতে হয়েছে ওদের। ভেবেরফডসভ্যাগেন থেকে লভগ্রেনদের আস্তাবল পর্যন্ত চলে যাওয়া কাঁচা রাস্তাটায় ডগ পেট্রল দিয়ে তল্লাশি চালিয়েছে মার্টিনসন। একটা তৃণভূমি জমিকে দুভাগ করে শুকনো এক জলাভূমির পাশ দিয়ে চলে গেছে দুই কিলোমিটার লম্বা রাস্তাটা। কিছু পাওয়া না গেলেও প্লাস্টিকের ব্যাগে করে কিছু হাবিজাবি জিনিস নিয়ে এসেছে মার্টিনসন। এসবের মধ্যে আছে একটা খেলনা গাড়ির চাকা, নোংরা প্লাস্টিকের টুকর আর বিদেশি ব্রান্ডের একটা খালি সিগারেটের প্যাকেট। যদিও জানে যে কিছুই পাওয়া যাবে না এসব থেকে, তবুও পরীক্ষা করে দেখার আদেশ দিয়েছে ওয়ালান্ডার।

মিটিং এ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে সিদ্ধান্তটা নেয়া হলো তা হলো, চব্বিশ ঘন্টা নজর রাখা হবে ম্যাগনোসনের ওপর। পুরনো রোজেনগোড জেলায় ভাড়া নিয়ে থাকে সে। হ্যানসন জানিয়েছে, রোববার জ্যাগেসরোতে ঘোড়দৌড় আছে। ওই সময়টাতে নজর রাখার ভার তার ওপর দেয়া হয়েছে।

"তবে কোন বাজি লাগার অনুমতি আমি দিচ্ছি না," মজা করার ভঙ্গিতে বলল বিয়র্ক।

"তারচেয়ে আমরা সবাই যাই," বলল হ্যানসন। "এই খুনের তদন্তের কারণে হয়ত ভাগ্য খুলে যেতেও পারে।"

কিন্তু হাসল না কেউ। গম্ভীর একটা ভাব বিরাজ করছে বিয়র্কের অফিসে। শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে আসার চাপা উত্তেজনা সবার মনে।

ম্যাগনোসনকে যে পুলিশ সন্দেহ করছে, এটা তাকে জানানো উচিত কিনা এই নিয়ে আলোচনা চলল দীর্ঘ একটা সময়। রিডবার্গ আর বিয়র্ক জানানোর পক্ষে না। তবে ওয়ালান্ডারের মতে, ম্যাগনোসন জানলেও কোন সমস্যা হবে না। লুকাছাপার কোন দরকার নেই। তবে নজরদারিতে কোন রকম ফাঁক রাখা যাবে না।

"যখন সে জানবে যে তার ওপর নজর রাখা হচ্ছে, নার্ভাস হয়ে পড়বে," বলল ওয়ালান্ডার। "আর নার্ভাস হলে উল্টোপাল্টা কিছু করে বসতে পারে। সেই সুযোগটাই নিব আমরা।"

এ পর্যন্ত পাওয়া যাবতীয় সূত্র-প্রমাণ বিশ্লেষণ করে দেখল ওরা। কিন্তু তিন ঘন্টা ধরে চেষ্টা করেও এমন কিছু পেল না, যা ম্যাগনোসনের দিকে ইঙ্গিত করে। অবশ্য তার স্ত্রীর অ্যালিবাই বাদ দিলে এমন কিছু পাওয়া গেল না যা লুনাপের জোড়াখুনের ঘটনায় তার জড়িত থাকার সম্ভাবনা নাকচ করে দেয়।

ভুল পথে এগোচ্ছে ভেবে ক্ষণে ক্ষণে অস্বস্তি হতে লাগল ওয়ালান্ডারের। তবে দ্বিধা প্রকাশ করল রিডবার্গ। এরকম জোড়া খুন একজনের পক্ষে করা সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না তার।

"খুনের ধরণ দেখে আমার হয়েছে এর পেছনে একাধিকের হাত আছে," বলল সে।

"থাকতেই পারে," বলল ওয়ালান্ডার। "ম্যাগনোসনের সহযোগী ছিল এই সম্ভাবনা তো বাদ দেয়া হচ্ছে না।"

"কিন্তু সে যদি জুয়ার দেনা মেটাতেই খুন করবে, তাহলে তার কোন সহযোগী থাকার কথা না," বলল রিডবার্গ।

"বুঝতে পারছি তোমার সন্দেহ," বলল ওয়ালান্ডার। "আশা করি ম্যাগনোসনের মুখ থেকেই জানা যাবে তা।"

কাউন্টি কাউন্সিলের আর্কাইভ থেকে ম্যাগনোসনের একটা ছবি খুঁজে বের করেছে মার্টিনসন। কাউন্টি কাউন্সিলের কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে প্রকাশ করা একটা প্রচারপত্র থেকে নেয়া হয়েছে ছবিটা। বিয়র্কের বেশ পছন্দ হয়েছে প্রচারপত্রটা। তার মতে, সকল জাতীয় আর মিউনিসিপাল সরকারের উচিত জনগণের কাছে নিজেদের সংস্থার গুরুত্ব তুলে ধরতে জনসংযোগ বিভাগ খোলা। যাই হোক, ছবিতে সাদা রঙের ওভারঅল পরা সহাস্যমুখ ম্যাগনোসনকে দেখা যাচ্ছে একটা হলুদ রঙের ফর্ক-লিফট ট্রাকের পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

ইয়োহানেস লভগ্রেনের কিছু সাদা-কালো ছবির সাথে পুলিশ অফিসারেরা ম্যাগনোসনের চেহারা মিলিয়ে দেখল। একটা ছবিতে লভগ্রেন দাঁড়িয়ে আছে একটা ট্রাক্টরের পাশে।

একজন ট্রাক্টর চালক, আরেকজন ফর্ক-লিফট অপারেটর। আদৌ কি পিতা-পুত্রের সম্পর্ক আছে তাদের মাঝে? বেশিক্ষণ ছবি দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকতে পারল না ওয়ালান্ডার। বারবার নাক কাটা এক বৃদ্ধের রক্তাক্ত মুখ ভেসে উঠছে তার সামনে।

রাত এগারোটার ভেতর সব ধরণের পরিকল্পনা করা হয়ে গেল। স্থানীয় কান্ট্রি ক্লাবের আছজিত ডিনারে যোগ দেয়ার জন্য বিদায় নিল বিয়র্ক।

শনিবার এলেন ম্যাগনোসনের সাথে দেখা করতে যাবে ওয়ালান্ডার আর রিডবার্গ। মার্টিনসন, নাসলুন্ড আর হ্যানসন পালাক্রমে নজর রাখবে এরিক ম্যাগনোসনের ওপর। আর তার বাগদত্তার অ্যালিবাই যাচাই করে দেখবে। রোববার কাটবে নজরদারির মাধ্যমে আর তদন্তের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করে। আগ্রহ না থাকা সত্ত্বেও কম্পিউটার বিশেষজ্ঞের দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে মার্টিনসনকে। সোমবার এরিক ম্যাগনোসনের সকল রেকর্ড যাচাই করে দেখার ভার চাপানো হয়েছে তার ওপর। জানতে হবে বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর। অন্য কোথাও দিইা আছে ম্যাগনোসনের? পূর্বে কখনও অপরাধে জড়িয়েছিল?

এখনও পর্যন্ত পাওয়া তথ্যসূত্র খুঁটিয়ে দেখার দায়িত্ব চাপল রিডবার্গের ওপর। আপাত দৃষ্টিতে কোন সম্পর্ক না থাকা ঘটনাবলী আর ব্যক্তিদের এক সুতোয় গাঁথার চেষ্টা করবে সে। খুঁজে বের করবে কোন কিছু চোখ এড়িয়ে গেছে কিনা।

একসাথে স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে এল রিডবার্গ আর ওয়ালান্ডার। সহসাই রিডবার্গের অসুস্থতার কথা মনে পড়ল ওয়ালান্ডারের।

"কী অবস্থা তোমার?" জিজ্ঞেস করল সে।

কাঁধ ঝাঁকাল রিডবার্গ। বিড়বিড় করে বলল কিছু একটা।

"তোমার পায়ের কথা জিজ্ঞেস করছি," বলল ওয়ালান্ডার।

"আগের মতোই," এর বেশি কিছু বলল না রিডবার্গ। বুঝিয়ে দিল এ বিষয়ে কথা বলার ইচ্ছা নেই।

বাসায় ফিরে গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে নিল ওয়ালান্ডার। কিন্তু না পান করেই বেডরুমে গিয়ে শুয়ে পড়ল খাটে। মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকা সব চিন্তা ভুলে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল নিমিষেই।

রাতে স্টেন ওয়াইডেনকে স্বপ্নে দেখল সে। একসাথে অপেরা শুনতে গিয়েছে ওরা। গিয়ে দেখে বিদেশি ভাষায় গাইছে শিল্পীরা। ঘুম ভাঙার পর অপেরাটা মনে করতে পারল না ওয়ালান্ডার।

তবে ইয়োহানেস লভগ্রেনের হারিয়ে যাওয়া উইলের কথা মনে পড়ে গেল। রিডবার্গ গিয়েছিল স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের কাছে। তিনি জানিয়েছেন, লভগ্রেন কোন উইল রেখে যাননি। অর্থাৎ লভগ্রেনের সকল সম্পত্তির মালিক হবে তার দুই মেয়ে।

এরিক ম্যাগনোসন কি জানতে পেরেছিল লভগ্রেনের বিশাল সম্পদের কথা? নাকি সবার থেকেই সত্যটা আড়ালে রেখেছিলেন লভগ্রেন?

খাট থেকে নেমে পড়ল ওয়ালান্ডার। দ্রুত নাস্তা সেরে চলে এল স্টেশনে। রিডবার্গের সাথে দেখা হলো নয়টার দিকে। এরপর দেখা হলো মার্টিনসনের সাথে। সারা রাত গাড়িতে বসে রোজেনগোডে ম্যাগনোসনের বাড়ির ওপর নজর রেখেছে সে। কিছুই ঘটেনি রাতে। ফ্ল্যাটেই ছিল ম্যাগনোসন। মার্টিনসনকে উদ্ধার করে তার জায়গা নিল নাসলুন্ড।

কৃষানইস্তার উদ্দেশ্যে রওনা হলো রিডবার্গ আর ওয়ালান্ডার। পুরো রাস্তায় কোন কথা বলল না রিডবার্গ। চুপচাপ বসে রইল সামনের সিটে ওয়ালান্ডারের পাশে। আবছা কুয়াশা পড়েছে আজ। ঠান্ডায় জমে যাওয়া শিশিরে চিকচিক করছে রাস্তার পাশের মাঠ।

সাড়ে দশটার দিকে স্টেশনে বোম্যানের সাথে দেখা করল ওরা। পড়ে দেখল বোম্যানের নেওয়া এলেন ম্যাগনোসনের জবানবন্দির অনুলিখন।

"চুলচেরা অনুসন্ধান চালানো হয়েছে মহিলার ওপর," জানালো বোম্যান। "সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায়নি। মহিলা তার সম্পর্কে যা যা বলেছে, মিলিয়ে দেখা হয়েছে সব। কোন খুঁত নেই। ত্রিশ বছর ধরে একই ফার্মেসীতে কাজ করছেন। মাঝে একবার একটা সংগীত দলে ঢুকেছিলেন অবশ্য। কিন্তু বেশিদিন থাকেননি। লাইব্রেরি থেকে অনেক বই ধার করেন। ছুটির দিন কাটান ভেমেনহগে এক বোনের সাথে। কখনও বিদেশ যাননি। নতুন কাপড় কেনেন না। আপাত দৃষ্টিতে খুবই সাদামাটা জীবন যাপন করেন তিনি। রুটিনের বাইরে যান না কখনও। এভাবে কেউ বেঁচে থাকতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস হত না।

সহায়তা করার জন্য ধন্যবাদ জানালো ওয়ালান্ডার। "এবার আমাদের কাজে নামতে হবে," বলল সে।

তারপর রওনা হলো এলেন ম্যাগনোসনের ফ্ল্যাটের উদ্দেশ্যে।

মহিলাকে দেখে প্রথমেই ওয়ালান্ডারের মনে হলো, এরিক ম্যাগনোসন দেখতে তার মায়ের মতো হয়েছে। তবে মহিলার চেহারা দেখে মনের ভাব বোঝা গেল না। চোখ দেখে মনে হচ্ছে, অন্য কোথাও পড়ে আছে তার মন।

লিভিং রুমের ওপর চোখ বুলালো ওয়ালান্ডার। কফি দিবে কিনা জানতে চাইলেন মহিলা। রিডবার্গ না করে দিলেও হ্যাঁ বলল ওয়ালান্ডার।

প্রতিবার যখন কারও বাসায় যায়, ওয়ালান্ডারের মনে হয় সদ্য কেনা বইয়ের প্রচ্ছদ দেখছে। আসবাবপত্র, দেয়ালে ঝুলানো ছবি আর ছড়িয়ে থাকা গন্ধ হলো বইয়ের নাম। এখন তাকে পড়া শুরু করতে হবে। কিন্তু এলেন ম্যাগনোসনের ফ্ল্যাটে কোন গন্ধ নেই। যেন কেউ থাকে না এখানে। বাতাসে হতাশার আহাজারি। ফ্যাকাসে দেয়ালে ঝুলে আছে কয়েকটা অ্যাবস্ট্রাক্ট ছবি।

আসবাবপত্র গুলো পুরনো দিনের। মেহগনি কাঠের টেবিলে বিছানো নকশা করা ম্যাট। একটা ছোট তাকের ওপর একটা শিশুর ছবি। ওয়ালান্ডার খেয়াল করল, এরিক ম্যাগনোসনের একটা ছবিই আছে ডিসপ্লেতে। তাও আবার তার ছোটবেলার। পরিণত এরিক ম্যাগনোসনের যেন স্থান নেই এখানে।

লিভিং রুমের পাশে ছোট ডাইনিং রুম। অর্ধ-খোলা দরজাটা পা দিয়ে আস্তে ধাক্কা দিল ওয়ালান্ডার। তার বাবার আঁকা একটা ছবি দেখতে পেল দেয়ালে। এই ছবিটাতে গ্রাউস পাখি নেই। অবাক চোখে তাকিয়ে রইল সে, যেন প্রথমবার দেখছে এরকম ছবি। পেছনে কাপের টুংটাং আওয়াজ শুনে ঘোর ভাঙল তার।

জানালার পাশের একটা চেয়ারে গিয়ে বসেছে রিডবার্গ। সবসময় কেন জানালার পাশে বসে সে, একদিন জিজ্ঞেস করবে বলে ঠিক করল ওয়ালান্ডার।

আমাদের অভ্যাসগুলো কিভাবে জন্মায়? প্রশ্ন জাগল তার মনে। ভালো বা খারাপ, স্বভাবগুলো কোন কারখানা থেকে আসে?

কাপে কফি ঢালছেন এলেন ম্যাগনোসন। কাজের কথায় আসার সিদ্ধান্ত নিল ওয়ালান্ডার।

"কৃষানইস্তা স্টেশন থেকে গোরান বোম্যান নামের একজন পুলিশ অফিসার এসেছিল আপনার কাছে," বলল সে। "কয়েকটা প্রশ্ন করেছিল আপনাকে। আমরাও হয়ত একই প্রশ্নগুলো করব। আশা করি কিছু মনে করবেন না।"

"একই উত্তর পেলে আশা করি আপনারাও কিছু মনে করবেন না।"

মুহূর্তেই ওয়ালান্ডার বুঝে গেল, তার সামনে বসে থাকা মহিলাই হলো লভগ্রেনের অবৈধ সন্তানের মাতা। কিভাবে বুঝল, নিজেও জানে না।

সত্যটা বের করতে মিথ্যার আশ্রয় নেয়ার সিদ্ধান্ত নিল সে। যদি তার অনুমান ভুল না হয়ে থাকে, পুলিশের কাজকর্মের সাথে খুব একটা পরিচয় নেই এলেন ম্যাগনোসনের। মিথ্যা বলার জন্য প্রস্তুত হয়েই আছেন তিনি। কিন্তু ঘূর্ণাক্ষরেও ভাবতে পারবেন না যে পুলিশও মিথ্যা বলতে পারে।

"মিসেস ম্যাগনোসন," বলল ওয়ালান্ডার। "আমরা জেনে গিয়েছি যে ইয়োহানেস লভগ্রেনই আপনার পুত্র এরিকের পিতা। অস্বীকার করে এখন আর লাভ হবে না।"

মুহূর্তেই অন্যমনস্ক ভাবটুকু চলে গেল মহিলার চোখ থেকে। তার বদলে ভর করল ভয়।

"ভুল করছেন আপনি," বললেন তিনি।

দমল না ওয়ালান্ডার। শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতেই হবে এলেন ম্যাগনোসনকে।

"আমি কোন ভুল করছি না," বলল সে। "আমরা দুজনেই জানি সত্য এটাই। যদি ইয়োহানেস লভগ্রেন খুন না হতেন, তাহলে আপনাকে এই পরিস্থিতিতে পড়তে হত না। কিন্তু সত্যটা এখন বেরিয়ে আসা জরুরি। আর আপনি যদি এখানে স্বীকার না করেন, তাহলে হয়ত আদালতে জনসম্মুখে স্বীকার করতে বাধ্য হবেন।"

ওয়ালান্ডার যতটা ভেবেছিল, তার চেয়ে সহজে কাজ হয়ে গেল। ভেঙ্গে পড়লেন এলেন ম্যাগনোসন।

"কেন জানতে চাইছেন আপনারা?" বললেন ফোঁপাতে ফোঁপাতে। আমি তো কিছু করিনি। তবে কেন আমার গোপন বিষয় নিয়ে ঘাটাঘাটি করছেন? একজন মানুষের ব্যক্তিগত বলে কি কিছু থাকতে পারে না?"

"অবশ্যই পারে," সমবেদনার সুরে বলল ওয়ালান্ডার। "কিন্তু যখন একজন মানুষ খুন হয়, তার খুনিদের খুঁজে বের করতে প্রশ্ন করতেই হয় আমাদের।"

চুপচাপ বসে আছে রিডবার্গ। ক্লান্ত দৃষ্টিতে দেখছে মহিলাকে। অবশেষে এলেন ম্যাগনোসন রাজি হলো তার গল্প শোনাতে।

ইঙনিফোর এক কৃষক পরিবারে জন্ম এলেন ম্যাগনোসনের। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করার কোন ইচ্ছা তার ছিল না। একারণে কেমিস্ট হিসেবে যোগ দিই একটা ফার্মেসিতে। ইয়োহানেস লভগ্রেনের সাথে প্রথম দেখা ওই ফার্মেসিতেই। সোডিয়াম বাইকার্বনেট কিনতে এসেছিলেন। এরপর প্রায়ই আসতে থাকে।

নিজেকে একজন নিঃসঙ্গ কৃষক হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলেন লভগ্রেন। এলেন ম্যাগনোসন তখন সন্দেহ করেনি। পরে সন্তান হবার পর জানতে পারেন যে লভগ্রেন বিবাহিত। কষ্ট পেলেও নিজেকে সামলে নিয়েছিলেন তিনি। তার মুখ বন্ধ রাখতে বছরে কয়েক ধাপে ক্রোনার দিয়ে যেতেন লভগ্রেন। কিন্তু সন্তানকে একাই বড় করেছেন এলেন ম্যাগনোসন। এরিক শুধু তারই সন্তান।

"লভগ্রেনের খুন হওয়ার সংবাদ শোনার পর আপনার কী মনে হয়েছিল?" মহিলা চুপ হয়ে গেলে জানতে চাইল ওয়ালান্ডার।

"আমি খোদায় বিশ্বাস করি," বললেন এলেন ম্যাগনোসন। "বিশ্বাস করি সবাইকে তার প্রাপ্য শাস্তি ভোগ করতে হবে।"

"শাস্তি?"

"শাস্তি নয় তো কী?" বললেন মহিলা। "কতজন মানুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এই লোক? আমাকে ঠকিয়েছে, আমার সন্তানকে ঠকিয়েছে। বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার স্ত্রী, কন্যাদের সাথে। এত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না?"

শীঘ্রই জানতে পারবেন যে খোদা নয়, আপনার সন্তানই এই তথাকথিত শাস্তি নাজিল করেছে, মনে মনে বলল ওয়ালান্ডার। যখন জানতে পারবেন যে আপনার সন্তান একজন খুনি, সইতে পারবেন কি?

একের পর এক প্রশ্ন করে চলল সে। রিডবার্গ কোন কথাই বলল না। চেয়ারে নড়েচড়ে বসল শুধু। যখন ওরা এলেন ম্যাগনোসনের বাসা থেকে বেরিয়ে এল, ওয়ালান্ডারের মনে হলো, অবশেষে সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছে সে।

তবে একটা প্রশ্নের উত্তর দ্বিধায় ফেলে দিয়েছে তাকে। পাছে জুয়ায় খুইয়ে বসে এই ভয়ে লভগ্রেনের দেয়া অর্থের একটা কানাকড়িও সন্তানকে দিইনি এলেন ম্যাগনোসন। ব্যাংকে সেভিংস অ্যাকাউন্টে জমা রেখেছেন সব। শুধুমাত্র তার মৃত্যুর পরেই ওই সম্পদের মালিক হবে এরিক ম্যাগনোসন। তবে সে জানতো যে ইয়োহানেস লভগ্রেন তার পিতা। মিথ্যা বলেছে পুলিশকে। তবে কি পিতার অঢেল সম্পত্তি সম্পর্কেও জানতো সে?

পুরো সময়টা কিছু না বললেও বেরিয়ে আসার আগে কয়েকটা প্রশ্ন করেছে রিডবার্গ। জানতে চেয়েছে, ছেলের সাথে তার দেখাসাক্ষাৎ হয় কিনা। তাদের মধ্যে কেমন সম্পর্ক। ছেলের হবু স্ত্রী সম্পর্কে জানেন কিনা।

"আমার ছেলে আগের মতো ছোট নেই," বললেন এলেন ম্যাগনোসন। "বড় হয়েছে। তার নিজের জীবন আছে। তবে মাঝে মাঝেই দেখা করতে আসে সে। আর এটা কেমন কথা? আমার ছেলে এনগেজড, আর আমি জানব না?"

এখন আবার মিথ্যা বলছেন মহিলা, ভাবল ওয়ালান্ডার। জানতেন না তিনি।

ডেজেবেরিয়ার একটা সরাইখানায় ঢুকল ওরা। আগের চেয়ে প্রাণবন্ত দেখাচ্ছে রিডবার্গকে।

"তোমার জিজ্ঞাসাবাদ পার্ফেক্ট ছিল," বলল সে। "পুলিশ একাডেমিতে শেখানো উচিত এই পদ্ধতি।"

"তবুও, মিথ্যা বলেছি আমি," বলল ওয়ালান্ডার। "এতে বাহবা দেয়ার কিছু নেই।"

খেতে খেতে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল ওরা। দুজনেই একমত হলো যে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তুলে আনার আগে এরিক ম্যাগনোসনের অতীতের রেকর্ডের জন্য অপেক্ষা করাটাই সমীচীন হবে।

"তাকে কি দোষী মনে হচ্ছে তোমার?" জিজ্ঞেস করল রিডবার্গ।

"অবশ্যই," জবাব দিল ওয়ালান্ডার। "সাথে দোসর ছিল হয়ত। তোমার কী মনে হয়?"

"তোমার কথাই যেন ঠিক হয়।"BG & RH

দুপুর তিনটা পনেরোর দিকে ইস্তা স্টেশনে ফিরে এল ওরা। অফিসে বসে আছে নাসলুন্ড। হাঁচি দিয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত। দুপুর বেলা তার জায়গা নিয়েছে হ্যানসন। "সকাল বেলায় নতুন জুতো কিনতে বেরিয়েছিল এরিক ম্যাগনোসন। তারপর একটা টোবাকো শপে গিয়ে কয়েকটা বেটিং স্লিপ জমা দিয়েছে।

"তাকে কি সতর্ক মনে হয়েছে?" জিজ্ঞেস করল ওয়ালান্ডার।

"বুঝতে পারছি না," বলল নাসলুন্ড। "মাঝে মাঝে মনে হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে সব আমার কল্পনা।"

বাসায় ফিরে গেল রিডবার্গ। ওয়ালান্ডার গিয়ে ঢুকল তার অফিসে। অন্যমনস্ক ভাবে উল্টাতে লাগল ডেস্কের ওপর কারও রেখে যাওয়া কিছু কাগজের পাতা। মনযোগ দিতে পারছে না কিছুতেই। এলেন ম্যাগনোসনের কাহিনি অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে তাকে। মহিলার জীবনের সাথে তার ছন্নছাড়া জীবনের মিল আছে বলে মনে হলো ওর।

এসব শেষ হয়ে গেলে কিছুদিনের জন্য ছুটি নিব, ঠিক করল সে। যে পরিমাণ ওভারটাইম করেছি, অন্তত এক সপ্তাহের ছুটি পাওনা আছে। ওই সাত দিন শুধু আমার জন্য। নিজেকে নতুন রূপে গড়ে নিব সাত দিনে।

একটা হেলথ স্পা সেন্টারে যাওয়ার কথা ভাবল ওর। ওজন কমানোর উপায় বাতলে দিবে ওরা। কিন্তু ভাবনাটা আরও মন খারাপ করে দিল ওর। তারচেয়ে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়বে দক্ষিণে। প্যারিস কিংবা আমস্টারডামের উদ্দেশ্যে। আর্নহেমের একজন পুলিশ অফিসারের সাথে চেনাজানা আছে ওর। একটা নার্কোটিকস সেমিনারে পরিচয় হয়েছিল। তার সাথে দেখা করতে যেতে পারে।

কিন্তু জোড়া খুনের রহস্য সমাধান করতে হবে আগে, নিজেকে মনে করিয়ে দিল ওয়ালান্ডার। তারপর নাহয় সিদ্ধান্ত নেয়া যাব কোথায় ঘুরতে যাব।

জানুয়ারির ২৫ তারিখ, বৃহস্পতিবার। টানটান উত্তেজনা নিয়ে ঘুম ভাঙল ওয়ালান্ডারের। লুনাপের জোড়াখুনের সমাধান ঘটবে আজ।

সকালে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এরিক ম্যাগনোসনকে আনতে যাওয়া হলো। কাজের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিল সে। রিডবার্গ আর হ্যানসন গিয়ে বাসার সামনে থেকে ধরে আনল তাকে। ওয়ালান্ডার গাড়িতেই বসেছিল। জানালা দিয়ে দেখছিল সব। কোন রকম প্রতিবাদ ছাড়াই স্কোয়াড কারে উঠে বসল ম্যাগনোসন। স্টেশনে আসার পর অফিসে ফোন করতে দেয়া হলো তাকে,

যাতে জানিয়ে দিতে পারে যে সে আজ কাজে যাচ্ছে না। জিজ্ঞাসাবাদের সময় বিয়র্ক, ওয়ালান্ডার আর রিডবার্গ উপস্থিত থাকল। প্রশ্ন করার কাজটা ওয়ালান্ডারই করল। বিয়র্ক আর রিডবার্গ থাকল দর্শক হিসেবে।

স্টেশনে নিয়ে আসার আগের দিনগুলোতে পুলিশ আরও নিশ্চিত হয়েছে যে ম্যাগনোসনই খুনি। অনুসন্ধানে জানা গেছে যে গলা পর্যন্ত দিইায় ডুবে আছে সে। এমনকি দিইা পরিশোধ না করায় বেশ কয়েকবার মার খেতে গিয়েও বেঁচে গেছে। আর্থিক অবস্থা বাজে হওয়া সত্ত্বেও জ্যাগেসরোতে তাকে বড় অঙ্কের টাকা বাজি ধরতে দেখেছে হ্যানসন।

গেল বছর এস্লোভে একটা ব্যাংক ডাকাতির ঘটনায় সন্দেহভাজনদের তালিকায় নাম উঠেছিল ম্যাগনোসনের। কিন্তু উপর্যুক্ত প্রমাণের অভাবে ছাড়া পেয়ে যায়। মাদক চোরাচালানে যদি সে জড়িত থাকে, অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। তার হবু স্ত্রীও তার থেকে কম যায় না। ড্রাগ ঘটিত অপরাধ ও লোক ঠকানোর অভিযোগ আছে তার বিরুদ্ধে। এরিক ম্যাগনোসনের বেতন সামান্যই। তবুও মাঝে মাঝে ভেলকির মতো অর্থ জোগাড় করে ফেলে।

ভুল বুঝতে পুরো একদিন লেগে গেল ওয়ালান্ডারের। পরদিন, জানুয়ারি ২৬, শুক্রবার বিকালে ছেড়ে দেয়া হলো এরিক ম্যাগনোসনকে। দেরিতে হলেও পুলিশ বুঝতে পেরেছে যে জোড়াখুনের সাথে সে জড়িত নয়।

এরিক ম্যাগনোসনের হবু শ্বাশুড়ির সাথে কথা বলে যাচাই করে নেয়া হয়েছে তার অ্যালিবাই। বৃদ্ধার কথা অবিশ্বাস করার কারণ নেই। মেয়ে অর্থাৎ এরিকের হবু বউকে দেখতে এসেছিলেন তিনি। ইয়োহানেস ও মারিয়া লভগ্রেন যে রাতে খুন হন, সেই রাতে এরিকের বাসাতেই ছিলেন। তার আবার ইনসমনিয়া আছে। সারা রাত এরিকের নাক ডাকার শব্দ সহ্য করতে হয়েছিল নাকি তাকে।

জাঙ্কম্যানের দেনা কিভাবে পরিশোধ করেছে, তাও জানিয়েছে এরিক ম্যাগনোসন। একটা ক্রাইজলার গাড়ি বিক্রির রসিদ দেখিয়েছে পুলিশকে। গাড়িটা কিনেছে লোমার এক ক্যাবিনেট-মেকার। পুলিশ যোগাযোগ করলে লোকটা জানিয়েছে, এক হাজার ক্রোনা আর পাঁচশো ক্রোনার নোট দিয়ে নগদে গাড়ির মূল্য পরিশোধ করেছে সে।

ইয়োহানেস লভগ্রেন তার পিতা জানা সত্ত্বেও কেন মিথ্যা বলেছে, তারও উপযুক্ত কারণ দেখিয়েছে ম্যাগনোসন। যেহেতু তার মা কাউকে কথাটা জানাতে চায় না, তাই সে পুলিশের কাছে অস্বীকার করেছে। যখন ওয়ালান্ডার জানায় যে তার বাবা লভগ্রেন ধনী ব্যক্তি ছিলেন, বাস্তবিকই হতভম্ব দেখাচ্ছিল ম্যাগনোসনকে।

শেষ পর্যন্ত কিছুই বাকি রইল না।

বিয়র্ক জানতে চেয়েছিল, এরিক ম্যাগনোসনকে বাড়ি পাঠিয়ে দিতে কারও আপত্তি আছে কিনা। বাঁধা দেয়নি কেউ। সেই সাথে পরবর্তী নোটিশ না দেয়া পর্যন্ত কেস থেকে অব্যাহতি দেয়া হয় ম্যাগনোসনকে। পুরো তদন্ত ভুল পথে চালিত করার অপরাধ বোধ পিষে মারছিল ওয়ালান্ডারকে। শুধুমাত্র রিডবার্গের মাঝে কোন ভাবান্তর ঘটেনি। যেন জানতো এরকম কিছুই ঘটবে। শুরু থেকেই সে ম্যাগনোসন অপরাধী হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করছিল।

আবারও কানাগলির শেষ মাথায় এসে থমকে গেল লুনাপের জোড়াখুনের তদন্ত। এগোনোর মতো কোন সূত্র নেই পুলিশের হাতে।

পরদিন শনিবার ভোর থেকে শুরু হলো তুমুল তুষারঝড়। হুহু করে শৈত্যপ্রবাহ বইতে লাগল দক্ষিণপশ্চিম থেকে। কয়েক ঘন্টা পর বন্ধ হয়ে গেল ই৬৫ রুট। টানা ছয় ঘন্টা ধরে চলল তুষারপাত। তীব্র বাতাসের কারণে রাস্তা থেকে তুষার সরানোর কাজ ব্যাহত হতে লাগল। রাস্তা থেকে কেটে তুললে আবারও রাস্তায় গিয়ে জমা হচ্ছে। চব্বিশ ঘন্টা পুলিশকে ব্যস্ত থাকতে হলো বিশৃঙ্খলা আর দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য। তারপর যেভাবে এসেছিল, সেভাবেই হুট করে চলে গেল ঝড়।

দিন কয়েক পরে ওয়ালান্ডারের মন ভালো করে দিতেই যেন ফোন করল তার মেয়ে। লিন্ডা জানালো, সে মালমোতে আছে এবং স্টকহোমের বাইরে একটা কলেজে ভর্তি হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কথা দিল, যাওয়ার আগে দেখা করে যাবে পিতার সাথে।

ওয়ালান্ডার এমনভাবে তার রুটিন সাজিয়ে নিল যাতে সপ্তাহে অন্তত তিন দিন তার বাবাকে গিয়ে দেখে আসতে পারে। স্টকহোমে ওর বোনকে চিঠি লিখে জানালো যে আগের চেয়ে অনেক ভালো অবস্থায় আছে ওদের বাবা। দেখাশোনার জন্য ওই মহিলা আসার পর থেকে অবস্থার উন্নতি ঘটেছে।

এক সন্ধ্যায় অ্যানেট ব্রোলিনকে ফোন দিল ওয়ালান্ডার। আমন্ত্রণ জানালো শীতের স্কেওনা ঘুরিয়ে দেখানোর। আর তার পূর্বের ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাইল আবারও। ধন্যবাদ জানিয়ে রাজি হয়ে গেল ব্রোলিন।

ফেব্রুয়ারির ৪ তারিখ, রোববারে ব্রোলিনকে আলেস ইস্তিনার আর গিলিমিনাহুসের মধ্যযুগীয় প্রাসাদের প্রাচীন পাথরগুলো দেখাতে নিয়ে গেল ওয়ালান্ডার। পরে হামেনহগে ডিনার করল ওরা। ওয়ালান্ডারের মনে হতে লাগল, সেই রাতের কথা সত্যিই মনে রাখেনি ব্রোলিন।

সপ্তাহ পার হয়ে গেল। কিন্তু এগোলো না তদন্ত। নতুন অ্যাসাইনমেন্ট দেয়া হলো মার্টিনসন আর নাসলুন্ডকে। তবে আরও কিছু সময়ের জন্য লুনাপের জোড়াখুন নিয়ে তদন্ত করার অনুমতি দেয়া হলো ওয়ালান্ডার আর রিডবার্গকে।

ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি এক সকালে ইয়োতেবোরিয়া থেকে ওয়ালান্ডারের অফিসে এল লভগ্রেনের এক মেয়ে। স্কেওনাতে এসেছে ভিলা সিমেট্রিতে তার বাবা-মায়ের কবরে একটা হেডস্টোন বসানোর তদারকি করতে। মিথ্যা আশা দিল না ওয়ালান্ডার। সরাসরি জানিয়ে দিল যে পুলিশের হাতে কোন সূত্রই নেই। পরদিন সিমেট্রিতে গেল সে। চুপচাপ তাকিয়ে থাকল সোনালি রঙে খোদাইকৃত কালো হেডস্টোনটার দিকে।

আশাব্যঞ্জক কিছু ছাড়াই কেটে গেল ফেব্রুয়ারি মাস।

রিডবার্গের পায়ের ব্যথা বেড়েই চলেছে। চলাফেরা করতে পারে না আজকাল। একারণেই ফোনের মাধ্যমেই সারে যাবতীয় কাজ। বিভিন্ন স্থানে দৌড়াদৌড়ির কাজগুলো করতে হচ্ছে ওয়ালান্ডারকে। স্কেওনার এমন কোন ব্যাংক নেই যেখানে খোঁজ নেয়নি ওরা। কিন্তু তৃতীয় কোন সেফ-ডিপোজিট বক্স খুঁজে পায়নি। ইয়োহানেস আর মারিয়া লভগ্রেনের আত্মীয় কিংবা পরিচিত এমন প্রায় দুই শতাধিক মানুষের সাথে কথা বলেছে ওয়ালান্ডার। বারবার খতিয়ে দেখেছে পূর্বে পাওয়া সকল তথ্যসূত্র। খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছে ভুলটা কোথায় হয়েছে। কিন্তু লাভ হয়নি কোন।

এক হিমশীতল দিনে স্টেন ওয়াইডেনকে তার খামার থেকে ধরে আনল ওয়ালান্ডার। দুজনে মিলে চলল লুনাপে। ওদের সামনে এক আঁটি খড় দেয়া হলো লভগ্রেনদের ঘোড়াটাকে। বৃদ্ধ নিসট্রম ওদের পিছু ছাড়লেন না এক মুহূর্তের জন্য। তাকে ঘোড়াটা দিয়ে দিয়েছে লভগ্রেনদের মেয়েরা।

নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে লভগ্রেনদের খামারববাড়ি। স্কুরাপের এক এস্টেট এজেন্টকে দিয়ে দেয়া হয়েছে বাড়িটা। রান্নাঘরের ভাঙা জানালাটার দিকে তাকিয়ে আছে ওয়ালান্ডার। মেরামত না করে প্লাইউড দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে শূন্যস্থানটুকু। ওয়াইডেনের সাথে নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক পুনরায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করল সে। কিন্তু ওয়াইডেনের মাঝে তেমন আগ্রহ দেখতে পেল না। তাকে ফিরিয়ে দিয়ে আসার সময় বুঝতে পারল যে ওদের বন্ধুত্ব আর জোড়া লাগবে না কখনই।

সম্পন্ন হয়েছে সোমালি শরণার্থী হত্যার তদন্ত। ইস্তায় ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের সামনে হাজির করা হয়েছে রুন বার্গম্যানকে। প্রেসের লোকজন দিয়ে ভরে গেছে আদালতকক্ষ। পুলিশের তদন্ত অনুযায়ী, ভালফ্রিড স্ট্রমই গুলি ছুড়েছিল। খুনের সাথে সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগ আনা হয়েছে রুন বার্গম্যানের বিরুদ্ধে।

যেহেতু সে মানসিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ, একারণে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়া করানো হয়েছে তাকে।

আদালতে সাক্ষ্য দিল ওয়ালান্ডার। বাকিটা সময় শুনে গেল অ্যানেট ব্রোলিনের যুক্তি উপস্থাপন। যতটা সম্ভব মুখ বন্ধ রাখল বার্গম্যান। ঘটনার সূত্র ধরে একটা বর্ণবাদী আন্ডারগ্রাউন্ড নেটওয়ার্কের কথা ফাঁস হলো, যার সদস্যরা কু-ক্লাক্স-ক্ল্যানের মতো রাজনৈতিক ধ্যানধারণা পোষণ করে। বার্গম্যান আর স্ট্রম যদিও নিজেদের গরজেই করেছে খুনটা, তবে একাধিক বর্ণবাদী সংঘটনের সাথে তাদের জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

আবারও ওয়ালান্ডারের মনে হলো, পরিবর্তন আসছে সুইডেনে। বেশ কিছু প্রশ্ন জাগলো ট্রায়াল চলাকালীন। এতদিন যাবত ওয়ালান্ডারও করে এসেছে এই প্রশ্নগুলো। শরণার্থীদের অবাধ আগমনের ওপর কি সরকার ও ইমিগ্রেশন সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণ আছে? সুবিধাভোগীদের থেকে আশ্রয়প্রার্থীদের কিভাবে আলাদা করা হচ্ছে? আদৌ করা হচ্ছে কি? বর্তমান পলিসি মেনে আর কতদূর? কোন সীমা নির্দিষ্ট করা আছে কি?

এ বিষয়গুলো নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানার চেষ্টা করেছে ওয়ালান্ডার। এবং বাকিদের মতোই একই অনুভূতি জেগেছে তার মনে। এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের শঙ্কা।

ফেব্রুয়ারির শেষদিকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেয়া হলো বার্গম্যানকে। তবে অবাক করার ব্যাপার হলো, শাস্তি মওকুফের জন্য আবেদন করল না সে।

তুষার বিহীন অবস্থায় কেটে গেল বাকি শীতটা। মার্চের শুরুর দিকে এক ভোরে হাঁটতে হাঁটতে ফালস্টাবোর স্পিটের অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেল ওয়ালান্ডার আর অ্যানেট ব্রোলিন। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি দক্ষিণ দিক থেকে এসে উড়ে চলে গেল ওদের মাথার ওপর দিয়ে। সাহস করে ব্রোলিনের হাত ধরল ওয়ালান্ডার। এবার হাত ছাড়িয়ে নিল না ব্রোলিন।

চার কেজি ওজন কমাতে পেরেছে ওয়ালান্ডার। তবে এটাও বুঝতে পেরেছে পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে না তার পক্ষে। মোনার সাথে কখনোসখনো কথা হয় ফোনে। ওয়ালান্ডার খেয়াল করেছে, আগের মতো ঈর্ষা অনুভব করে না এখন। স্বপ্নেও ওই কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা আসে না আর।

মার্চের শুরুর দিকে দুই সপ্তাহের মতো হাসপাতালের ভর্তি থাকতে হলো রিডবার্গকে। প্রথমে সবাই ভেবেছিল তার পায়ের কারণে। এবা চুপেচুপে ওয়ালান্ডারকে জানায় যে রিডবার্গের ক্যান্সার হয়েছে। তবে কী ক্যান্সার বলতে পারল না। হাসপাতালে যায় ওয়ালান্ডার। রিডবার্গ জানায় পেটের রুটিন

চেকআপের জন্য ভর্তি হয়েছে। এক্স-রে করার পর নাকি বৃহদন্ত্রে ঘা থাকার সম্ভাবনা দেখা গেছে।

রিডবার্গ গুরুতর অসুস্থ হতে পারে ভেবে কষ্টে বুক ফেটে যাবার উপক্রম হলো ওয়ালান্ডারের। বুকভরা হতাশা নিয়েই তদন্তে লেগে রইল সে। একদিন রাগের চোটে দেয়ালে ছুড়ে মারল মোটা কেস ফোল্ডারটা। মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল ভেতরে থাকা কাগজপত্র। খানিকক্ষণ মূর্তির মতো বসে থাকল সে। তারপর মেঝেতে বসে গুছিয়ে রাখতে লাগল সব কাগজ।

কিছু একটা আমার চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে, বলল নিজেকে। এমন কিছু যা এই রহস্যের চাবিকাঠি।

মাঝে মাঝেই বোম্যানকে ফোন করে নিজের মন্দ ভাগ্য নিয়ে হাহুতাশ করে সে। নিজ গরজে নিলস ভেলান্দার ও আরও কয়েকজন সন্দেহভাজনের ওপর অনুসন্ধান চালিয়েছিল বোম্যান। কিছুই পাওয়া যায়নি। গোটা দুই দিন লার্স হার্ডিনকে নিয়ে পড়ে থাকল ওয়ালান্ডার। কিন্তু এক ইঞ্চিও এগোতে পারল না। তবে এখনও হাল ছাড়েনি সে। এই রহস্যের কিনারা হবে না, মানতে পারছে না কিছুতেই।

মার্চের মাঝামাঝি অপেরা দেখতে অ্যানেট ব্রোলিনকে কোপেনহেগেনে যেতে রাজি করিয়ে ফেলল সে। রাতটা একসাথে কাটাল ওরা। কিন্তু ওয়ালান্ডার যখন তার ভালবাসার কথা জানালো, লজ্জিত ভঙ্গিতে এড়িয়ে গেল ব্রোলিন।

মার্চের ১৭ তারিখে লিন্ডা এল বেড়াতে। একাই এসেছে। সাথে করে ওর কেনিয়ান বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে আসেনি। ওয়ালান্ডার রেল স্টেশন থেকে গিয়ে নিয়ে এল মেয়েকে। আগের দিন এবা তার এক বন্ধুকে পাঠিয়েছিল মারিয়াগতায় ওয়ালান্ডারের ফ্ল্যাটটা পরিষ্কার করে দিয়ে আসতে।

অবশেষে ওয়ালান্ডারের মনে হলো, মেয়েকে ফিরে পেয়েছে। অনেকক্ষণ ওস্তেলিয়েদেন সৈকত ধরে হাঁটল বাপ-মেয়ে। লিলা ভিকে লাঞ্চ সারল। তারপর আড্ডা দিতে দিতে সকাল পাঁচটা বাজিয়ে ফেলল। ওয়ালান্ডারের বাবাকে দেখতে গেল ওরা। ছেলে-নাতনি দুজনকেই অবাক করে দিয়ে ওয়ালান্ডারের ছোটবেলার মজার কিছু ঘটনা শোনালেন ওর বাবা। সোমবার সকালে লিন্ডাকে ট্রেনে তুলে দিতে গেল ওয়ালান্ডার। কিছুটা হলেও মেয়ের বিশ্বাস ফিরে পেতে সক্ষম হয়েছে বলে তার বিশ্বাস।

অফিসে বসে জোড়াখুন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিল ওয়ালান্ডার, এমন সময় রিডবার্গ এসে ঢুকল। সোজা গিয়ে বসল জানালার পাশের চেয়ারে। তারপর জানালো, তার প্রস্টেট ক্যান্সার হয়েছে। আপাতত রেডিয়েশন ট্রিটমেন্ট আর

কেমোথেরাপি চলবে। তবে কতদিন চলবে, সুস্থ হবে কিনা তা অনিশ্চিত। করুণা চাইতে আসেনি সে। এসেছে মারিয়া লভগ্রেনের শেষ কথা আর ফাঁসটার কথা ওয়ালান্ডারকে মনে করিয়ে দিতে। তারপর ওয়ালান্ডারের সাথে হাত মিলিয়ে চলে গেল রিডবার্গ।

বিয়র্ক জানিয়ে দিল, বিভিন্ন কাজে পুলিশ অফিসাররা ব্যস্ত থাকায় লুনাপের জোড়াখুনের তদন্ত আপাতত ওয়ালান্ডারকে একাই সামলে নিতে হবে।

মার্চেও কিছু ঘটল না। এমনকি এপ্রিলেও না। রিডবার্গের অবস্থা আগের মতোই। নির্দিষ্ট করে কিছু বলতে পারছে না ডাক্তাররা। এবা সব খবরাখবর জানিয়ে যায় ওয়ালান্ডারকে।

মে এর প্রথম দিকে বিয়র্কের সাথে দেখা করল ওয়ালান্ডার। অনুরোধ করল তদন্তের ভার অন্য কাউকে দিতে। রাজি হলো না বিয়র্ক। অন্তত গ্রীষ্মের ছুটির দিনগুলো শেষ হওয়া পর্যন্ত ওয়ালান্ডারকেই চালিয়ে যেতে হবে। তারপর নাহয় অন্য কিছু ভাবা যাবে।

আবারও প্রথম থেকে তদন্ত করল ওয়ালান্ডার। একবার না, বারবার। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল প্রতিটা সূত্র। কিন্তু আশা জাগানিয়া কিছু খুঁজে পেল না।

জুনের শুরুর দিকে তার পুজোঁ পাল্টে একটা নিসান নিল সে। জুনের আট তারিখে গেল ছুটিতে। গাড়ি চালিয়ে স্টকহোমে গেল মেয়েকে দেখতে। একত্রে নর্থ কেপ পর্যন্ত ঘুরতে গেল ওরা। হারমান আহম্বোয়া এখন কেনিয়ায়। তবে আগস্টে চলে আসবে।

জুলাইয়ের নয় তারিখ, সোমবার কাজে যোগদান করল ওয়ালান্ডার। এসে বিয়র্ককে পেল না। তবে একটা নোট রেখে গেছে বিয়র্ক। সে না ফেরা পর্যন্ত লুনাপের জোড়া খুন নিয়ে তদন্ত চালিয়ে যেতে বলেছে ওয়ালান্ডারকে। আগস্টে ছুটি থেকে ফিরে পরবর্তী সিদ্ধান্ত জানাবে সে।

এবাও একটা মেসেজ রেখে গেছে ওয়ালান্ডারের জন্য। জানিয়েছে, আগের চেয়ে ভালো আছে রিডবার্গ। আশার বাণী শুনিয়েছে ডাক্তাররা। রিডবার্গের ক্যান্সার হয়ত নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।

জুলাইয়ের দশ তারিখ, মঙ্গলবার লাঞ্চের সময় ডাউনটাউনে গেল ওয়ালান্ডার। একটা নতুন স্টেরিও কেনার জন্য গিয়ে ঢুকল স্কোয়ারের ইলেক্ট্রিক্যাল শপে। বিল মেটাতে গিয়ে ওয়ালেটে কিছু নরওয়েজিয়ান নোট দেখতে পেল সে। সেই যে নর্থ কেপে গিয়েছিল, তখন থেকেই নোটগুলো আছে সাথে। ক্রোনারে বদলে নিতে মনেই ছিল না। ইউনিয়ন ব্যাংকে চলে এল সে। লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ল একমাত্র খোলা কাউন্টারের সামনে।

কাউন্টারের পেছনের মহিলাকে চিনতে পারল না সে। তুখোড় স্মৃতিশক্তির অধিকারিণী ব্রিটা লেনা বোডেন আজ নেই সেখানে।

বড় অঙ্কের অর্থ তুলল ওয়ালান্ডারের সামনে দাঁড়ানো লোকটা। কাজ না থাকায় ওয়ালান্ডার কল্পনা করার চেষ্টা করল, এতগুলো ক্রোনার লোকটা কী কাজে ব্যবহার করবে। লোকটা যখন নোট গুনছিল, কাউন্টারে রাখা লোকটার ড্রাইভিং লাইসেন্স থেকে অন্যমনস্কভাবে নামটা পড়ল ওয়ালান্ডার।

তারপর তার পালা। নরওয়েজিয়ান নোটগুলো ক্রোনারে পাল্টে নিল সে। পেছন থেকে একজন পর্যটককে ইতালিয়ান বা স্প্যানিশে কথা বলতে শুনল।

রাস্তায় বেরিয়ে আসার পর সহসাই একটা ধারণা খেলে গেল তার মনে। মূর্তির ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকল এক মুহূর্ত, যেন হাঁটতে ভুলে গেছে। তারপর দ্রুত পায়ে ব্যাংকের ভেতর ফিরে গেল। কাউন্টার খালি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে। তারপর বসে থাকা ক্লার্ককে তার পরিচয়পত্র দেখাল।

"ব্রিটা লেনা বোডেন কি ছুটিতে গিয়েছেন?" জিজ্ঞেস করল সে।

"সম্ভবত সিমরিশামে গেছে তার বাবা-মার কাছে," বলল ক্লার্ক। "আরও দুই সপ্তাহ পর আসবে।"

"তার বাবার বাড়ি কোথায় বলতে পারবেন?"

"সিমরিশামে একটা পেট্রল স্টেশন আছে ওর বাবার। স্ট্যাটঅয়েল নাম সম্ভবত স্টেশনটার।"

"ধন্যবাদ," বলল ওয়ালান্ডার। "কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার ছিল তাকে।"

"আপনাকে চিনি আমি," বলল ক্লার্ক। "ওই জঘন্য খুন দুটো এখনও সমাধান করতে পারেননি, তাই না?"

"না," বলল ওয়ালান্ডার। "তবে শীঘ্রই করব।"

বলতে গেলে প্রায় দৌড়ে স্টেশনে ফিরে এল সে। তারপর গাড়ি নিয়ে ছুটল সিমরিশামে। ব্রিটা লেনা বোডেনের বাবা জানালেন, সান্ডহামারান সৈকতে বন্ধুদের সাথে ঘুরতে গেছে ব্রিটা। অনেক খুঁজে একটা বালির ঢিবির আড়ালে মেয়েটাকে খুঁজে পেল ওয়ালান্ডার। বন্ধুদের সাথে ব্যাকগামন খেলছিল সে। ওয়ালান্ডারকে তড়িঘড়ি করে বালু মাড়িয়ে আসতে দেখে অবাক হলো সবাই।

"জরুরি দরকার না পড়লে আপনাকে বিরক্ত করতাম না," বলল ওয়ালান্ডার।

পরিস্থিতির গুরত্ব বুঝতে পেরে উঠে গেল ব্রিটা লেনা বোডেন। তার পরনে বিকিনি দেখে চোখ সরিয়ে নিল ওয়ালান্ডার। অন্যদের থেকে একটু দূরে গিয়ে বসল ওরা।

"জানুয়ারির ঐ দিনটা সম্পর্কে আরও কিছু প্রশ্ন করতে চাই আপনাকে," বলল ওয়ালান্ডার। "একটু ভেবে বলবেন। ইয়োহানেস লভগ্রেন যখন অর্থ উত্তোলন করছিল, তখন কি ব্যাংকে আর কেউ ছিল?"

ভাবতে হলো না ব্রিটা লেনা বোডেনকে। "না, একাই ছিলেন তিনি।"

এই উত্তরটাই আশা করছিল ওয়ালান্ডার।

"মনে করতে থাকুন," বলল সে। "দরজার দিয়ে বেরিয়ে গেলেন লভগ্রেন। তার পেছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। তারপর কী হলো?"

"দরজা বন্ধ হয়নি," উত্তর দিতে সময় লাগল না তরুণীর।

"আরেকজন কাস্টমার এসেছিল?"

"দুজন।"

"চেনেন তাদের?"

"না।"

পরের প্রশ্নটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

"কারণ তারা বিদেশি ছিল, তাই না?"

বিস্ময় ফুটল মেয়েটার চেহারায়। "হ্যাঁ। আপনি কিভাবে জানলেন?"

"অনুমান। এখন জানলাম মাত্র। তারপর কী হলো?"

"লোক দুজনের বয়স খুব বেশি ছিল না।"

"কেন গিয়েছিল তারা ব্যাংকে?"

"কিছু ডলার বদলে নিতে।"

"তারা কি আমেরিকান ছিল? ইংরেজিতে কথা বলছিল?"

মাথা নাড়াল ব্রিটা লেনা বোডেন। "ইংরেজিতে না। আমি বুঝতে পারিনি তাদের কথা।"

"তারপর?"

"কাউন্টারে আসে তারা।"

"দুজনেই?"

কয়েক মুহূর্ত সময় নিল মেয়েটা। বাতাসে উড়ছে তার খোলা চুল।

"একজন এসে ডলারগুলো কাউন্টারে রাখে। খুব সম্ভবত একশো ডলার ছিল। বদলে নিতে চায় কিনা জিজ্ঞেস করেছিলাম। মাথা দুলিয়ে হ্যাঁ বলে লোকটা।"

"অন্য লোকটা কী করছিল?"

আবারও ভাবতে হলো ব্রিটা লেনা বোডেনকে। "কিছু একটা মেঝেতে ফেলে দিয়েছিল সে। বাঁকা হয়ে তুলে নিচ্ছিল। একটা গ্লাভ মনে হয়।"

এবার অন্য কোণ থেকে প্রশ্ন করার সিদ্ধান্ত নিল ওয়ালান্ডার। "ব্রিফকেসে ক্রোনার নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন ইয়োহানেস লভগ্রেন। আর কিছু কি দিয়েছিলেন তাকে?"

"একটা রসিদ।"

"ওটাও কি ব্রিফকেসে রেখেছিলেন লভগ্রেন?"

এই প্রথম দ্বিধান্বিত দেখাল ব্রিটা লেনা বোডেনকে। "মনে হয়।"

"যদি ব্রিফকেসে না রাখেন, তাহলে রসিদটা গেল কোথায়?"

ভেবে দেখল মেয়েটা। "কাউন্টারে রেখে যাননি, এটা আমি জোর গলায় বলতে পারি। রেখে গেলে আমার চোখে পড়তোই।"

"মেঝেতে পড়ে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল?"

"পড়তেও পারে।"

"তাহলে কি গ্লাভ তোলার জন্য যে লোকটা বাঁকা হয়েছিল, সে রসিদটা কুড়িয়ে পেয়েছিল?"

"পেতেও পারে।"

"রসিদে কী লেখা ছিল?"

"উত্তোলনের পরিমাণ। লভগ্রেনের নাম আর ঠিকানা।"

দম আটকে এল ওয়ালান্ডারের। "আপনি নিশ্চিত? আর কিছু না?"

"যদিও প্রয়োজন ছিল না, তবুও তিনি তার ঠিকানা লিখেছিলেন। আমার মনে আছে স্পষ্ট।"

পেছনে ফিরে গেল ওয়ালান্ডার। "ক্রোনার তুলে চলে যেতে উদ্যত হন লভগ্রেন। দোরগোড়ায় দুজন বিদেশির সামনে পড়েন। ওই দুজনের একজন গ্লাভ তুলতে নিচে ঝুঁকে। সেই সাথে লভগ্রেনের রসিদও কুড়িয়ে পায় হয়ত। রসিদে লেখা ছিল, ইয়োহানেস লভগ্রেন সাতাশ হাজার ক্রোনার তুলেছেন। ঠিক কি না?"

মুহূর্তেই বুঝে গেল ব্রিটা লেনা বোডেন। " ওই লোক দুজনই কি করেছে কাজটা?"

"এখনও বলতে পারছি না। আপনার সাহায্য লাগবে। ভাবার চেষ্টা করুন।"

"আমি ডলার বদলে দিই। লোকগুলো ক্রোনার নিয়ে পকেটে রাখে। তারপর চলে যায়।"

"কতক্ষণ লেগেছিল এই পুরো কাজটা করতে?"

"তিন থেকে চার মিনিট।"

"লভগ্রেনের রসিদের কপি ব্যাংকে আছে নিশ্চয়?"

মাথা দুলিয়ে হ্যাঁ বোঝালো তরুণী।

"আজ নোট বদলাতে ব্যাংকে গিয়েছিলাম। নাম লিখতে হয়েছিল আমাকে। ওই লোক দুজন কি ঠিকানা দিয়েছিল?"

"আমার ঠিক মনে নেই।"

মাথা দোলাল ওয়ালান্ডার। "আপনার স্মৃতিশক্তি অসাধারণ। ওই দুইজনকে কি আগে বা পরে কখনও দেখেছিলেন? মনে করতে পারবেন?"

"না। কখনো দেখিনি।"

"আবার দেখলে চিনতে পারবেন?"

"মনে হয়।"

কয়েক মুহূর্ত সময় নিল ওয়ালান্ডার। "দু:খিত, কিন্তু মনে হচ্ছে আপনার ছুটিতে ব্যাঘাত ঘটাতে হবে কয়েক দিনের জন্য।"

"আগামীকাল ওল্যান্ড যাওয়ার প্রোগ্রাম করা আছে আমার!"

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে ওয়ালান্ডার। "কিছু করার নেই। ওখানে যাওয়ার সময় পরে আরও পাবেন।"

দাঁড়িয়ে প্যান্ট থেকে বালি ঝেড়ে ফেলল ওয়ালান্ডার। "আপনার বাবা-মাকে জানিয়ে রাখবেন কিভাবে আপনার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।"

ব্রিটা লেনা বোডেনও বন্ধুদের মাঝে ফিরে যেতে উদ্যত হলো। "ওদের জানালে সমস্যা হবে?"

"বানিয়ে বলে দিন কিছু একটা," জবাব দিল ওয়ালান্ডার। "আপনার ওপর বিশ্বাস আছে।"

বিকালে ইউনিয়ন ব্যাংক থেকে বিদেশি দুজনের রসিদটা জোগাড় করা হলো। কোন ঠিকানা লেখা নেই। সইটাও বোঝার উপায় নেই।

হতাশ হলো না ওয়ালান্ডার। ঘটনা কিভাবে ঘটেছে, অন্তত সেটা জানে এখন। ব্যাংক থেকে সরাসরি রিডবার্গের বাসায় চলে এল।

বারান্দায় বসে ছিল রিডবার্গ। চিকন হয়ে গেছে। মুখখানা ফ্যাকাসে। বারান্দায় বসে নতুন যা যা ঘটেছে সব জানালো ওয়ালান্ডার। চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল রিডবার্গ।

"মনে হচ্ছে ঠিক পথেই এগোচ্ছ," বলল ওয়ালান্ডারের বলা শেষে।

"কিন্তু লোকগুলোকে কিভাবে খুঁজে পাব, সেটাই বুঝে উঠতে পারছি না," বলল ওয়ালান্ডার। "দুজন পর্যটক যারা ছয় মাসেরও আগে সুইডেনে ঘুরতে এসেছিল।"

"এমনও তো হতে পারে যে এখনও সুইডেনেই আছে তারা," বলল রিডবার্গ। "হয়ত পর্যটক না, শরণার্থী হিসেবে।"

"তাহলে কোথা থেকে শুরু করা যায়?" জানতে চাইল ওয়ালান্ডার।

"জানি না," বলল রিডবার্গ। "তবে একটা উপায় তুমি বের করবেই।"

আরও কয়েক ঘন্টা রিডবার্গের বারান্দায় বসে থাকল ওরা। গোধূলি নামলে গাড়িতে গিয়ে বসল ওয়ালান্ডার।

অবশেষে কূলের দেখা পেয়েছে।

পনেরো

রিডবার্গের ওখান থেকে বেরিয়ে সোজা বিয়র্কের বাসায় চলে এল ওয়ালান্ডার। ডিনার করছিল বিয়র্ক। বাঁধা দিয়ে তাৎক্ষণিক তার থেকে হ্যানসন ও মার্টিনসনকে পুনরায় লুনাপের জোড়াখুনের তদন্তে পুনরায় নিযুক্ত করার অনুমতি আদায় করল ওয়ালান্ডার।

মনে রাখার সুবিধার্থে একটা চার্ট বানালো সে। শুরু করল ব্রিটা লেন্ডা বোডেনের স্মরণ করা কথাগুলো আর বোঝার অনুপযোগী সই দিয়ে। ঘটনাটা কিভাবে ঘটেছে অনুমান করার পর মারিয়া লভগ্রেনের শেষ কথাটা এখন আর প্রলাপ মনে হচ্ছে না। একারণে তার গলায় পরানো অদ্ভুত গিঁটের ফাঁসটাকেও গুরুত্ব দিতে হবে এখন।

জুলাইয়ের ১১ তারিখ, বুধবারে কর্মদিবস শুরু হওয়ার আগে খুনের দিনের ঘটনাবলি অভিনয় করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। কাউন্টারে গিয়ে বসল ব্রিটা লেনা বোডেন। লভগ্রেন সাজলো হ্যানসন। এবার থেকে একটা পুরনো ব্রিফকেস নিয়ে এসেছে সে। মার্টিনসন আর বিয়র্ক অভিনয় করবে ডলার বদলে নিতে আসা দুই বিদেশির ভূমিকায়। সবকিছু যেন ছয় মাস আগের সেই দিনটার মতো হয়, খেয়াল রাখল ওয়ালান্ডার। গড়িমসি করলেও হ্যানসনকে সাতাশ হাজার ক্রোনার দিতে ব্রিটা লেনা বোডেনকে অনুমতি দিল ব্যাংকের ম্যানেজার।

একপাশে দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষণ করল ওয়ালান্ডার। অভিনয় করতে গিয়ে নতুন কিছু খুঁটিনাটি তথ্য মনে পড়ে গেল ব্রিটা লেনা বোডেনের। একারণে দুইবার প্রথম থেকে অভিনয় করতে সবাইকে বাধ্য করল ওয়ালান্ডার। আসলে এই কাজের উদ্দেশ্যই ছিল ব্রিটা লেনা বোডেনের স্মৃতি উস্কে দেয়া। ওয়ালান্ডার আশা করছিল, এর ফলে এমন কিছু মনে পড়বে মেয়েটার যার ফলে খুনিদের ধরতে সুবিধা হবে।

অভিনয় শেষে মাথা নাড়ালো ব্রিটা লেনা বোডেন। আর কিছু মনে পড়ছে না তার। ওল্যান্ডে যাওয়া আরও কিছুদিন পিছিয়ে দেয়ার জন্য তাকে অনুরোধ করল ওয়ালান্ডার। তারপর একটা কামরায় নিয়ে এল মেয়েটাকে। দেখানো হলো সুইডেন পুলিশের রেকর্ডে আছে এমন সব বিদেশি অপরাধীদের ছবি। কিন্তু লুনাপের দুজনকে ওই ছবিগুলোর মাঝে খুঁজে পেল না বোডেন। পরে নরশাপিংগামী একটা বিমানে তুলে দেয়া হলো তাকে ইমিগ্রেশন সার্ভিসের এক্সটেনসিভ ফটো আর্কাইভ ঘেঁটে দেখার জন্য। অসংখ্য ছবি দেখা শেষে

আঠারো ঘন্টা পর স্টুরাপে ফিরে এল সে। ওয়ালান্ডার নিজে বিমানবন্দরে গেল তার সাথে দেখা করতে। এবং হতাশ হলো। খুনিদের ছবি পাওয়া যায়নি।

উপায় না দেখে ইন্টারপোলের সাহায্য নেয়া হলো। ঘটনার সম্ভাব্য বর্ণনা জানানো হলো তাদের। মিলিয়ে দেখা হলো ইউরোপিয়ান হেডকোয়ার্টারের সাথে। কিন্তু আশাব্যঞ্জক কিছু জানা গেল না।

ব্রিটা লেনা বোডেনকে সারি সারি ছবির সামনে বসিয়ে চিমনি সুইপার আর্থার লুন্ডিনের সাথে দেখা করতে গেল ওয়ালান্ডার। লুন্ডিনের ভ্যানে করে লভগ্রেনের মতো করে যাওয়া-আসা করল লুনাপ আর ইস্তার মাঝে। তারপর চার্টে বসালো তা।

মাঝেমাঝে রিডবার্গের সাথে দেখা করতে যায় সে। দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে রিডবার্গ। মৃত মানুষের মতো রঙ হারাচ্ছে চামড়া। বারান্দায় বসে দুজনে তদন্ত নিয়ে আলাপ করে। ওয়ালান্ডারের ধারণা, বারবার এসে রিডবার্গকে বিরক্ত করছে সে। যদিও রিডবার্গ তা মনে করে না, কিন্তু প্রতিবার এক ধরণের অপরাধবোধ নিয়ে ফিরে যায় ওয়ালান্ডার।

স্বামী-সন্তান নিয়ে গেরেবইস্তায় ছুটি কাটিয়ে ফিরেছে অ্যানেট ব্রোলিন। সাথে নিয়ে এসেছে তার পরিবারকে। ফোনে তদন্তের পরিস্থিতি জানানোর সময় যথাসম্ভব ভদ্র সুরে কথা বলল ওয়ালান্ডার।

ব্যস্ত একটা সপ্তাহ পার হবার পর ফের থমকে গেল তদন্ত। দেয়ালে ঝুলানো চার্টের দিকে তাকিয়ে সময় পার করতে লাগল ওয়ালান্ডার। আবারও আটকে গেছে ওরা।

"অপেক্ষা করতে হবে আমাদের," বলল বিয়র্ক। "ইন্টারপোল কিছু না কিছু বের করবেই।"

ব্রিটা লেনা বোডেন ওল্যান্ড থেকে ফিরে এলে তাকে আরও কিছুদিন ছুটি দেয়ার জন্য ব্যাংককে বলল ওয়ালান্ডার। মেয়েটাকে ইস্তার শরণার্থী শিবিরগুলো ঘুরে দেখাতে নিয়ে গেল সে। মালমোর পোঁতাশ্রয়ে নোঙর করা জাহাজগুলোতে অবস্থিত ভাসমান শিবিরগুলোতেও গেল তারা। কিন্তু কোন মুখ পরিচিত ঠেকল না বোডেনের কাছে। বর্ণনা শুনে চেহারা আঁকার জন্য স্টকহোম থেকে একজন পুলিশ চিত্রশিল্পী ধরে আনা হলো। কিন্তু আঁকা ছবিগুলোর একটাও বোডেনকে সন্তুষ্ট করতে পারল না।

ব্যর্থতার আশঙ্কা জাগল ওয়ালান্ডারের মনে। মার্টিনসনকে জোর করে অন্য কাজে পাঠিয়ে দিল বিয়র্ক। তদন্তের দায়িত্বে থাকল শুধু হ্যানসন আর ওয়ালান্ডার।

জুলাইয়ের ২০ তারিখ, শুক্রবার। হতাশ হয়ে পড়েছে ওয়ালান্ডার কোন অগ্রগতি না হওয়ায়। তদন্ত সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার পরামর্শ দিয়ে একটা মেমো লিখল সে সন্ধ্যার দিকে। সোমবার জমা দিবে কাগজটা। সিদ্ধান্ত নিবার ভার ছেড়ে দিবে বিয়র্ক আর অ্যানেট ব্রোলিনের ওপর।

শনিবার আর রবিবার বর্নহোমের ড্যানিশ আইল্যান্ডে কাটাল ওয়ালান্ডার। বিচ্ছিরি ভাবে শুরু হয়েছে দিনটা। ঝড়ো বাতাস, তার ওপর ঝিরিঝিরি বৃষ্টি। এদিকে ফেরিতে কী যেন খেয়েছে। একারণে পেটে ব্যথা করছে তার। রোববার রাতটা তাই শুয়েই কাটাতে হলো। মাঝে মাঝে অবশ্য কয়েকবার উঠতে হয়েছে বমি করবার জন্য।

সোমবার সকালে অনেকটা ভালো বোধ করল সে। কিন্তু খাট ছেড়ে উঠবে কিনা বুঝতে পারছে না। অনেক দোনোমনা শেষে উঠে বেরিয়ে পড়ল ফ্ল্যাট থেকে। নয়টার কিছু আগে গিয়ে পৌছাল স্টেশনে। এবার জন্মদিন উপলক্ষে কেক কাটা হলো ক্যান্টিনে। দশটার দিকে বিয়র্ককে দেয়ার জন্য লেখা মেমোটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিবার সুযোগ পেল ওয়ালান্ডার। জমা দিতে যাবে, এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। ব্রিটা লেনা বোডেন ফোন করেছে।

"ওরা ফিরে এসেছে। তাড়াতাড়ি আসুন!" বলল ফিসফিসিয়ে।

"কারা ফিরে এসেছে?" জিজ্ঞেস করল ওয়ালান্ডার।

"ওই বিদেশি লোক দুজন। ডলার পাল্টাতে এসেছিল যারা।"

করিডোর ধরে ছুটতে গিয়ে নরেনের দেখা পেল ওয়ালান্ডার। সবেমাত্র ট্রাফিক ডিউটি থেকে ফিরেছে নরেন।

"এসো আমার সাথে!" চেঁচিয়ে বলল ওয়ালান্ডার।

"কী হয়েছে?" স্যান্ডউইচে কামড় বসাতে বসাতে জিজ্ঞেস করল নরেন।

"কথা বাড়াবে না। এসো!"

ওরা যখন ব্যাংকে পৌছাল, নরেনের হাতে তখনও অর্ধেক খাওয়া স্যান্ডউইচ। আসার পথে লাল বাতি পড়লে ফুলের সারি মাড়িয়ে গাড়ি ছুটিয়েছে ওয়ালান্ডার। শহরে পৌছে গাড়ি থামিয়েছে স্কোয়ারের কিছু দোকানের মাঝে। তাতেও শেষ রক্ষা হয়নি। লোক দুজন চলে গেছে ততক্ষণে। এতটাই বিহ্বল হয়ে পড়েছিল ব্রিটা লেনা বোডেন, যে কাউকে দিয়ে লোকগুলোকে অনুসরণ করাতে মনে ছিল না। তবে সিকিউরিটি ক্যামেরা চালু করে দিতে ভুলেনি।

এবারকার রসিদের সই মিলিয়ে দেখল ওয়ালান্ডার। লেখা বোঝা না গেলেও হুবহু আগের সইটাই। এবারও কোন ঠিকানা দেয়া নেই।

"আমাকে ফোন করে বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন," ব্রিটা লেনা বোডেনের উদ্দেশ্যে বলল ওয়ালান্ডার। "কিন্তু দেরি করার জন্য কী অজুহাত দেখিয়েছিলেন?"

ব্যাংকের ম্যানেজারের অফিসে বসে আছে ওরা এখন। থরথর করে কাঁপছে মেয়েটা।

"বলেছি ভেতর থেকে স্ট্যাম্প নিয়ে আসতে হবে।"

"ওরা কি কিছু সন্দেহ করতে পেরেছে?"

মাথা নাড়িয়ে না বোঝাল মেয়েটা।

'চমৎকার," বলল ওয়ালান্ডার। "অসাধারণ কাজ করেছেন।"

"ওই লোকগুলোকে ধরতে পারবেন এখন?" জানতে চাইল বোডেন।

"হ্যাঁ," জবাব দিল ওয়ালান্ডার। "এবার আর পালিয়ে বাঁচতে পারবে না।"

ভিডিও টেপে যে দুজনকে দেখা গেল, তাদের দেখে ভূমধ্যসাগরীয় মনে হলো না ওয়ালান্ডারের। একজনের মাথায় ছোট করে কাটা সোনালি চুল, আরেকজনের মাথায় টাক। কাজের সুবিধার্থে প্রথমজনের নাম দেয়া হলো লুসিয়া, দ্বিতীয়জনের স্কিনহেড।

বিভিন্ন ভাষা বাজিয়ে শোনানো হলো ব্রিটা লেনা বোডেনকে। অবশেষে সে জানাতে পারল, সম্ভবত চেক বা বুলগেরিয়ান ভাষায় কথা বলছিল লোক দুজন একে অপরের সাথে। লোক দুজনের জমা দেয়া পঞ্চাশ ডলারের নোটটা ল্যাবে পাঠানো হলো পরীক্ষার জন্য।

অফিসে মিটিং ডাকল বিয়র্ক।

"ছয় মাস পর আবারও দেখা দিয়েছে খুনি দুজন" বলল ওয়ালান্ডার। "ঠিক একই ব্যাংকে। কিন্তু কেন? অন্য ব্যাংকে কেন গেল না? কেনইবা ফিরে এল তারা? দুটো কারণ হতে পারে। এক, এই এলাকার আশেপাশেই থাকে তারা। দুই, গতবার এই ব্যাংকে এসে কপাল খুলে গিয়েছিল তাদের। তবে এবার লাভ হয়নি। লাইনে তাদের সামনে দাঁড়ানো লোকটা এবার ক্রোনার জমা দিচ্ছিল, উত্তোলন করছিল না। তবে সে-ও ইয়োহানেস লভগ্রেনের মতোই একজন কৃষক। বিদেশি দুজন হয়ত ভেবেছে, লভগ্রেনের মতো দেখতে লোকেরা সবসময় বড় অঙ্কের টাকা তুলে থাকে।"

"চেক?" জিজ্ঞেস করল বিয়র্ক। "নাকি বুলগেরিয়ান?"

"এখনই বলা যাচ্ছে না," বলল ওয়ালান্ডার। "ভুলও হতে পারে মেয়েটার। যদিও তার দেয়া বর্ণনা মিলে গেছে।"

চারবার ভিডিওটা দেখল ওরা। তারপর ভিডিও থেকে লোক দুজনের ছবি প্রিন্ট করানোর সিদ্ধান্ত নিল।

"শহর ও তার আশেপাশের এলাকায় পূর্ব ইউরোপ থেকে আসা প্রত্যেকের খবরাখবর নিতে হবে," বলল বিয়র্ক। "জানি সহজ হবে না কাজটা। বৈষম্যের অভিযোগ উঠতে পারে। কিন্তু এখন সেসবের পরোয়া করলে চলবে না। খুনি দুজন এখানেই কোথাও আছে। মালমো আর কৃষানইস্তার পুলিশ প্রধানের সাথে কথা বলব আমি। দেখি কাউন্টি পর্যায়ে কিছু করা যায় কিনা।"

"প্রত্যেক পুলিশ অফিসারকে ভিডিওটা দেখাতে হবে," বলল হ্যানসন। "রাস্তায় হয়ত লোক দুজনকে কেউ দেখে ফেলতেও পারে।"

লভগ্রেনদের খামারবাড়ির রক্তাক্ত অন্দর ভেসে উঠল ওয়ালান্ডারের মনে।

"লোকগুলো বিপজ্জনক হতে পারে," বলল সে। "খুনিরা মানসিকভাবে বিকৃত। কিন্তু লুনাপে যে হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়েছে, তা অস্বাভাবিকের চেয়েও বেশি কিছু।"

"যদি তারা খুনি হয়ে থাকে আরকি," বলল বিয়র্ক। "এখনও নিশ্চিত হয়ে বলা যাচ্ছে না।"

"সত্য," সায় দিল ওয়ালান্ডার। "তবুও, সাবধানের মার নেই।"

"পুরো দমে কাজে নেমে পড়তে হবে," বলল বিয়র্ক। "কার্ট দায়িত্বে থাকবে আর সবাইকে যার যার কাজ বুঝিয়ে দিবে। অন্য সব কাজ বাদ আপাতত। প্রোসিকিউটরকে জানাচ্ছি আমি। সব শুনে খুশি হবেন তিনি।"

কিন্তু কিছুই ঘটল না। শহরটা ছোট হলেও গায়েব হয়ে গেল লোক দুজন। বিশাল পুলিশ বাহিনি দিয়েও লাভ হলো না।

পার হয়ে গেল বেশ কিছুদিন। দুজন কাউন্টি পুলিশ প্রধান তাদের জেলায় বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছেন। পুলিশদের মাঝে বিতরণ করে দেয়া হয়েছে ভিডিও টেপটা। মিডিয়ায় ছবিগুলো ছেড়ে দেয়া নিয়ে দ্বিধায় ভুগছে ওয়ালান্ডার। লোকগুলো যদি গা ঢাকা দেয়, এই ভয়ে সাহস পাচ্ছে না। রিডবার্গের পরামর্শ চাইল সে।

"এখনই না," বলল রিডবার্গ। "কিছুদিন অপেক্ষা কর। তারপর মিডিয়ায় দাও।"

সাথে করে কয়েক কপি ছবি নিয়ে এসেছিল ওয়ালান্ডার। অনেকক্ষণ ধরে ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকল রিডবার্গ।

"খুনির চেহারা বলে আসলে নির্দিষ্ট কিছু নেই," বলল সে। "কপাল, চুল, ভাঙা চোয়াল এসব আমরা কল্পনা করে নেই। কিন্তু কখনই বাস্তবের খুনিদের চেহারার সাথে তা মেলে না।"

দেখতে দেখতে জুলাইয়ের ৩১ তারিখ, বৃহস্পতিবার চলে এল। আকাশ জুড়ে আজ মেঘেদের দৌড়াদৌড়ি। সোঁ সোঁ করে বইছে বাতাস। ভোরে ঘুম

ভেঙ্গে গেলেও খাট ছেড়ে উঠল না ওয়ালান্ডার। শুয়ে শুয়ে কান পাতল বাতাসের গর্জনে। শেষতক যখন উঠল, গিয়ে দাঁড়াল বাথরুমে রাখা ওজন মাপার স্কেলে। আরও এক কেজি কমেছে ওজন। দেখে সে এতটাই খুশি হলো যে এতদিন ধরে চেপে বসা মন খারাপের অনুভূতি বেমালুম উবে গেল। ফুরফুরে মেজাজ নিয়ে চলে এল স্টেশনে।

এবার সাথে কথা বলতে রিসিপশনে থামল সে। পুরনো দিনের একটা মিউজিক বক্স দেখতে পেল সুইচবোর্ডের পাশে।

"কোথায় পেলে এটা?" জিজ্ঞেস করল সে। "আমি তো ভেবেছিলাম এগুলো জাদুঘরে চলে গেছে।"

"খোয়াবু মার্কেটের একটা স্টল থেকে কিনেছি," জবাব দিল এবা। "বাতিলের মাঝেও কখনোসখনো মানিক মেলে বুঝলে।"

হেসে অফিসের পথে পা বাড়াল ওয়ালান্ডার। যাওয়ার পথে হ্যানসন আর মার্টিনসনকে ডেকে নিল। এখন অবধি স্কিনহেড বা লুসিয়ার খোঁজ পাওয়া যায়নি।

"আর দুই দিন," বলল ওয়ালান্ডার। "বৃহস্পতিবারের মধ্যে যদি খোঁজ না মেলে, তাহলে কনফারেন্স ডেকে ছবিগুলো ছেড়ে দিব মিডিয়ায়।"

"আমার মনে হয় এখনই দেয়া উচিত," বলল হ্যানসন।

কিছু বলল না ওয়ালান্ডার।

ওর বানানো চার্টটা নিয়ে আলোচনা করল ওরা। ঠিক হলো, শিবিরগুলোয় সম্ভাব্য লুকানোর জায়গায় অনুসন্ধান চালাবে মার্টিনসন।

"ইয়ুথ হোস্টেল গুলোতে খোঁজ নেবে," বলল ওয়ালান্ডার। "গ্রীষ্মের ছুটিতে প্রাইভেট হোমগুলোতে ভাড়া নেয়া কামরাগুলোও বাদ দিবে না।"

"আগেই ভালো ছিল," বলল মার্টিনসন। "শীত-গরম কখনোই বাসা ছেড়ে নড়ত না মানুষজন। আজকাল তো ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়ে।"

ওয়ার্ক পারমিট ছাড়া পূর্ব ইউরোপিয়ান দেশগুলোতে জনবল নিয়োগ দেয়, এমন সব ছোটখাটো, বেনামি ফার্মগুলোতে অনুসন্ধান চালাবে হ্যানসন। ওয়ালান্ডার যাবে স্ট্রবেরি ক্ষেতগুলোতে। বলা যায় না, ফলের খামারগুলোতে লুকিয়ে থাকতে পারে খুনি দুজন।

কিন্তু এত কিছু করেও লাভ হলো না। বিকেলে যখন আবার জড়ো, ভালো খবর শোনাতে পারল না কেউই।

"খুনিদের খুঁজতে গিয়ে দেখি এলাহি কারবার," বলল হ্যানসন। "বেশিরভাগ শ্রমিকেরই ওয়ার্ক পারমিট নেই। নামেমাত্র বেতন পায়। কোন বীমা করা নেই। যদি কোন রকম দুর্ঘটনা ঘটে, কোম্পানি গুলো তো দায়ভার

নেবে না। দিব্যি অস্বীকার করে পার পেয়ে যাবে। ভাবছি বিয়র্ককে জানাব। লুনাপের কেসটা সমাধান হলেই এদিকটা দেখতে হবে।"

মার্টিনসনও কিছু জানাতে পারল না।

"এক টাকমাথা বুলগেরিয়ানকে খুঁজে পেয়েছিলাম," বলল সে। "ভেবেছিলাম স্কিনহেডকে পেয়ে গেছি। পরে দেখি, মারিইস্তার এক ক্লিনিকে ডাক্তার সে। অ্যালিবাইও আছে।"

বদ্ধ ঠেকছিল রুমটা ওয়ালান্ডারের কাছে। উঠে জানালা খুলে দিল। এবার মিউজিক বক্সের কথা মনে পড়ল তার। যদিও যন্ত্রটা বাজতে শুনেনি একবারও, তবুও সারাদিন ধরেই তার মস্তিষ্কে অবিরত বেজে চলেছে ওটা।

"হাটগুলোতেও খোঁজ নিতে হবে," উল্টো ঘুরে বলল সে। "কোনটা বসবে আজকালের মধ্যে?"

উত্তরটা হ্যানসন আর মার্টিনসন দুজনেরই জানা। কিভিকেরটা।

"আজ ও আগামীকাল খোলা থাকবে," জানালো হ্যানসন।

"আগামীকাল যাব আমি," সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল ওয়ালান্ডার।

"অনেক বড় হাট ওটা," বলল হ্যানসন। "সাথে কাউকে নিয়ে গেলে সুবিধা হবে।"

"আমি যেতে রাজি," বলল মার্টিনসন।

যেতে হবে না শুনে স্বস্তি নামল হ্যানসনের চেহারায়। ওয়ালান্ডারের চোখ এড়াল না তা। বুধবার রাতে সম্ভবত রেস আছে, ভাবল সে। মিটিং শেষ হলে হ্যানসন আর মার্টিনসন বিদায় নিল। ওয়ালান্ডার বসে বসে স্তূপ হওয়া ফোন মেসেজ গুলো গুরুত্ব অনুযায়ি সাজাতে লাগল। তবে আজ না, আগামীকাল দেখবে সেগুলো। কাজ শেষে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে লাগল সে। এমন সময় ডেস্কের নিচে পড়া থাকা একটা নোট নজরে এল ওর। পড়ে দেখল, একটা শরণার্থী শিবিরের পরিচালক তাকে ফোন করতে বলেছে।

ফোন দিল ওয়ালান্ডার। দশ বার রিঙ হওয়ার পর যখন রেখে দিবে, এমন সময় রিসিভার উঠানো হলো ওপ্রান্তে।

"ইস্তা পুলিশ স্টেশন থেকে ওয়ালান্ডার বলছি। মি. মোডিন আছেন?"

"বলছি।"

"ফোন করেছিলেন আপনি?"

"আপনাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা জানানোর ছিল।"

উত্তেজনায় দম নিতে ভুলে গেল ওয়ালান্ডার।

"গতকাল ছুটি থেকে এসেছি আমি। এসে দেখি পুলিশ কিছু ছবি পাঠিয়েছে। যে দুজনকে আপনারা খুঁজছেন, তাদের আমি চিনি। আমার ক্যাম্পে কয়েকদিন ছিল তারা।"

"আমি আসছি," বলল ওয়ালান্ডার। "অফিস ছেড়ে এক পাও নড়বেন না।"

স্কুরাপের বাইরে অবস্থিত শিবিরটা। ওয়ালান্ডারের পৌছাতে লাগল সাকুল্যে উনিশ মিনিট। একটা পুরনো ভিকারেজে স্থাপন করা হয়েছে শিবিরটা। আগে যাজকেরা থাকত এখানে। এখন স্থায়ী শিবিরগুলোতে স্থান সংকুলান না হলে সাময়িক আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

পরিচালক মোডিনের বয়স ষাটের কোঠায়। আকারে ছোটখাটো লোকটা ড্রাইভে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল ওয়ালান্ডারের জন্য।

"ক্যাম্প এখন খালি," বললেন মোডিন। "তবে আগামী সপ্তাহে কয়েকজন রোমানিয়ান আসার কথা।"

পরিচালকের অফিসে চলে এল ওরা।

"এবার শুরু করুন," বলল ওয়ালান্ডার।

"গত ডিসেম্বর থেকে এই ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি পর্যন্ত এখানে ছিল তারা," অফিসিয়াল ফাইল উল্টাতে উল্টাতে বললেন মোডিন। "তারপর মালমোর সেলসিয়াস হাউজে স্থানান্তর করা হয়।"

স্কিনহেডের দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। "এই লোকের নাম লোথার ক্রাফটজিক। এসেছে চেক রিপাবলিক থেকে। জাতিগত নিধনের শিকার হওয়ার আশঙ্কার দাবি করে রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্য আবেদন করেছিল।"

"চেকোস্লোভাকিয়ায় আবার সংখ্যালঘু আছে নাকি?" জিজ্ঞেস করল ওয়ালান্ডার।

"মনে হয় নিজেকে জিপসি দাবি করেছিল সে।"

"দাবি করেছিল?"

কাঁধ ঝাঁকালেন মোডিন। "আমার ধারণা মিথ্যা বলেছে সে। সুইডেনে আশ্রয় লাভ করার সহজতম একটা পথ হলো নিজেকে জিপসি দাবি করা।"

লুসিয়ার ছবি তুলে নিলেন মোডিন। "অ্যান্ড্রিয়াস হাস। এটাও চেক। এর কারণটা আমার জানা নেই। এদের কাগজপত্র সব এদের সাথে সেলসিয়াস হাউজে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।"

"আপনি নিশ্চিত যে যাদের কথা বলছেন, ছবির লোকগুলো তারাই?"

"হান্ড্রেড পার্সেন্ট।"

"ঠিক আছে," বলল ওয়ালান্ডার। "আর কিছু?"

"কী সম্পর্কে?"

"তাদের আচরণ কেমন ছিল? এখানে থাকার সময় অস্বাভাবিক কিছু করেছিল কিনা? আর্থিক অবস্থা কেমন ছিল? আপনারা যা যা মনে আছে।"

"বয়স হয়েছে, খুব বেশি মনে নেই," বললেন মোডিন। "তেমন কথাবার্তা বলত না ওরা। বোঝেনই তো, ক্যাম্পের জীবন অত্যন্ত কঠিন। তবে প্রায়ই দাবা খেলতে দেখেছি ওদের।"

"আর্থিক অবস্থা?"

"মনে নেই।"

"আচার ব্যবহার কেমন ছিল?"

"যদিও নিজেদের নিয়েই থাকত, তবে অমিশুক ছিল না।"

"আর কিছু?"

মোডিনের ইতস্তত ভাব ওয়ালান্ডারের চোখ এড়াল না।

"কোন রকম দ্বিধা রাখবেন না মনে," বলল সে।

"এটা খুব ছোট একটা ক্যাম্প," বললেন মোডিন। "রাতে এখানে থাকি না আমি। বেশিরভাগ সময়ই স্টাফরাও থাকে না। শুধু খাবার তৈরির জন্য একজন রাঁধুনি থাকে। যদি কখনও দরকার পড়ে, এজন্য একটা গাড়ি রাখা থাকে সর্বদা। চাবি আমার অফিসে তালাবন্ধ অবস্থায় থাকে। কিন্তু কখনও কখনও সকালে ফিরে এলে আমার মনে হত, কেউ আমার অফিসে ঢুকেছিল। তারপর চাবি নিয়ে গাড়িটা ব্যবহার করেছে।"

"আপনার সন্দেহ ওই দুইজন গাড়িটা ব্যবহার করত?"

উপরে নিচে মাথা দোলালেন মোডিন। "জোর দিয়ে বলতে পারব না। তবে আমার কেন জানি ওদেরকেই সন্দেহ হত।"

ভাবার জন্য দুয়েক মুহূর্ত সময় নিল ওয়ালান্ডার। "ছয় মাস আগে, জানুয়ারির চার তারিখ থেকে ছয় তারিখ পর্যন্ত কেউ ডিউটিতে ছিল কিনা জানা সম্ভব?"

ডেস্ক ক্যালেন্ডারের পাতা উল্টালেন মোডিন। "মালমোতে ছিলাম আমি তখন। শরণার্থীদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় অস্থায়ী ক্যাম্প বাড়ানো নিয়ে একটা জরুরি মিটিং ছিল।"

আশার আলো দেখতে পেল ওয়ালান্ডার। "তারমানে কেউই ছিল এখানে ওইদিন গুলোতে?"

"রাঁধুনি লোকটা ছিল। তবে রান্নাঘরটা পিছন দিকে হওয়ায় কেউ যদি গাড়িটা চালিয়ে বেরিয়ে যায়ও, সে টের পেত না।"

"কিন্তু শরনার্থীদের চোখ এড়িয়ে যাওয়া তো সম্ভব না।"

"দেখলেও কেউ মুখ খুলত না। এমনিতেই ভয়ে থাকে ওরা। উটকো ঝামেলায় জড়াবে কেন?"

চলে যেতে উদ্যত হলো ওয়ালান্ডার।

"সেলসিয়াস হাউজে আপনার সহকর্মীকে ফোন করে জানান আমি যাচ্ছি ওখানে," বলল সে। "তবে লোক দুটোর ব্যাপারে কিছু বলবেন না। শুধু বলুন পরিচালক যেন উপস্থিত থাকে।"

জিজ্ঞাসু চোখে ওর দিকে তাকালেন মোডিন। "কেন খুঁজছেন ওদেরকে?"

"আমাদের ধারণা মারাত্মক এক অপরাধের সাথে জড়িত তারা।"

"লুনাপের জোড়াখুনের কথা বলছেন?"

লুকানোর কারণ দেখল না ওয়ালান্ডার। "জি। আমাদের ধারণা, ওরাই দায়ি ঘটনাটার পেছনে।"

সাতটার কিছু পরে মালমোর সেলসিয়াস হাউজে গিয়ে পৌছাল সে। রাস্তার পাশে গাড়ি পার্ক করে এগিয়ে গেল সদর দরজার দিকে। একজন প্রহরী দাঁড়িয়ে সেখানে। কয়েক মিনিট পর একজন লোক এল ওয়ালান্ডারকে নিয়ে যেতে। লোকটার নাম লারসন। অবসরপ্রাপ্ত নাবিক। লোকটার গা থেকে বিয়ারের গন্ধ পেল ওয়ালান্ডার।

"হাস আর ক্রাফটজিক," লারসনের অফিসে যাওয়ার পর বলল সে। "চেক রিপাবলিক থেকে এসেছে শরণার্থী হিসেবে।"

"জি, এখানেই থাকে ওরা," বলল লারসন।

অবশেষে, ভাবল ওয়ালান্ডার।

"এখন কি এখানেই আছে? মানে এই বিল্ডিং এ?"

"জি," বলল লারসন। "মানে না।"

"মানে?"

"এখানে থাকলেও নেই এখন।"

"কোথায় তাহলে?"

"আমি ঠিক জানি না।"

"জানেন না?"

"পালিয়ে গেছে ওরা।"

"পালিয়ে গেছে?"

"এরকম মাঝে মাঝেই হয়। লোকজন পালিয়ে যায় ক্যাম্প থেকে।"

"কিন্তু ওরা তো আশ্রয় খুঁজতেই এসেছে, তাই না? তাহলে পালানোর কী আছে?"

"তবুও পালিয়ে যায়।"

"কেউ পালিয়ে গেলে আপনারা কী করেন?"

"নিয়ম অনুযায়ী রিপোর্ট করি।"

"তারপর?"

"তারপর আর কী?"

"থাকার অনুমতি পেল কি পেল না, এসবের তোয়াক্কা না করেই শরণার্থীরা পালিয়ে যাচ্ছে। আর এসব দেখার কেউ নেই?"

"খুঁজে বের করার কাজ তো পুলিশের।"

রক্ত চড়ে গেল ওয়ালান্ডারের। অনেক কষ্টে সামলালো নিজেকে। "কবে থেকে গায়েব ওরা?"

"মে মাস থেকে। হয়ত ভেবেছে ওদের থাকতে অনুমতি দেয়া হবে না। একারণে লুকিয়ে থাকতে চাইছে।"

"কোথায় যেতে পারে ধারণা আছে?"

দুপাশে হাত ছড়িয়ে দিল লোকটা। "আপনার ধারণাই নেই থাকার অনুমতি বিহীন কতজন শরণার্থী এখানে আছে। এরা একসাথে থাকে, কাগজপত্র জাল করে, অর্থের বিনিময়ে নাম বিক্রি করে, অবৈধভাবে কাজ করে। জি, আপনার কথাই সত্য। দেখার কেউ নেই। কিন্তু এভাবেই চলছে।"

ভাষা হারিয়ে ফেলল ওয়ালান্ডার। দিশেহারা বোধ করছে এরকম অনিয়ম দেখে।

"ওই দুজনের যত কাগজপত্র আছে, সব চাই আমার," বলল সে।

"দেয়ার অনুমতি নেই।"

"কী করেছে ওরা জানেন?" ফেটে পড়ল ওয়ালান্ডার। "খুন! তাও একটা না। জোড়াখুন।"

"আমার কিছুই করার নেই।"

উঠে দাঁড়াল ওয়ালান্ডার। "আগামীকাল সকালে এসে যাবতীয় কাগজ নিয়ে যাব আমি। প্রস্তুত করে রাখবেন। দরকার হলে ন্যাশনাল পুলিশ প্রধানকে নিয়ে আসব।"

"আপনার ইচ্ছা। তবে নিয়মের বাইরে যেতে পারব না আমি।"

ইস্তায় ফিরে এল ওয়ালান্ডার। রাত আটটা পঁয়তাল্লিশের দিকে উপস্থিত হলো বিয়র্কের বাসায়। দ্রুত খুলে বলল সব।

"আগামীকাল ওই দুজনের নামে এপিবি জারি করতে হবে," বলল সে।

মাথা দুলিয়ে সায় জানাল বিয়র্ক। "দুটোর দিকে প্রেস কনফারেন্স ডাকব আমি। সকালে পুলিশ প্রধানদের সাথে একটা মিটিং আছে। আর সেলসিয়াস হাউজের ব্যাপারটা দেখছি।"

রিডবার্গকে দেখতে গেল ওয়ালান্ডার। বারান্দায় অন্ধকারে বসে আছে রিডবার্গ। তার চেহারা দেখেই ওয়ালান্ডার বুঝে গেল, কষ্ট পাচ্ছে সে। ওয়ালান্ডারের টের পাওয়াটা বুঝতে পারল রিডবার্গ। লুকানোর চেষ্টা করল না সে। "মনে হয় না এ যাত্রায় পার পাব। ক্রিসমাস পর্যন্ত টিকতে পারব কিনা কে জানে।"

কথা জোগাল না ওয়ালান্ডারের মুখে।

"যাক গে, কেন এসেছ তাই বল।"

ধীরে ধীরে সব জানালো ওয়ালান্ডার। তারপর চুপচাপ বসে রইল দুজন। বেশ ঠান্ডা পড়েছে বাইরে। কিন্তু রিডবার্গের বিকার নেই। পুরনো একটা ড্রেসিং গাউন আর স্লিপার পায়ে বসে আছে।

"হয়ত জেলা ছেড়ে পালিয়েছে," বলল ওয়ালান্ডার। "কোনদিন ধরতে পারব কিনা কে জানে।"

"সেক্ষেত্রে সান্ত্বনা এই যে অন্তত তাদের পরিচয় জানা গেছে," বলল রিডবার্গ। "ন্যায়বিচার মানে শুধু অপরাধীদের শাস্তি দেয়াই না। শেষতক সত্যের পেছনে লেগে থাকাটাও এর আওতায় পড়ে।"

অনেক কষ্ট সহ্য করে এক বোতল কগনেক নিয়ে এল সে। তারপর কাঁপা কাঁপা হাতে দুটো গ্লাস ভরে নিল।

"শুনেছিলাম বুড়ো পুলিশ অফিসাররা নাকি পুরনো দিনের অমীমাংসিত রহস্য ভাবতে ভাবতে দিন পার করে," বলল সে। "আমিও বোধ হয় তাদের একজন হতে যাচ্ছি।"

"পুলিশে যোগ দেয়া নিয়ে আফসোস হয় তোমার?" জিজ্ঞেস করল ওয়ালান্ডার।

"একদমই না।"

একত্রে কগনেকে চুমুক দিল ওরা। নিস্তব্ধতার মাঝে কথা বলল দুয়েকটা। রাত গড়ালে উঠে পড়ল ওয়ালান্ডার। পরের দিন সন্ধায় আবার আসার কথা দিয়ে বেরিয়ে গেল। অন্ধকার বারান্দায় একা বসে রইল রিডবার্গ।

১ আগস্ট, বুধবার সকালে হ্যানসন আর মার্টিনসনকে আগের দিন যা যা ঘটেছে জানালো ওয়ালান্ডার। প্রেস কনফারেন্স হতে হতে বিকাল ধরবে। তার আগে কিভিক হাটে ঘুরে আসার সিদ্ধান্ত নিল ওয়ালান্ডার। বিয়র্কের জন্য প্রেস

রিলিজ লেখার দায়িত্ব দেয়া হলো হ্যানসনকে। দুপুরের আগেই ফিরে আসবে বলে জানাল ওয়ালান্ডার।

টোমেলিলার মধ্য দিয়ে কিভিকের দক্ষিণ ভাগের দিকে এগোলো ওয়ালান্ডার আর মার্টিনসন। কাছাকাছি পৌছানোর পর একটা ক্ষেতে পার্ক করল গাড়ি। সুযোগ পেয়ে বিশ ক্রোনার দাবি করে বসল ওই ক্ষেতের চাষী।

হাটে পৌছাতে না পৌছাতেই বৃষ্টি শুরু হলো। বিরক্তি নিয়ে সারি সারি স্টল আর মানুষের ভিড়ের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। কান ফাটানো শব্দে লাউডস্পিকার বাজছে কোথাও। মদের প্রভাবে হুঁশজ্ঞান হারিয়ে চেঁচাচ্ছে তরুণেরা। লোকজন তাদের সরিয়ে হাঁটার জায়গা করে নিচ্ছে।

"দুই পাশ থেকে খোঁজা শুরু করব আমরা," বলল ওয়ালান্ডার।

"ওয়াকিটকি নিয়ে আসা উচিত ছিল," বলল মার্টিনসন। "দরকার পড়লে যোগাযোগ করা যেত।"

"দরকার পড়বে না," বলল ওয়ালান্ডার। "এক ঘন্টা পর হাটের মাঝখানে উপস্থিত থাকবে।"

মার্টিনসনকে ভিড়ের মাঝে হারিয়ে যেতে দেখল সে। তারপর কলার তুলে দিয়ে হাঁটতে লাগল বিপরীত দিকে।

এক ঘন্টার একটু পরে দেখা হয়ে গেল ওদের। ত্যক্তবিরক্ত দুজনেই। একে তো বৃষ্টিতে ভিজে একসার। তার ওপর ভিড়ের মাঝে ঠেলাঠেলিতে জান বের হবার জোগাড়।

"অনেক হয়েছে," বলল মার্টিনসন। "চলুন, কফি খেয়ে গা গরম করে নেয়া যাক।"

সামনে বিশাল এক তাঁবু দেখতে পেল ওয়ালান্ডার। ওটার দিকে ইঙ্গিত করে জিজ্ঞেস করল, "ওটা দেখেছ?"

মুখ বাঁকাল মার্টিনসন। "জামাকাপড় খুলে নাচছে কয়েকটা বেশ্যা। লোকজনের চেঁচামেচি দেখে মনে হলো যৌন বিকৃতদের আখড়া বসেছে।"

"তাঁবুটার পেছনেচল," বলল ওয়ালান্ডার। "ওদিকেও কয়েকটা স্টল আছে। সেগুলো দেখা হলে আজকের মতো শেষ।"

কাদা মাড়িয়ে, একটা ক্যারাভান আর জং ধরা তাঁবুর খুঁটির মধ্যে এগিয়ে চলল ওরা। স্টলগুলো সব দেখতে একই। প্রত্যেকটার চাঁদোয়া লাল রঙের ধাতব খুঁটিতে আটকানো। তবে একেক স্টলে একেক রকমের পণ্য বিক্রয় হচ্ছে।

একই সাথে লোক দুজনকে দেখতে পেল ওয়ালান্ডার আর মার্টিনসন। একটা স্টলের ভেতর বসে আছে তারা। স্টলের কাউন্টার একই দামের চামড়ার জ্যাকেট দিয়ে সাজানো। বড় করে মূল্য লেখা রাখা হয়েছে সাথে।

কাউন্টারের পেছনের দুজন তাকিয়ে আছে পুলিশ অফিসার দুজনের দিকে। ওয়ালান্ডারের বুঝতে দেরি হয়ে গেল যে খুনিরা চিনে ফেলেছে ওকে। সব পত্রিকা আর টিভিওয়ালাদের দোষ।

মুহূর্তেই কাউন্টারে সাজিয়ে রাখা জ্যাকেটের নিচ থেকে রিভলভার বের করে আনল লুসিয়া। লাফ দিয়ে একপাশে সরে গেল ওয়ালান্ডার আর মার্টিনসন। তাঁবুর দড়ির সাথে পেঁচিয়ে গেল মার্টিনসন। ক্যারাভানের পেছনের অংশে মাথা ঠুকে গেল ওয়ালান্ডারের। ওয়ালান্ডারের দিকে রিভলভার তাক করল লুসিয়া। পাশের তাঁবু থেকে ভেসে আসা মোটরসাইকেলের গর্জনের কারণে বলতে গেলে শোনাই গেল না গুলির আওয়াজ। ওয়ালান্ডারের মাথার কয়েক ইঞ্চি ওপরে ক্যারাভানে এসে বিঁধল বুলেট। পরমুহূর্তেই মার্টিনসনকে রিভলভার বের করে আনতে দেখল সে।

গুলি করল মার্টিনসন। পেছনে উড়ে গেল লুসিয়া। হাত দিয়ে কাঁধ চেপে ধরেছে সে। হাত থেকে খসে কাউন্টারের বাইরে গিয়ে পড়েছে তার রিভলভার। জানোয়ারের মতো গর্জে উঠে নিজেকে দড়ি থেকে ছাড়িয়ে নিল মার্টিনসন। দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপ দিল লুসিয়াকে লক্ষ করে। এক গাদা জ্যাকেটের ওপর গিয়ে পড়ল সে। ধ্বসে পড়ল কাউন্টার।

সামনে লাফ দিয়ে কাদা থেকে রিভলভার তুলে নিল ওয়ালান্ডার। স্কিনহেডকে দেখল তাকে পাশ কাটিয়ে ভিড়ে মিশে যেতে। কেউ খেয়ালই করেনি যে এখানে একটু আগে গুলি ছোঁড়া হয়েছিল। লুসিয়ার মুখের ওপর জবরদস্ত এক ঘুষি চালালো মার্টিনসন। আশেপাশের দোকানদাররা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপভোগ করছে সাক্ষাৎ একশন দৃশ্য।

"ওইটাকে ধরুন," চেঁচিয়ে বলল মার্টিনসন। "আমি এই শুয়োরটাকে দেখছি।"

দৌড় দিল ওয়ালান্ডার। হাতে বন্দুক, মুখে কাদা। ভয়ে রাস্তা ছেড়ে দিল লোকজন। স্কিনহেডকে পাওয়ার আশা ছেড়েই দিচ্ছিল, এমন সময় আবার ভিড়ের মাঝে তাকে দৌড়াতে দেখতে পেল ওয়ালান্ডার। সামনে এসে পড়া এক বয়স্ক মহিলাকে ধাক্কা দিয়ে, একটা কেকের স্টল তছনছ করে দৌড়াল স্কিনহেড। পিছু নিতে গিয়ে একটা মিষ্টির স্ট্যান্ড উল্টো দিল ওয়ালান্ডার। এবং আবারও হারিয়ে ফেলল স্কিনহেডকে।

দমে না গিয়ে ভিড়ের মধ্য দিয়ে দৌড়াতে লাগল সে। একটু পর আবারও দেখা পেয়ে গেল স্কিনহেডের। সৈকতের দিকে নেমে যাওয়া টিলার প্রান্তের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সে। দুজন সিকিউরিটি গার্ড দৌড়ে এল তার দিকে। হাতের রিভলভার তুলে ধরে চিৎকার করে সরে যেতে বলল সে। ঝাঁপ দিতে গিয়ে একজন গার্ড গিয়ে পড়ল বিয়ারের তাঁবুতে, আরেকজন একটা মোমবাতিদানির স্টল উল্টে দিল।

থামল না ওয়ালান্ডার। জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে। ধুকধুক করছে বুক। টিলার ওপাশে হারিয়ে গেছে স্কিনহেড। প্রায় ত্রিশ মিটারের মতো পিছিয়ে আছে ওয়ালান্ডার। সীমানায় পৌঁছে ভারসাম্য সামলাতে পারল না সে। ঢাল বেয়ে পড়ে যেতে লাগল পিছলে। রিভলভার ছুটে গেল হাত থেকে। থেমে অস্ত্রটা খুঁজবে কিনা ভাবল সে। পরমুহূর্তেই স্কিনহেডকে দেখতে পেল সৈকতের দিকে দৌড়াতে। পিছু নিল ওয়ালান্ডার।

একটু পর একজনেরও দৌড়ানোর শক্তি অবশিষ্ট রইল না। একটা দাঁড়াটানা নৌকায় হেলান দিল স্কিনহেড। দশ মিটার দূরে দাঁড়িয়ে পড়ল ওয়ালান্ডার। এতটাই হয়রান হয়ে গেছে যে শুয়ে পড়তে ইচ্ছা হচ্ছে ওর।

একটা ছুরি বের করে এগিয়ে আসতে লাগল স্কিনহেড। এই ছুরিটা দিয়েই নিশ্চয় ইয়োহানেস লভগ্রেনের নাক কেটেছিল, ভাবল ওয়ালান্ডার। এই ছুরি দিয়েই লভগ্রেনকে বাধ্য করা হয়েছিল ক্রোনারের হদিস দিতে। অস্ত্রের খোঁজে আশেপাশে তাকাল সে। একটা ভাঙা দাঁড় ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না। ছুরি নিয়ে ঝাঁপ দিল স্কিনহেড। দাঁড় বাগিয়ে ধরে আত্মরক্ষা করল ওয়ালান্ডার। আবারও ছুরি নিয়ে এগিয়ে এল স্কিনহেড। দাঁড় দিয়ে আঘাত করার চেষ্টা করল ওয়ালান্ডার। স্কিনহেডের কলারবোনে গিয়ে লাগল মজবুত কাঠ। হাড় ভাঙার শব্দ কানে এল ওয়ালান্ডারের। টলে উঠল স্কিনহেড। দাঁড় ফেলে ডান হাত মুঠি পাকিয়ে সজোরে লোকটার চোয়ালে ঘুষি চালালো ওয়ালান্ডার। যদিও হাতে ব্যথা পেল, তবে কাজ হলো ঘুষিতে। কুপোকাত স্কিনহেড।

ভেজা বালিতে বসে পড়ল ওয়ালান্ডার। কয়েক সেকেন্ড পর এসে উপস্থিত হলো মার্টিনসন। বৃষ্টি পড়ে চলেছে এখনও।

"অবশেষে খুনিদের ধরতে পেরেছি আমরা," বলল মার্টিনসন।

"হ্যাঁ," বলল ওয়ালান্ডার। "অবশেষে।"

সাগরের পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলল সে। দূরে একটা ট্যাঙ্কার দেখতে পেল। ভেসে চলছে দক্ষিণে। খুনিরা ধরা পড়েছে শুনে রিডবার্গ কতটা খুশি হবে ভেবে আনন্দ হলো ওর।

দুই দিন পর খুনে জড়িত থাকার অভিযোগ স্বীকার করে নিল অ্যান্ড্রিয়াস হাস। তবে দোষ চাপালো সঙ্গীর ওপর। লোথার ক্রাফটজিককে চাপ দেয়া হলে সে-ও নতি স্বীকার করল। তার দাবি, নাক কাটা, ফাঁস পরানোর মতো নির্মম কাজগুলোর জন্য অ্যান্ড্রিয়াস হাস দায়ী।

ওয়ালান্ডার যেমনটা অনুমান করেছিল, সেভাবেই ঘটেছিল পুরো ঘটনা। ডলার ভাঙানোর নাম করে একজন ধনী কাস্টমারের সন্ধানে ছিল খুনি দুজন। গাড়িতে করে লভগ্রেনকে শরণার্থী শিবির থেকে অনুসরণ করে ওরা। লভগ্রেনকে নামিয়ে দিয়ে চিমনি সুইপার লুন্ডিনের গাড়ি চলে গেলে কাঁচা রাস্তা ধরে লভগ্রেনের পিছু নেয়। তারপর দুই রাত পর ফিরে যায় ডাকাতি করতে।

"কিন্তু একটা প্রশ্নের উত্তর এখনও পাইনি," লোথার ক্রাফটজিককে বলল ওয়ালান্ডার। "ঘোড়াটাকে কেন খড় দিয়েছিলে?"

বিস্মিত দেখাল লোকটাকে।

"খড়ের গাদায় লুকানো ছিল ব্রিফকেসটা," বলল সে। "ওটা খুঁজতে গিয়ে হয়ত ঘোড়াটার ভাগ্যে কিছু খড় জুটে যায়।"

মাথা দোলাল ওয়ালান্ডার। এতটা সহজ উত্তর আশা করেনি।

"আরেকটা কথা," বলল ওয়ালান্ডার। "কেন ফাঁস পরানো হলো মারিয়া লভগ্রেনকে?"

এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল না। দুজনের একজনও এই বীভৎসতা স্বীকার করল না বারবার জিজ্ঞেস করা সত্ত্বেও।

চেকোস্লোভাকিয়ার পুলিশ জানালো, হাস ও ক্রাফটজিল দুজনেই সাজাপ্রাপ্ত আসামী।

সেলসিয়াস হাউজ থেকে পালিয়ে হুরের বাইরে একটা পুরনো কটেজ ভাড়া নিয়েছিল দুজন। হাটে যে জ্যাকেটগুলো বিক্রি করছিল তারা, সেগুলো চুরি করেছে ট্রানাসের একটা চামড়ার দোকান থেকে।

আদালতে গড়ালো কেস। যথেষ্ট প্রমাণ থাকায় খুনিদের দোষী প্রমাণ করতে সমস্যা হবে না। অবশ্য এখনও পরস্পরকে দুষে চলছে তারা বীভৎসতার জন্য।

কোর্টরুমে বসে খুনি দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকল ওয়ালান্ডার। জানুয়ারির সকালটার কথা মনে পড়ে গেল ওর। লভগ্রেনদের খামার বাড়িটায় পা রেখেছিল ওই বীভৎস সকালে। অবশেষে সমাধান হলো জোড়াখুন রহস্যের। অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি পাবে খুনিরা। তবুও খুশি হতে পারছে না ওয়ালান্ডার। কেন ফাঁস পরানো হলো মারিয়া লভগ্রেনের গলায়? কেন এই বীভৎসতা?

উত্তর না পাওয়ায় অসন্তুষ্ট থাকতে হবে তাকে।

১১ আগস্ট, শনিবার এক বোতল হুইস্কি নিয়ে রিডবার্গের বাসার উদ্দেশ্যে রওনা হলো সে। আগামীকাল অ্যানেট ব্রোলিনকে নিয়ে যাবে তার বাবার সাথে দেখা করাতে। ওয়ালান্ডারের জন্য ডিভোর্স নেবে কিনা, জানতে চেয়েছিল ব্রোলিনের কাছে। স্বভাবতই না করে দিয়েছে ব্রোলিন। তবে ওয়ালান্ডার জানে, প্রশ্নটা করায় রাগ করেনি ব্রোলিন।

মারিয়া ক্যালাসের একটা টেপ ক্যাসেটে পুরে দিল ওয়ালান্ডার। আগামী সপ্তাহ পুরোটা ছুটি নিচ্ছে। প্রথমে লুন্দে যাবে হারমান আহম্বোয়ার সাথে দেখা করতে। বাকি সময়টা কাটাবে নিজের ফ্ল্যাট পুনরায় রঙ করে। একটা নতুন স্টেরিও কিনতে পারে হয়ত। গাড়ি পার্ক করে যখন বেরিয়ে এল, মাথার ওপর এক ফালি হলদেটে চাঁদ চোখে পড়ল ওর। শরৎ আসছে।

বরাবরের মতোই বারান্দায় অন্ধকারে বসে ছিল রিডবার্গ। দুটো গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে নিল ওয়ালান্ডার।

"মনে আছে মারিয়া লভগ্রেনের শেষ কথাটা?" বলল রিডবার্গ। "খুনিরা বিদেশি হতে পারে ভেবে কী দুঃশ্চিন্তায় না ভুগছিলাম আমরা। পরে যখন এরিক ম্যাগনোসনের খবর পাওয়া গেল, আমরা চাইছিলাম সে-ই যেন অপরাধী হয়। কিন্তু দেখলে, শেষ পর্যন্ত দুজন বিদেশিই অপরাধী হিসেবে প্রমাণিত হলো। আর বেচারা সোমালি লোকটা মরল অকারণে।"

"তুমি জানতে, তাই না?" বলল ওয়ালান্ডার। "জানতে যে খুনিরা বিদেশিই।"

"নিশ্চিত ছিলাম না," বলল রিডবার্গ। "কিন্তু অনুমান করেছিলাম।"

দুই বন্ধু মিলে পুরনো স্মৃতি স্মরণ করার মতো জোড়াখুনের তদন্ত নিয়ে কথা বলতে লাগল।

"অনেক বেশি ভুল করেছি আমরা এই কেসটায়," ভাবুক গলায় বলল ওয়ালান্ডার। "আমারই দোষ।"

"তুমি চমৎকার একজন পুলিশ অফিসার, কার্ট," বলল রিডবার্গ। "আগে হয়ত বলিনি, কিন্তু জেনে রাখো, তোমার মতো দক্ষ অফিসার কমই আছে।"

"অত ভুল করার পরেও বলছ?" বলল ওয়ালান্ডার।

"ভুল তো মানুষই করে," বলল রিডবার্গ। "তুমি সেরা, কেননা তুমি হাল ছেড়ে দাওনি। খুনিদের ধরতে তোমার চেষ্টায় কমতি ছিল না। এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।"

এক সময় বলার মতো কিছু রইল না ওদের। একজন মৃত্যু পথযাত্রীর সাথে বসে আছি আমি, ভাবনাটা মাথায় আসতেই কষ্ট হলো ওয়ালান্ডারের। কখনও কল্পনাও করতে পারিনি রিডবার্গ চলে যাবে এত দ্রুত। ছুরির আঘাতে আহত

হওয়ার কথা মনে পড়ল ওর। মনে পড়ল ছয় মাস আগে মাতাল অবস্থায় গাড়ি চালানোর কথা। ভাগ্য ভালো হওয়ায় চাকুরি হারাতে হয়নি। হয়ত হারালেই ভালো হত, মনে হলো ওর।

রিডবার্গকে কেন ওই ঘটনাটা জানাইনি আমি? প্রশ্ন জাগল ওয়ালান্ডারের মনে। আচ্ছা, সে কি জানে?

মন্ত্রটা মনে পড়ে গেল ওর। *একবারই জীবন, একবারই মরণ।*

অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না রিডবার্গের মুখভঙ্গি।

"এখন যন্ত্রণা হচ্ছে না," বলল সে। "কিন্তু আগামীকাল ঠিকই ব্যথা করবে। কিংবা পরের দিন।"

রিডবার্গকে বারান্দায় রেখে যখন ওয়ালান্ডার বেরিয়ে এল, রাত প্রায় দুটো বাজে। গাড়িতে না উঠে হাঁটা শুরু করল সে। মেঘের আড়ালে চলে গেছে চাঁদ। দুয়েকবার হোঁচট খেতে খেতেও সামলে নিল সে। মারিয়া ক্যালাসের কণ্ঠ বাজছে তার মস্তিষ্কে।

ঘুমানোর আগে চোখ খোলা রেখে অন্ধকারে শুয়ে থাকল সে কিছুক্ষণ। আবারও মনে পড়ে গেল লুনাপে ঘটে যাওয়া নৃশংসতার কথা। এসেছে নতুন যুগ। আর নতুন যুগে দরকার ভিন্ন ধরণের পুলিশ সদস্য।

সব চিন্তা পাশ কাটিয়ে স্বপ্নের কৃষ্ণাঙ্গ মহিলার কথা ভাবতে চেষ্টা করল ওয়ালান্ডার। তদন্ত শেষ হয়েছে। এবার একটু ঘুমানো যাক।

***